জানালার ধারে তত্তচান

কুরোইয়ানাগি তেৎসুকো

উপ-পরিচালক রশীদ হায়দারকে

প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ

হিরোকো কাসুইয়া

২৫ ৭ ১৯৮৯

For

My friend ARVIND

24.9.98

(Rashid Haider)

কুরোইয়ানাগি তেৎসুকো

জানালার ধারে তত্তচান

হিরোকো কাসুইয়া
অনূদিত

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৯৫
মে ১৯৮৮

বা/এ ২১০১
পাণ্ডুলিপি : ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ : মামুন কায়সার
ভেতরের চিত্রগুলি ইওয়াসাকি চিহিরো অলংকৃত
'মাদোগিওয়া নো তত্তচান' গ্রন্থ থেকে গৃহীত

মূল্য ৬০·০০ টাকা

JANALAR DHARE TOTTOCHAN : TOTTOCHAN AT THE WINDOW [Bengali translation of Japanese text 'MADOGIWA NO TOTTOCHAN' (A Japanese memoir) by KUROYANAGI TETSUKO], translated by HIROKO KASUYA. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition : May, 1988.
Price : Taka 60·00 (US Dollar 4·00)

অনুবাদকের কথা

তাঁর নাম কুরোইয়ানাগি তেৎসুকো। তিনি জাপানের সব চেয়ে জনপ্রিয় টেলিভিশন উপস্থাপিকা। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বাল্য স্মৃতি-মূলক গ্রন্থ 'জানালার ধারে তত্তচান'। বইটি প্রকাশের সাথে সাথে এটি বেস্ট সেলার হয়ে ওঠে এবং লেখিকা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন কুরোইয়ানাগি তেৎসুকো। আজ পর্যন্ত বইটির ষাট লাখেরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে। জাপানের এটি সব চেয়ে বেশি বিক্রিত বই। জাপানের প্রকাশ জগতে এটি রেকর্ড সৃষ্টি করে। এর আগে কোনো মহিলার লেখা বই বেস্ট সেলার হয় নি। তাই এখন জাপানে লেখিকা ও উপস্থাপিকা হিসেবে কুরোইয়ানাগি·তেৎসুকো একটি অতি জনপ্রিয় নাম।

'জানালার ধারে তত্তচান' কোনো জটিল ও অসামান্য চিন্তাভাবনায় পরিপূর্ণ বই নয়, এটি একটি ছোট মেয়ের স্কুল জীবনের কাহিনী। ওই মেয়ে মেধাবী ছিলো না, প্রথাগত ভাবে যে-সব মেয়েকে ভালো বলা হয়, সে তা ছিলো না। সে ছিলো একটু অস্বাভাবিক, যে খুব বেশি কথা বলতে ভালোবাসতো, সবার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতো না, কিন্তু যাকে ভালো লাগতো, তার জন্য সব কিছু উজাড় করে দিতে পারতো। ক্লাসে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতো, ডাকতো রাস্তা দিয়ে যাওয়া বিজ্ঞাপন-বাদকদের এবং এর জন্য ক্লাসের শিক্ষিকার বকা খেতো আর

শাস্তি হিসেবে প্রায়ই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো তাকে। এ মেয়েটির নাম তত্তচান। তত্তচান কুরোইয়ানাগি তেৎসুকো-র ডাক নাম।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় তত্তচান খারাপ মেয়ে হিসেবে বহিষ্কৃত হয় তার স্কুল থেকে। তার মা অনেক খোঁজ করে একটি অভিনব স্কুল পান। সে-স্কুলে তত্তচানকে ভর্তি করে দেন। ওই স্কুলের নাম তোমোএ বিদ্যালয়। তত্তচান যেমন অদ্ভুত ও অসাধারণ, ওই স্কুলটিও তেমন অদ্ভুত ও অসাধারণ। এই স্কুলে সাধারণ স্কুল-ঘর ছিলো না। ছিলো ছয়টি ট্রেনের বগী, সেখানে ক্লাস বসতো। এটা তত্তচানকে আকৃষ্ট করেছিলো তীব্রভাবে। পড়াশোনা যে কতটা আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে তা তত্তচান এ মরা ট্রেনের বগীর ক্লাসের মধ্যেই খুঁজে পায়। কিন্তু যিনি তত্তচানের জীবনকে বদলে দেন, পতন থেকে রক্ষা করেন, তিনি তোমোএ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কোবাইয়াশি সোসাকু। কোবাইয়াশি স্যারের শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি অভিনব। ছাত্রছাত্রীদের তিনি বিকশিত করতে চাইতেন। এ-বইতে লেখিকা নিবেদন করেছেন কোবাইয়াশি স্যারের প্রতি তাঁর অসামান্য ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা এবং গোপনে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন প্রথাগত শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে। এ যুগটা প্রতিযোগিতামূলক, ইঁদুর দৌড়ের যুগ। কোবাইয়াশি স্যার তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের এ প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে নিয়ে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন প্রকৃত মানুষ হিসেবে। তাঁর বিশ্বাস ছিলো প্রতিটি শিশুই কোনো না কোনো সদগুণ নিয়ে জন্ম নেয়, সযত্ন লালন-পালন পেলে বিকশিত হতে পারে। তবে ওই পথের বাধা হচ্ছে প্রতিবেশ ও বয়স্কদের প্রভাব। কোবাইয়াশি স্যার তাঁর ছাত্রদের ওই প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে নিজ নিজ সদগুণ অনুসারে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন।

এ-বইতে বালক-বালিকাদের বাল্যজীবন উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়ে আছে এবং আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে একটি বড় প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে। বইটি জনপ্রিয় হয়েছে একটি বড় কারণে—তা হচ্ছে আশি-দশকের শুরুতে জাপানের অনেকের মনে হয়েছে যে, আধুনিক জাপানী শিক্ষা-পদ্ধতি সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই যখন সমাধানের পথ খুঁজছিলেন, ঠিক তখন বেরোয় এই অন্তরঙ্গ, উজ্জ্বল আবেগপূর্ণ সচিত্র বইটি। গ্রন্থটি যদিও শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয় নি, তবুও পাঠকেরা এটিকে গ্রহণ করেন একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক গ্রন্থ হিসেবে। এটি পাঠকদের চিত্ত জয় করেছে।

বইটিতে যে বালিকার ও তার সহপাঠীদের বাল্যজীবন চিত্রিত হয়েছে, তা আকর্ষণ করবে স্মৃতিভরপুর সব মানুষকে। এতে যে সমস্যা চিত্রিত হয়েছে তা বিশ্বজনীন। বাঙলাদেশের সাধারণ পাঠক, স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও মায়েদের কাছে এটিকে একটি অন্তরঙ্গ, আকর্ষণীয় ও উপকারী বই হবে বলে আশা রাখি।

'জানালার ধারে তত্তচান' বইটি ইংরেজী, থাই, চীনা, কোরীয় ও পোল ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কুরোইয়ানাগি তেৎসুকো টোকিওতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বেহালা-বাদক ও অর্কেস্ট্রা প্রধান। কুরোইয়ানাগি তোওইয়োও সংগীত মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং জাপানের জাতীয় বেতারে অভিনয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি নিউইয়র্কে ম্যারি তার্কাই অভিনয় বিদ্যালয়েও শিক্ষা করেন। তিনি টেলিভিশন উপস্থাপিকা হিসেবে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত। তাঁর একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান 'তেৎসুকো-র ঘর' দশ বছরেরও বেশি দিন ধরে চলছে এবং কোটি কোটি দর্শকের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে।

তিনি জনপ্রিয়তা ও সম্মান লাভ করেছেন বিপুলভাবে, এ বইয়ের জন্য একাধিক সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। সম্রাটের বিশেষ পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়েছেন এবং ইউনিসেফ কর্তৃক শুভেচ্ছা দূত হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। তিনি এশিয়ার একমাত্র শুভেচ্ছা দূত।

কুরোইয়ানাগি তেৎসুকো নানা রকম সমাজসেবামূলক কাজে নিবেদিত-প্রাণ। 'জানালার ধারে তত্তচান' বইটির বিক্রয় লব্ধ অর্থ থেকে তিনি 'তত্ত ফাউণ্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ফাউণ্ডেশন 'জাপান বধির অভিনেতা সংঘ' প্রতিষ্ঠা করে।

গ্রন্থটি জাপানের বিখ্যাত প্রকাশক কোওদানশা (টোকিও) কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল জাপানী গ্রন্থের নাম 'মাদোগিওয়া নো তত্তচান' (১৯৮৪)। আমি সবিনয়ে স্বীকার করছি, বাঙলা ভাষায় আমার জ্ঞান সীমিত। এই

সামান্য সঞ্চয় নিয়ে আমি অনুবাদ কাজে হাত দিয়েছি। মূলের প্রতি অনুগত থেকে জাপানী ভাষা ও বাক্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্যের প্রতিও লক্ষ্য রেখেছি। এতে বাঙলা ভাষার মাধুর্য কখনো ব্যাহত হলেও সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা মূলের স্বাদ পাবেন।

বই-এর পাণ্ডুলিপির একটি খসড়া পাঠ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদ ভাষা সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। কথাশিল্পী বিপ্রদাশ বড়ুয়া কিছু অংশ সংশোধন ও পরিমার্জনা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বইটি প্রকাশের জন্য আন্তরিক সাহায্য করেছেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সচিব মঈনুল হাসান, পরিচালক শামসুজ্জামান খান, পরিচালক বশীর আলহেলাল, উপ-পরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা ও ভাষা-সাহিত্য উপবিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

আমি বিনীতভাবে স্বীকার করছি যে এই বইতে ছয় নং ফর্মা (৯৬ পৃষ্ঠা) পর্যন্ত বেশ মুদ্রণ ত্রুটি রয়ে গেলো। তবে তার পর সাত নং ফর্মা (৯৭ পৃষ্ঠা) থেকে সতর্কতার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে নির্ভুল ছাপার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এরজন্য বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক ওবায়দুল ইসলাম, উৎপাদন অফিসার আফজল হোসেন, প্রিন্টার সোহরাব্ হোসাইন, প্রবীণ কম্পোজিটর তাহের আলী ও কম্পোজিটর আবুল হোসেন-এর সহৃদয়তার কথা আমি ভুলবো না।

সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

হিরোকো কাসুইয়া

উৎসর্গ

কোবাইয়াশি সোসাকু স্যারের
স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

স্টেশনে প্রথম বার	১
জানালার ধারে ততচান	২
নতুন স্কুল	৮
স্কুলটিকে ভালো লাগে	৯
প্রধান শিক্ষক	১১
টিফিন	১৬
আজ থেকে স্কুলে যাই	১৭
ট্রেন ক্লাসঘর	১৯
পাঠ	২১
সামুদ্রিক জিনিস ও পাহাড়ী জিনিস	২৪
ভালো করে চিবাও	২৭
হাঁটাহাঁটি	২৯
বিদ্যালয়-সংগীত	৩২
আগের জায়গায় রাখো	৩৫
নামের কথা	৩৯
হাস্যকৌতুকের গল্প	৪০

ট্রেন আসবে	৪০	কোবাইয়াশি ইস্সা	৯২
সাঁতার-দিঘি	৪৪	বড়োই অদ্ভুত !	৯৪
রিপোর্ট কার্ড	৪৮	হাত দিয়ে কথা বলা	৯৮
গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়েছে	৪৯	সেঙ্গাকুজি মন্দির	৯৯
দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা	৫১	'মাসাওচা—ন !'	১০২
সাহস পরীক্ষা	৫৫	চুলের বেণী	১০৪
রিহার্সাল হল	৫৮	'থ্যাংক ইউ'	১০৭
উষ্ণ প্রস্রবণে ভ্রমণ	৬১	পাঠাগার	১০৯
ইউরিদ্‌মিক্স বা তাললয়-বিদ্যা	৬৫	লেজ	১১২
জীবনের সেরা সাধ !	৬৯	দ্বিতীয় বসন্ত	১১৪
সবচেয়ে খারাপ পোশাক	৭৩	রাজহাঁসের হ্রদ	১১৬
তাকাহাশি	৭৬	ক্ষেতের শিক্ষক	১১৯
ঝাঁপিয়ে পড়ো না !	৭৮	মাঠের রান্না	১২২
'তার পর—'	৮০	'আসলে তুমি ভালো মেয়ে !'	১২৬
শুধু খেলা করছিলাম	৮৪	বউ	১২৮
বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান	৮৬	ভাঙাচোরা স্কুল	১৩১

চুলের ফিতে	১৩৪
আহতদের দেখতে যাওয়া	১৩৬
স্বাস্থ্যের ছালবাকল	১৩৯
ইংরেজী বলা ছেলে	১৪৫
বিচিত্রানুষ্ঠান	১৪৮
চক	১৫১
ইয়াসুআকি-চান মারা গেলো	১৫৪
গুপ্তচর	১৫৭
বেহালা	১৬০
প্রতিজ্ঞা	১৬২
রকি হারিয়ে গেলো	১৬৬
টী পার্টি	১৭০
সাইয়োনারা, সাইয়োনারা—বিদায়, বিদায়	১৭৪
পুনশ্চ—১	১৭৬
পুনশ্চ—২	১৯৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার একটু আগে পর্যন্ত টোকিওতে সত্যিই অবস্থিত ছিলো এমন একটি স্কুল ও সেখানে পড়তে যাওয়া একটি মেয়ের কাহিনী এটি।

স্টেশনে প্রথম বার

জিইয়ুগাওকা স্টেশনে ওইমাচি লাইনের ট্রেন থেকে তারা নামলো আর তত্তচানের হাত ধরে টেনে তার মা টিকেট দেখানোর দরোজা দিয়ে বেরুতে এগিয়ে গেলো। তত্তচান তখন পর্যন্ত খুব বেশি ট্রেনে ওঠে নি, তাই সে হাতে শক্তভাবে যে-মূল্যবান টিকেটটি ধরে আছে সেটিকে হাতছাড়া করা তার কাছে বেদনাদায়ক মনে হলো। তাই সে দরোজার টিকেট-কালেক্টরকে জিজ্ঞেস করলো, 'এ-টিকেটটি আমি রাখতে পারি ?'

'না, পারো না।' বলে সে তত্তচানের হাত থেকে টিকেট নিয়ে নিলো। তত্তচান টিকেট গেটের বাক্সে ভরা টিকেটের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এর সবগুলো আপনার ?'

টিকেট-কালেক্টর বেরিয়ে যাওয়া লোকদের হাত থেকে টিকেট ছিনিয়ে নিতে নিতে উত্তর দিলো, 'আমার নয়, স্টেশনের।'

'ও...'

তত্তচান দুঃখের সাথে বাক্সের ভেতরের দিকে তাকাতে তাকাতে বললো, 'আমি বড় হলে টিকেটবিক্রেতা হবো।'

টিকেট-কালেক্টর এই প্রথম তত্তচানের দিকে একবার তাকালো, 'আমার ছেলেও স্টেশনে কাজ করতে চায়, তাই তার সাথে কাজ করলে বেশ হবে।'

তত্তচান একটু সরে গিয়ে টিকেট-কালেক্টরের দিকে তাকালো। সে মোটা ও চশমা পরা, ভাল করে তাকালে কিছুটা দয়ালু মনে হয় তাকে।

তত্তচান তার হাত কোমরে রেখে চারদিকে দেখতে দেখতে বললো, 'আপনার ছেলের সাথে কাজ করতে পারি কি না, ভেবে দেখবো। আমি নতুন স্কুলে যাচ্ছি, তাই খুব ব্যস্ত।' এ-কথা বলে তত্তচান তার অপেক্ষারত মায়ের কাছে ছুটে গেলো এবং চিৎকার করে বললো, 'আমি টিকেটবিক্রেতা হবো।'

মা অবাক না হয়ে বললো, 'তবে তুমি বলেছিলে যে তুমি গুপ্তচর হবে। তার কি হবে?'

তত্তচান মায়ের হাত ধরে হাঁটতে লাগলো আর তার মনে পড়লো—তাই তো। গতকাল পর্যন্ত আমি ঠিক করেছিলাম আমি অবশ্যই গুপ্তচর হবো। তবে বাক্সে টিকেট ভরে রাখে এমন লোক হওয়া খুব মজা।

'আচ্ছা!!' তত্তচানের মাথায় একটি বুদ্ধি এলো এবং মায়ের দিকে মুখ তুলে উচ্চকণ্ঠে বললো, 'শোনো, যদি আমি আসলে গুপ্তচর হই, কিন্তু টিকেট বিক্রি করি, তাহলে কেমন হয়?'

মা কোনো উত্তর দিলো না। সত্য কথা বলতে কি তার মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলো। যদি নতুন স্কুল তত্তচানকে না নেয়, তাহলে...। ছোট ফুল বসানো ফেল্ট হ্যাট পরা মায়ের সুশ্রী মুখ একটু গম্ভীর হয়ে উঠলো এবং পথে লাফিয়ে লাফিয়ে নিরর্থক বকবকরত তত্তচানের দিকে তাকালো। তত্তচান মায়ের দুশ্চিন্তার কথা জানতো না, তাই যখন তারা মুখোমুখি হলো, তখন সে খুশির সাথে বললো, 'শোনো, গুপ্তচর ও টিকেটঅলা কোনোটা হবো না। আমি চিন্‌-দোন্‌-ইয়া-র (দোকানের বিজ্ঞাপন প্রচারকারী বাদক দল) বাদক হবো!!'

মা কিছুটা হতাশ হয়ে বললো, 'চল, দেরি হচ্ছে। স্কুলের হেড মাস্টার অপেক্ষা করছেন। এখন বাজে না বকে সামনে তাকিয়ে ঠিক মতো হাঁটো।'

দুজনের চোখের সামনে ছোট নতুন স্কুলের ফটক দেখা গেলো।

জানালার ধারে তত্তচান

নতুন স্কুলের গেট দিয়ে ঢোকার আগে তত্তচানের মা কেন উদ্বিগ্ন তা বলে দেয়া ভালো। তার কারণ হচ্ছে প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে অল্প দিন আগে ভর্তি হলেও তত্তচান স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলো। তাকে প্রথম শ্রেণীতেই বহিষ্কার করা হয়, কী আশ্চর্য!

এই গত সপ্তাহের কথা। তত্তচানের মাকে ডেকে পাঠালো ক্লাসের শিক্ষিক। এবং সোজাসুজি স্পষ্টভাবে বললো, 'আপনার মেয়েটি ক্লাসের সবাইকে বিরক্ত করে। তাকে এ-স্কুল থেকে সরিয়ে নেবেন।'

'সত্যিই অসুবিধা হচ্ছে!' তরুণী রূপসী শিক্ষিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বার বার একথা বললো।

তার মা অবাক হয়ে বললো, 'কি করেছে সে? কি কাণ্ড করে সে, ক্লাসের সবাইকে বিরক্ত করে......'

চোখের পাতার কুঞ্চিত লোম পিটপিট করে ভেতরের দিকে কুঞ্চন করা স্থায়ী ঢেউ খেলানো ছোট ছোট চুলে হাত বুলোতে বুলোতে শিক্ষিকা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো,

'প্রথমত সে ক্লাসের সময় ডেস্কের ঢাকনা একশো বারের মতো খোলে আর বন্ধ করে। তাই আমি তাকে বলি, "দরকার না হলে বারবার ঢাকনা খুলো না আর বন্ধ করো না।" তখন আপনার মেয়ে খাতা, পেন্সিল, বাক্স ও বই কিছু ডেস্কের ভেতরে রেখে তারপর একটা একটা করে বের করতে থাকে। যেমন, আমি যখন ডিকটেশন লিখতে বলি তখন আপনার মেয়ে ঢাকনা খুলে খাতা বের করে। সঙ্গে সঙ্গে 'ধপাস' শব্দ করে ঢাকনা বন্ধ করে আর এমনি আবার ঢাকনা খুলে মাথা ডেস্কের ভেতরে ঢুকিয়ে 'আ'-লেখার জন্য বাক্স থেকে পেন্সিল বের করে এবং ব্যস্তভাবে ঢাকনা বন্ধ করে, এবং 'আ' লেখে, তবে যখন ভাল করে লিখতে পারে না বা ভুল লেখে, তখন সে ঢাকনা খুলে আবার মাথা ভেতরে ঢুকিয়ে রবার বের করে ঢাকনা বন্ধ করে। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি রবার ঘষে তারপর প্রচণ্ড বেগে ঢাকনা খুলে রবার ভেতরে রেখে ঢাকনা বন্ধ করে। তখনই আবার ঢাকনা খোলে। তাই আমি তাকে দেখতে থাকলাম—'আ' এই একটিমাত্র অক্ষর লেখে সে তার জিনিসপত্র একটা একটা করে সবগুলো ভেতরে রাখে। পেন্সিল ভেতরে রেখে ঢাকনা বন্ধ করে আবার খুলে খাতা বের করে আবার বন্ধ করে...এমনভাবে। আর পরেই 'ই' লেখার সময় আবার খাতা থেকে শুরু করে পেন্সিল, রবার... প্রত্যেকটি বের করবার জন্য আমার চোখের সামনে প্রচণ্ড বেগে ডেস্কের ঢাকনা বার বার খোলে আর বন্ধ করে! আমার মাথা ঘুরোয়। তবে এগুলো তার লেখার জন্য দরকার, তাই আমি বারণ করতে পারি না.....'একথা বলার সময় যেন শিক্ষিকার ওই ঘটনার সময়ের কথা মনে পড়ে যায় আর চোখের পাতার লোম আরো দ্রুতবেগে পিটপিট করতে থাকে।

এ পর্যন্ত শুনে মা কিছুটা বুঝলো কেন তত্তচান ডেস্কের ঢাকনা খোলে ও বন্ধ করে। কেননা তার মনে পড়লো প্রথম দিনে তত্তচান স্কুল থেকে

ফিরে এসে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তাকে জানায়, 'শোনো, স্কুলটা ভীষণ চমৎকার। আমার বসার ডেস্কের ড্রয়ার এমনভাবে টানতে হয়, তবে স্কুলের ড্রয়ার ঢাকনা ওপরে ওঠে। ডাস্টবিনের মতো। তবে আরো তেলেতেলে। অনেক জিনিস সেখানে রাখতে পারি। আমার খুব ভাল লাগে!'

নতুন ডেস্কের ড্রয়ারে মজা পেয়ে তত্তচান বার বার খুলছে ও বন্ধ করছে এ-দৃশ্য তার মা স্পষ্ট ছবির মতো দেখতে পেলো। তার মা'র মনে হলো এটা এমন কিছু খারাপ নয়, ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সে অত বার বার খুলবে বা বন্ধ করবে না, তবে সে শিক্ষিকাকে বললো, 'ওকে ভাল করে বুঝাবো।'

কিন্তু শিক্ষিকা আগের চেয়ে একটু উঁচু কণ্ঠে বললো, 'শুধু এটুকুই হলে কোনো অসুবিধা হতো না, তবে!'

মা'র মনে হলো যেন তার দেহ একটু কুঁচকে যাচ্ছে। শিক্ষিকা তার শরীর সামনের দিকে একটু বাড়িয়ে বললো, 'সে ডেস্ক দিয়ে কোনো আওয়াজ করছে না, যখন এ মনে হয় তার পরমুহূর্তে তাকিয়ে দেখি সে দাঁড়িয়ে আছে, ক্লাসের পুরো সময়।'

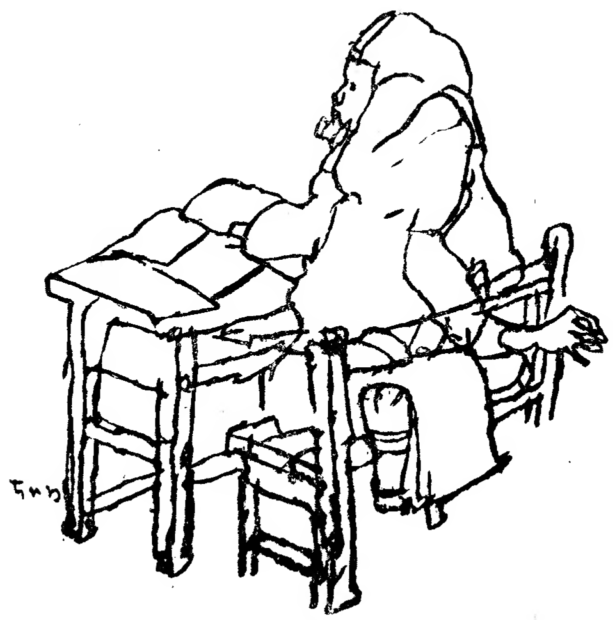

মা আবার বিস্মিত হলো আর জিজ্ঞেস করলো, 'দাঁড়িয়ে আছে? কোথায়?'

শিক্ষিকা একটু রাগান্বিতভাবে বললো, 'ক্লাসের জানালার ধারে!'

মা হতবুদ্ধি হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'জানালার ধারে সে কী করে?'

শিক্ষিকা আধা চিৎকার করার মতো স্বরে বললো, 'সে চিন্-দোন-ইয়া-দের কাছে আসার জন্য ডাকে!!'

শিক্ষিকার কাহিনীর সারাংশ এমন—প্রথম ঘণ্টায় সে ডেস্ক দিয়ে ঘনঘন ফটফট শব্দ করে। তারপর ডেস্ক ছেড়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকায়। শিক্ষিকা মনে করে যে চুপ করে দাঁড়ালে কোনো অসুবিধা নেই। সেই মুহূর্তে হঠাৎ তত্তচান জানালার বাইরে তাকিয়ে উঁচু কণ্ঠে ডাকে, 'চিন্দোন্ইয়া-সান্'। তত্তচানের জন্য ভাগ্যের আর শিক্ষিকার জন্য দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে এই ক্লাসঘরটি নিচ তলায় এবং তার সামনে দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। আর এর দুইয়ের মাঝে ছিলো শুধু নিচু গাছের বেড়া। তাই তত্তচান সহজে রাস্ত দিয়ে যারা হেঁটে যায়, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতো। ক্লাসের সামনের রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিলো ওই বাদক দল। ডাক শুনে তারা ক্লাসঘরের পাশে এসে দাঁড়ালো। তত্তচান আনন্দে ক্লাসের সবাইকে বললো, 'এসেছে—!' ক্লাসের ছেলেমেয়েরা সবাই পড়ছিলো, তবে তার কথা শুনে জানালার পাশে ভীড় করে ডাকাডাকি করে, 'চিন্দোন্ইয়া-সান্'। তত্তচান বাদকদেরকে অনুরোধ করে, 'শোনো, একটু বাজিয়ে শোনাও?'

স্কুলের পাশে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বাদক দল সাধারণত আওয়াজ কমিয়ে দেয়, তবে তার বিশেষ অনুরোধে তারা ক্ল্যারিনেট, ঘণ্টা, ঢাক ও শামিসেন (তিন তারের বেহালা) আড়ম্বরের সাথে বাজাতে শুরু করে। তখন শিক্ষিকা কী করে, তা বলা দরকার। একবার বাজানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্লাসের মঞ্চে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া তার কোনো উপায় থাকে না। সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে একবার বাজানো শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য রাখতে হবে।

যখন একটা সুর বাজানো শেষ হয়, তখন বাদক দল চলে যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা যার যার জায়গায় ফিরে আসে, তবে এটা বিস্ময়কর যে তত্তচান

জানালার ধার থেকে আসে না। 'কেন এখনো ওখানে আছো?' শিক্ষিকার এমন প্রশ্ন শুনে তত্তচান গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, 'অন্য বাদক দল এলে তাদের সঙ্গে কথা বলবো। নইলে আগের বাদক দল আবার ফিরে এলে, অসুবিধা হবে।'

'এমনভাবে চললে ক্লাস নিতে পারি না, বুঝেছেন?' কথা বলতে বলতে শিক্ষিকা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে মা'কে এ-কথা বললো। মা'র মনে হলো এমন হলে শিক্ষিকা বেশ মুশকিলে আছে। সে-মুহূর্তে শিক্ষিকা আবার আগের চেয়েও উচ্চকণ্ঠে বললো, 'তা ছাড়া......'

মা বিস্মিত হয়ে অসহায়ের মতো শিক্ষিকাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আরো কিছু আছে......?'

শিক্ষিকা তৎক্ষণাৎ বললো, 'সেগুলো যদি গুণতে পারতাম তাহলে আর এমনভাবে ওকে স্কুল ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করতাম না!!'

তারপর শিক্ষিকা তার শ্বাসপ্রশ্বাস একটু শান্ত করে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কালকের কথা। অন্যান্য দিনের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাই সে আবার চিন্দোন্ইয়ার অপেক্ষায় আছে মনে করে আমি ক্লাস নিচ্ছিলাম। তখন সে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে "কি করছো?" বলে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলো। যাকে সে জিজ্ঞেস করছিলো, তাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাই ভাবছিলাম কাকে সে জিজ্ঞেস করছে। আবার উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো "শোনো, কি করছো?" এবার রাস্তার দিকে না তাকিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো। আমিও উৎসুক হয়ে উত্তর শোনার জন্য কান পাতলাম, তবে কোনো উত্তর এলো না। তবুও আপনার মেয়ে বার বার বলতে থাকে, "শোনো, কি করছো?" ক্লাসে বাধা পড়ছে, তাই ভাবলাম আপনার মেয়ে কাকে কি জিজ্ঞেস করছে, জানালার কাছে গিয়ে দেখে আসি। জানালা দিয়ে মুখ বের করে ওপরের দিকে তাকালাম। কী আশ্চর্য, ক্লাস ঘরের ছাদের নিচে বাসা বানাচ্ছিলো একটা চাতক। তত্তচান প্রশ্ন করছিলো চাতককে। এমন নয় যে আমি শিশুদের অনুভূতি বুঝতে পারি না, তাই বলছি না যে চাতককে জিজ্ঞেস করা আহাম্মকি। তবে আমি মনে করি ক্লাসে অমন উচ্চকণ্ঠে চাতককে "কী করছো?" এ-কথা জিজ্ঞেস করা ঠিক নয়।'

তার মা কিভাবে যে ক্ষমা চাইবে তা ভেবে মুখ খুলতে লাগলো, কিন্তু তার আগেই শিক্ষিকা বললো, 'আর এমন ঘটনা ঘটেছে। প্রথম ছবি আঁকার ক্লাসের কথা। আমি জাতীয় পতাকা আঁকতে বললাম। অন্য ছেলেমেয়েরা ঠিক মতো কাগজে গোলাকার সূর্যের ছবি আঁকলো। তবে আপনার মেয়ে আসাহি সিম্বুন পত্রিকার নকশার ভোরের সূর্যের মতো নৌবাহিনীর পতাকা আঁকতে শুরু করলো। আমি ভাবলাম এমন হলেও চলবে। হঠাৎ সে পতাকার চার দিকে আঁকতে লাগলো ঝোলানো সুতোর গুচ্ছ। সুতোর গুচ্ছ। তরুণ সংঘের পতাকায় যে-ধরনের সুতোর গুচ্ছ থাকে, সে-ধরনের সুতোর গুচ্ছ। তাই ভাবলাম ঠিক আছে, হয়তো সে এমন কোথাও দেখেছে। তবে তার ওপর থেকে আমার চোখ সরিয়ে নেয়ার মুহূর্তেই সে হলুদ রঙের সুতোর গুচ্ছ ডেস্কের ওপর পর্যন্ত এঁকে ফেলে। সে তার কাগজ প্রায় সবটা জুড়ে পতাকা এঁকেছিলো, তাই সুতোর গুচ্ছ আঁকার জন্য বেশি জায়গা ছিলো না। তবুও সে হলুদ রঙের মোম দিয়ে ঘষে ঘষে সুতোর গুচ্ছ এঁকেছিলো, তা কাগজের বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলো। কাগজ সরিয়ে নেয়ার পরেও ডেস্কের ওপর আঁকা হলুদ রঙের আঁকাবাঁকা দাগ ঘষে মোছা সত্ত্বেও মিলিয়ে যায় না। সৌভাগ্যের কথা এই যে আঁকাবাঁকা দাগ তিন দিকে ছিলো!'

মা সঙ্কুচিত হতে হতে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো, 'তিন দিকে মানে...?'

দেখে মনে হলো শিক্ষিকা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তবুও সে সদয়ভাবে বললো, 'পতাকার খুঁটি বাঁদিকে এঁকেছে, তাই পতাকার পাশে আঁকাবাঁকা দাগ তিন দিকে ছিলো।'

মা একটু স্বস্তি পেয়ে বললো, 'তাহলে শুধু তিন দিকে...' তারপর শিক্ষিকা অত্যন্ত ধীর গলায় এক একটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বললো, 'তবে তার বদলে পতাকার খুঁটির প্রান্ত কাগজ থেকে বের হয়ে ডেস্কের ওপরে ছিলো!!'

তারপর শিক্ষিকা দাঁড়িয়ে বেশ ঠাণ্ডাভাবে শেষ ঘা দেয়ার মতো বললো, 'শুধু আমি বিরক্ত বোধ করি নি, পাশের ঘরের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিকাও মনে হয় তার জন্য বিপদে আছে, তাই......'

মনস্থির করা ছাড়া মা'র আর কোনো উপায় ছিলো না। (এভাবে সে অন্য ছাত্রছাত্রীদের নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত করছে, কোথাও অন্য স্কুল দেখে তাকে সরিয়ে নিলে বোধ হয় ভাল হয়। এমন স্কুল যেখানে আমার মেয়ের স্বভাব বোঝার চেষ্টা করবে এবং অন্য ছাত্রদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে শেখাবে ......)

মা এখানে সেখানে দৌড়োদৌড়ি করে যে-স্কুলটির খোঁজ পায় সেখানে তারা এখন যাচ্ছে। স্কুল থেকে বহিষ্কারের কথাটি মা তত্তচানকে বলে নি, বললেও সে বুঝবে না তার কি দোষ, মায়ের মনে হলো এ নিয়ে তত্তচানের মনোবিকার দেখা দিলে ভাল হবে না। তাই মা ভাবলো যখন তত্তচান বড়ো হবে তখন তাকে বলবে। তত্তচানকে শুধু এ-কথা বললো, 'নতুন স্কুলে যাবে, কেমন? শুনেছি খুব ভাল স্কুল।'

তত্তচান একটু ভেবে বললো, 'যাবো তবে

মা ভাবলো তার মেয়েটি এখন কী ভাবছে? স্কুল থেকে বহিষ্কারের কথা সে কি অল্প অল্প হলেও বুঝতে পেরেছে......?

পরমুহূর্তে তত্তচান মায়ের বুকের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে বললো, 'শোনো তোমার কি মনে হয় নতুন স্কুলেও চমৎকার চিন্‌দোন্‌ইয়া-সান্‌ আসবে?'

যাই হোক এর ফলে তত্তচান ও তার মা নতুন স্কুলের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলো।

নতুন স্কুল

যখন স্কুলের গেট পষ্ট দেখতে পেলো, তখন তত্তচান থেমে গেলো। কেননা কয়েকদিন আগে পর্যন্ত সে যে-স্কুলে যেতো সেই স্কুলগেট ছিলো চমৎকার কংক্রিট থামের আর স্কুলের নামও বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিলো। তবে এ-নতুন স্কুলে নিচু গাছের গেট। ওই গাছে পাতাও ছিলো। তত্তচান মাকে বললো, 'মাটি থেকে গজিয়ে ওঠা গেট। এবং তার সাথে যোগ করলো, 'অবশ্যই বড় হতে হতে বিদ্যুতের থামের চেয়ে উঁচু হয়ে যাবে।'

ওই গেট দুটো ছিলো গোড়াঅলা গাছ। গেটের কাছে গিয়ে হঠাৎ তত্তচান তার মুখ একদিকে কাত করলো। কারণ গেটে ঝুলন্ত স্কুলের নাম ফলক বাতাসের দোলায় কাত হয়ে গিয়েছিলো।

তত্তচান মুখ কাত করা অবস্থায় নাম ফলকের লেখা আওয়াজ করে পড়লো, 'তোমোএ গাকুএন বিদ্যালয়। সে মাকে জিজ্ঞেস করতে চাইলো 'তোমোএ অর্থ কী?' তখন তত্তচানের চোখে পড়লো এমন একটা জিনিস যাকে সে স্বপ্নে দেখছে বলে তার মনে হলো।' তত্তচান একটু নিচের দিকে ঝুঁকে গেটের গাছগুলোর ফাঁকের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিলো। তত্তচান বিস্মিত হয়ে বললো, 'আমি দেখেছি!'

সে তার মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মা! ওগুলো সত্যিই রেলগাড়ী? খেলার মাঠে সারিসারি রেলগাড়ী।'

সেগুলো আসল রেলগাড়ীর কামরা, কিন্তু চলে না। ওখানে ছ'টা রেলগাড়ীর কামরা ক্লাসঘর হিশেবে ব্যবহারের জন্য রাখা ছিলো। "রেল-গাড়ীর কামরার ক্লাসঘর....."—তত্তচানের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হলো।

রেলগাড়ীর জানালা সকালের আলোতে ঝকমক করছিলো। উজ্জ্বল চোখে উঁকি দেয়া তত্তচানের গালও চকমক করছিলো।

স্কুলটিকে ভাল লাগে

পর মুহূর্তে তত্তচান 'বাহ!' বলে আনন্দে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো এবং রেল কামরার ক্লাসঘরের দিকে ছুটতে লাগলো। আর দৌড়োতে দৌড়োতে মা'র দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলো, 'তাড়াতাড়ি চলো, না-চলো রেলগাড়ীতে উঠে দেখা যাক।'

মা অবাক হয়ে দৌড়োতে লাগলো। আগে মা বাস্কেটবল খেলোয়াড় ছিলো, সে তত্তচানের চেয়ে দ্রুত চলতে পারে। তাই তত্তচান রেলগাড়ীর দরোজার কাছাকাছি পৌঁছোনোর একটু আগেই মা তত্তচানের স্কার্ট ধরে ফেললো। মা স্কার্টের প্রান্ত শক্তভাবে ধরে বললো, 'না, এ-রেলগাড়ী

স্কুলের ক্লাসঘর, তুমি এখনো স্কুলে ভর্তি হও নি। যদি রেলগাড়ীতে চড়তে চাও তাহলে এখন যার সঙ্গে দেখা হবে সে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে ঠিক মতো কথা বলো। যদি ভাল করতে পারো, তাহলে তুমি এ-স্কুলে আসতে পারবে। বুঝেছো?'

তত্তচানের কাছে এটা খুব বেদনাদায়ক মনে হলো যে সে এখন রেলগাড়ীতে উঠতে পারবে না। তবে সে মা'র কথামতো চলবে বলে ঠিক করলো, তাই উচচকণ্ঠে বললো, 'হুঁ'। তারপর ব্যস্তভাবে আরো বললো, 'এ-স্কুল আমার খুব ভাল লাগে।'

মা'র বলতে ইচ্ছে হলো যে তত্তচানের স্কুল ভাল লাগে কি না সেটা আসল কথা নয়, তত্তচানকে প্রধান শিক্ষকের ভাল লাগে কি না সেটা আসল কথা। তবে সে তত্তচানের স্কার্ট থেকে হাত ছেড়ে দেয়, তার হাত ধরে প্রধান শিক্ষকের ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে।

প্রত্যেকটি রেল কামরার ক্লাসঘর নীরব নিস্তব্ধ। মনে হয় একটু আগে প্রথম ঘণ্টার ক্লাস শুরু হয়েছে। বেশি বড় নয় এমন খেলার মাঠের চার দিকে দেয়ালের বদলে লাগানো হয়েছে নানা রকমের গাছ। ফুলবাগান লাল ও হলুদ রঙের ফুলে ভরা।

প্রধান শিক্ষকের ঘর ট্রেন কামরায় ছিলো না। সেটা ছিলো অর্ধবৃত্তের মতো প্রসারিত সাত ধাপের পাথরের সিঁড়ির ডান দিকে। গেট থেকে ওটাকে ঠিক সোজাসুজি দেখা যায়।

তত্তচান মায়ের হাত থেকে সবলে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলো এবং সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত দৌড়ে উঠলো, হঠাৎ থেমে পিছনে ফিরে তাকালো। তাই তার পেছনে আসা মায়ের সাথে তত্তচানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার উপক্রম হলো।

তত্তচানের মন পালটে গেছে ভেবে মা তক্ষুনি জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো?' সবচেয়ে ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে নিচু গলায় তত্তচান তার মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'শোনো, যার সাথে আমরা দেখা করতে যাচ্ছি সে স্টেশনের লোক নয়?'

মা অত্যন্ত ধৈর্যশীল আর সব কিছুতে আনন্দ পায়, তাই তত্তচানের মতো নিচু স্বরে তত্তচানের মুখে মুখ ঘষে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

তত্তচান আরো নিচু গলায় বললো, 'কারণ তুমি বললে সে প্রধান শিক্ষক। তবে তার এতো রেলগাড়ী আছে, আসলে সে স্টেশনের লোক নয়?'

তত্তচানের সন্দেহ মায়ের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হলো। কারণ পুরোনো রেলগাড়ীর কামরা স্কুল হিশেবে ব্যবহার করা সত্যিই অদ্ভুত। তবে তখন তার কাছে এটা ব্যাখ্যা করার সময় ছিলো না, তাই সে বললো, 'তাহলে তুমি নিজেই প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে দেখো। আর তোমার বাবার কথা ভেবে দেখো। তোমার বাবা ভায়োলিন বাজায়, তার বেশ কয়েকটি ভায়োলিন আছে। তবে সে ভায়োলিনের দোকানের মালিক নয়, তাই না? এমন ধরনের লোকও আছে।'

'হুঁ, তাই' বলে তত্তচান মায়ের হাত ধরলো।

প্রধান শিক্ষক

যখন তত্তচান ও তার মা প্রধান শিক্ষকের ঘরে ঢুকলো, তখন যে-লোকটি ঘরে ছিলো, সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।

তার মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে, সামনের দাঁত পড়ে গেছে, তার মুখ উজ্জ্বল ও রক্তিম। তার উচচতা বেশি নয়, তবে তার কাঁধ ও বাহু বলিষ্ঠ। ছিমছামভাবে সে পরেছিলো কালো রঙের বহু পুরোনো তিন পিসের স্যুট।

তত্তচান ব্যস্ততার সঙ্গে মাথা নত করে প্রফুল্লভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি প্রধান শিক্ষক না স্টেশনের লোক?'

মা ব্যস্ত হয়ে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো, তার আগেই ওই লোক হাসি মুখে বললো, 'আমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক।'

তত্তচান অত্যন্ত খুশি হয়ে বললো, 'বেশ। তাহলে আমার অনুরোধ—এ-স্কুলে আমি ভর্তি হতে চাই।'

প্রধান শিক্ষক তত্তচানের দিকে একটু চেয়ার এগিয়ে দিলো এবং তার দিকে ঘুরে বললো, 'আচ্ছা, আমি এখন তত্তচানের সাথে কথা বলতে চাই। আপনি এখন আসুন।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য তত্তচান একটু অস্বস্তি বোধ করলো, তবে কেন যেন তার মনে হলো প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সে ভালভাবে থাকতে পারবে। মা সাহস করে শিক্ষককে বললো, 'আচ্ছা, একে একটু দেখাশোনা করবেন, এ অনুরোধ করছি।'

তার মা দরোজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলো।

প্রধান শিক্ষক তত্তচানের সামনে চেয়ার টেনে এনে তার খুব কাছাকাছি মুখোমুখি বসে বললো, 'আচ্ছা, সব কথা শিক্ষককে বলো দেখি। যা বলতে ইচ্ছা হয় সব বলো।'

'যা বলতে ইচ্ছা হয় সব কিছু ?!'

তত্তচান ভেবেছিলো তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে এবং সে তার উত্তর দেবে, তবে যখন প্রধান শিক্ষক বললো যে তার যা বলতে ইচ্ছে হয় তাই সে বলতে পারে, তখন সে ভীষণ খুশি হয়ে তখনই কথা বলতে শুরু করলো। তার কথার ক্রম-ও ভঙ্গি ছিলো একটু এলোমেলো, তবে সে প্রাণপণে কথা বললো।

সে যে-ট্রেনে চড়ে এসেছে তা কতো দ্রুত চলে সে-কথা।

টিকেট নিজের কাছে রাখার জন্য স্টেশনের টিকেট গেটের টিকেট কালেক্টরকে অনুরোধ করছিলো, কিন্তু সে টিকেট রাখতে দেয় নি—সে কথা।

তার আগের স্কুলে তার ক্লাসের শিক্ষিকার চেহারা খুব সুন্দর—সে-কথা।

সে স্কুলে চাতকের বাসা আছে সে-কথা।

তাদের বাসায় রকি নামে একটি বাদামী রঙের কুকুর আছে আর সেটি হাত দাও বললে পা উঠিয়ে হাত রাখতে পারে, কোনো বাসায় অতিথি হিশেবে গেলে সেটি 'ভেতরে কেউ আছে ?' ধরনের ভঙ্গি করতে পারে আর খাওয়ার পর নিজের বুকে পা দিয়ে ঘা দিয়ে 'তৃপ্ত তৃপ্ত' ভাব দেখতে পারে—সে-কথা।

তত্তচান কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে কাঁচি মুখের মধ্যে নিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতো। এমন করলে জিভ কাটবে বলে শিক্ষিকা রেগে উঠেছিলো তবে সে বহু বার এমন করেছিলো—সে-কথা। সর্দি লেগে যখন নাক দিয়ে পানি ঝরে, তখন অনেকক্ষণ ধরে 'জুর জুর' শব্দ করে নাক টানলে মা বকবে বলে সে যতো তাড়াতাড়ি পারে নাক ঝাড়ে—সে-কথা।

তার বাবা সমুদ্রে সাঁতার কাটায় পটু, এমনকি ডাইভও দিতে পারে—সে-কথা।

এমন কথা একটার পর একটা তত্তচান বললো। শিক্ষক হাসলো, মাথা নাড়লো, 'তারপর ?' ইত্যাদি বললো, তাই খুশি হয়ে তত্তচান অনেকক্ষণ

ধরে বলতে থাকলো। তবে এক সময় তার বলার মতো কথা শেষ হয়ে গেলো। তত্তচান মুখ বন্ধ করে ভাবছিলো। শিক্ষক বললো, 'আর নেই ?'

তত্তচানের মনে হলো এটা খুব দুঃখের কথা যে তার সব কথা জানানোর এমন চমৎকার সুযোগ পেয়েও তার কথা শেষ হয়ে গেছে।

(যদি বলার আরো কথা থাকতো ......)·

কথার কথা ভাবার সাথে সাথে সে-কথা পেয়ে গেলো, 'বেশ, পেয়ে গেছি !'

সে যা পেলো তা ওই দিন পরিধানের পোশাকের কথা। সাধারণত তার মা-ই তার পোশাক তৈরি করে, তবে আজকের পোশাকটা কেনা হয়েছিলো। কেননা প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে যখন বাইরে থেকে বাসায় ফিরে আসে তখন সব সময় তার পোশাক ছেঁড়াফাড়া অবস্থায় থাকে। কোনো কোনো সময় তার জামা আঁকাবাঁকাভাবে ছেঁড়া থাকে। কেন এমন হয় মা কখনো বুঝতে পারে না। রবারের ফিতা লাগানো সাদা সুতোয় তৈরি জাঙিয়া পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেড়ে ফালি ফালি হয়ে যায়। তত্তচানের কথা অনুসারে যখন সে অন্য বাসার বাগানের বেড়ার নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢোকে বা খোলা মাঠের কাঁটাতারের বেড়ার নিচ দিয়ে পার হয়, তখন এমন হয়ে যায়। যাই হোক, এভাবে মায়ের হাতে তৈরি প্রত্যেকটি সখের পোশাক ফালি ফালি হয়ে গেছে, তাই আজ সকালে বাসা থেকে বেরুনোর সময় আগের দিন কেনা পোশাক পরে এসেছে। সেটা জার্জি কাপড়ে তৈরি মেরুন ও ছাই রঙের চিকন চেকের এক পিসের পোশাক। তাই খারাপ নয়, তবে তার মা কলারের নকশা করা ফুলের লাল রঙকে 'কুরুচিপূর্ণ' বলেছিলো। সে কথা তত্তচানের মনে পড়লো। ব্যস্ততার সাথে চেয়ার থেকে নেমে কলার হাত দিয়ে ওপরের দিকে তুলে ধরে শিক্ষকের কাছে গিয়ে সে বললো, 'মা বলে সে এ-কলার পছন্দ করে না।'

এ-কথা বলার পর অনেক ভাবা সত্ত্বেও সত্যিই তার কথার বিষয় ফুরিয়ে গেলো। সে একটু দুঃখ পেলো। তখন শিক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে তত্তচানের মাথায় তার বড় উষ্ণ হাত রেখে বললো, 'আচ্ছা, তুমি এখন এ-স্কুলের ছাত্রী।' তখন কেন যেন তত্তচানের মনে হলো, জন্মের পর এই প্রথম

বারের মতো একজন পছন্দসই লোকের সাথে তার দেখা হয়েছে। কারণ জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত এতো দীর্ঘ সময় ধরে নিজের কথা শোনানোর মতো কোনো লোক সে আগে পায় নি। সে এই দীর্ঘ সময় ধরে হাই ফেলে নি, বিরক্তির ভাব দেখায় নি আর তত্তচান যেমন নিজের শরীর শিক্ষকের দিকে বাড়িয়ে কথা বলছিলো, তেমনভাবে শিক্ষকও সামনের দিকে দেহ বাড়িয়ে মনপ্রাণ দিয়ে কথা শুনছিলো।

তত্তচান তখন ঘড়ি দেখতে জানতো না। তবুও তার কাছে মনে হলো দীর্ঘ সময় ধরে সে কথা বলেছে। তাই যদি সে ঘড়ি দেখতে জানতো তাহলে অবাক হতো এবং শিক্ষককে আরো অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাতো। কেননা তত্তচান ও মা যখন স্কুলে পৌঁছে, তখন আটটা বাজে এবং প্রধান শিক্ষকের ঘরে সব কথা শেষ হওয়া পর যখন স্থির হলো যে তত্তচান এ-স্কুলের ছাত্রী হবে, তখন শিক্ষক পকেটে ঘড়ি দেখে বললো, 'ও, টিফিনের সময় হয়ে গেছে।' অর্থাৎ পুরো চার ঘণ্টা শিক্ষক তত্তচানের কথা শুনেছিলো।

এর আগে ও পরে তত্তচানের কথা এমন মনোযোগের সাথে আর কোনো প্রাপ্তবয়স্ক লোক শোনে নি।

তা ছাড়া প্রাইমারি স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার কিছু দিন পরে তত্তচানের চার ঘণ্টা একা বলার মতো কথা ছিলো এ-কথা শুনলে মা ও আগের স্কুলের শিক্ষিকা খুবই অবাক হতো।

তখন তত্তচান লক্ষ্য করে নি যে তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং তার আশেপাশের বয়স্ক লোকেরা তাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তার হাসিখুশি ও সহজে সব কিছু ভুলে যাওয়া স্বভাবের জন্য তাকে নিরীহ দেখাতো। তবে তত্তচান বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়ে মনের গভীরে অস্পষ্টভাবে বোধ করতো সে কোথাও যেন অন্য ছেলেমেয়েদের থেকে কিছুটা ভিন্ন, এবং অন্যরা তাকে একটু ঠাণ্ডা চোখে দেখে থাকে। তবে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে থাকার সময় সে নিশ্চিন্ত, সুখী ও আরাম বোধ করলো।

(এর সঙ্গে হলে চিরকাল থাকা যায়)

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মি. কোবাইয়াশি সোসাকু-র সাথে প্রথম সাক্ষাতের দিনে তত্তচানের এমন মনে হয়েছিলো এবং সৌভাগ্যের কথা তত্তচান সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের মনোভাব হয়েছিলো একই রকম।

টিফিন

স্কুলের ছেলেমেয়েরা যেখানে টিফিন খায় প্রধান শিক্ষক তত্তচানকে সেখানে নিয়ে গেলো। প্রধান শিক্ষক তাকে বললো, 'শুধু টিফিনের সময় ট্রেনে না খেয়ে সবাই মিলনায়তনে একত্র হয়।' কিছুক্ষণ আগে তত্তচান যে-পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে, মিলনায়তন তার শেষ মাথায় ছিলো। তত্তচান দেখলো ছাত্রছাত্রীরা হৈচৈ করে ডেস্ক ও চেয়ার গোলাকার করে সাজাচ্ছে। মিলনায়তনের কোণায় দাঁড়িয়ে সে তা দেখছিলো। সে প্রধান শিক্ষকের জ্যাকেট টান দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আর ছাত্রছাত্রীরা কোথায়?'

প্রধান শিক্ষক উত্তর দিলো, 'এই সব।'

'সব!' তত্তচানের এটা বিশ্বাস হলো না। আগের স্কুলে একটা ক্লাসেই ছিলো প্রায় এর সমান ছাত্রছাত্রী। তত্তচান জিজ্ঞেস করলো, 'সারা স্কুলে পঞ্চাশ জনের মতো ছাত্রছাত্রী?'

প্রধান শিক্ষক বললো, 'হ্যাঁ, তাই।' তত্তচানের মনে হলো সব কিছু আগের স্কুল থেকে ভিন্ন।

সবাই বসার পর ছাত্রছাত্রীদের প্রধান শিক্ষক জিজ্ঞেস করলো, 'সবাই সামুদ্রিক জিনিস ও পাহাড়ী জিনিস এনেছো?'

'জি হ্যাঁ—' বলে সবাই যার যার টিফিন বাক্সের ঢাকনা খুললো।

'কে কী এনেছো, দেখি।' বলে ডেস্ক দিয়ে তৈরি বৃত্তের মধ্যে ঢুকে প্রধান শিক্ষক এক একজনের টিফিন বাক্সের মধ্যে কী আছে দেখে হাঁটছিলো। ছাত্রছাত্রীরা হাসাহাসি করছিলো। কিচিরমিচির করছিলো বলে খুব কোলাহল হচ্ছিলো।

'সামুদ্রিক জিনিস ও পাহাড়ী জিনিস মানে কী জিনিস?' এ-কথা ভেবে তত্তচান খুব মজা পেলো। তবে এ-স্কুল ভীষণভাবে অদ্ভুত ও মজার। টিফিনের সময়টাও যে এতো আনন্দ-উল্লাসময় হতে পারে তা সে আগে জানতো না। আগামীকাল থেকে সে নিজে ওই ডেস্কে বসে প্রধান শিক্ষককে টিফিন বাক্স খুলে "সামুদ্রিক জিনিস ও পাহাড়ী জিনিস" দেখাবে এ-কথা ভেবে সুখ ও আনন্দে তার বুক এমন ভরে ওঠলো যে তত্তচান প্রায় চিৎকার করে উঠলো।

বাক্সের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখছিলো প্রধান শিক্ষক, তার কাঁধের ওপর পড়ছিলো দুপুরের নরম আলো।

আজ থেকে স্কুলে যাই

গতকাল যখন প্রধান শিক্ষক তত্তচানকে বললো যে আজ থেকে তুমি এ-স্কুলের ছাত্রী, তখনই পরের দিনে স্কুলে আসার জন্য তত্তচানের আর তর সইছিলো না। আগে সে এতো আগ্রহের সাথে কখনো অপেক্ষা করে নি। তাই সকালে সাধারণত মা তত্তচানকে ধা মেরে ঘুম থেকে জাগালেও সে প্রায়ই বিছানায় অলসভাবে বসে থাকতো। তবে আজ কেউ তাকে জাগানোর আগেই তত্তচান মোজা পরে কাঁধে স্কুল-ব্যাগ ঝুলিয়ে সবাইর ঘুম থেকে ওঠার অপেক্ষা করছিলো।

এ-বাসায় সবচেয়ে সময়ানুবর্তী হচ্ছে শেপার্ড জাতের কুকুর রকি। তত্তচানের অস্বাভাবিক আচরণে সে সন্দেহপরায়ণ চোখে তত্তচানের দিকে তাকিয়ে তার সারাটা দেহ ছড়িয়ে তত্তচানের গায়ের সাথে নিজের গা ঘেষে কোনো কিছু ঘটনা ঘটার প্রত্যাশায় রইলো।

মা ভীষণ ব্যস্ত। খুব ব্যস্ততার সঙ্গে সে "সামুদ্রিক জিনিস ও পাহাড়ী জিনিসের" টিফিন বানিয়ে তত্তচানকে প্রাতরাশ করালো এবং উলের রশি লাগানো সেলুলয়েডের রেলপাস গলায় ঝুলিয়ে দিলো। রেলপাস যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য এ-ব্যবস্থা। বাবা এলোমেলো চুলে এসে বললো, 'ভাল মেয়ে হোয়ো।'

'অবশ্যই!' বলে তত্তচান দরোজার কাছে এসে জুতো পরে দরোজা খুললো, তার পর সে দ্রুত বেগে বাসার ভেতরের দিকে মাথা ঘুরিয়ে সযত্নে বিনয়ের সাথে মাথা নত করে বললো, 'সবাই শুনুন, আমি যাচ্ছি।'

মা তত্তচানকে বিদায় দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলো। তার চোখে অশ্রু টলটল করছিলো। কেননা তার মনে পড়লো এমন প্রাণবন্ত, ভদ্র, সরল আনন্দচিত্ত তত্তচানকে মাত্র কয়েকদিন আগে বহিষ্কার করা হয়েছিলো। মা অন্তর থেকে প্রার্থনা করলো (নতুন স্কুলে ও যেন ঠিক মতো চলে......)

তবে সে পরমুহূর্তে লাফিয়ে ওঠার মতো বিস্মিত হলো। কেননা মায়ের চোখে পড়লো যে-রেলপাস তত্তচানের গলায় মা ঝুলিয়ে দিয়েছিলো সেটি তত্তচান রকির গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে। মা'র মনে হলো কী যে হবে, তবে সে ঠিক করলো কিছু না বলে দেখা যাক কী হয়। তত্তচান রেলপাস রকির গলায় ঝুলিয়ে উবু হয়ে বসে রকিকে বললো, 'বুঝলে? এ-রেলপাসের রশি তোমাকে মানাবে না।'

ওই রশিটি রকির জন্য ছিলো খুবই লম্বা আর সে পাসটি মাটির ওপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে নিচ্ছিলো।

'বুঝলে? এটা আমার পাস, তোমার নয়। তুমি ট্রেনে চড়তে পারবে না। প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে দেখবো আর স্টেশনের লোকটিও অনুমতি দিলে তুমি স্কুলে আসতে পারবে। তবে জানি না কী হবে।'

রকি কান খাড়া করে আগ্রহভরে তত্তচানের কথার অর্ধেকটা পর্যন্ত শুনছিলো, তবে সে শেষে পাসটিকে একটু চেটে হাই তুললো। তবুও তত্তচান মনপ্রাণ দিয়ে কথা বলতে থাকলো, 'ট্রেন ক্লাসঘর চলে না, তাই আমার মনে হয় ক্লাসঘরে পাস দরকার নেই। যাই হোক আজ বাসায় থাকো।'

রকি এখন পর্যন্ত প্রত্যেকদিন তত্তচানের সাথে হেঁটে-যাওয়া-স্কুল গেট পর্যন্ত যেতো, তারপর একা বাসায় ফিরে আসতো। আজও তেমনই হবে বলে মনে করেছিলো।

তত্তচান রেলপাস রকির গলা থেকে খুলে নিয়ে দামী জিনিসের মতো নিজের গলায় ঝুলালো এবং মা-বাবাকে আরেক বার বললো, 'আমি যাচ্ছি।' এবার পেছনের দিকে ফিরে না তাকিয়ে স্কুল-ব্যাগের খটখট শব্দ করে দৌড়োতে লাগলো। রকি দেহ প্রসারিত করে তার পাশেপাশে ছুটতে লাগলো।

স্টেশনের রাস্তা আর আগের স্কুলে যাওয়া রাস্তা অনেকখানি একই রাস্তা। তাই পথে তত্তচান চেনা কুকুর, বেড়াল ও আগের সহপাঠীদের পাশ দিয়ে চলে গেলো। বার বার তার মনে হলো রেলপাস এদের দেখিয়ে অবাক করে দেবো না কি? তবে স্থির করলো দেরি হলে মারাত্মক, তাই আজ দেখাবে না। এবং সে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলো।

স্টেশনে এসে সাধারণত তত্তচান বাঁয়ে যায়, তবে সে আজ ডান দিকে মোড় নিলো। তাই বেচারা রকি ভীষণ চিন্তিত-মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে চারদিকে তাকাতে লাগলো। তত্তচান ট্রেনের গেট পর্যন্ত চলে গেলো, তবে ফিরে এসে তখনও-সন্দেহ-ভরা মুখভঙ্গি করা রকির মুখে নিজের মুখ লাগালো এবং রকির কানের গন্ধ শুঁকলো ও ভাবলো (অন্যান্য দিনের মতো দুর্গন্ধ; তবে আমার কাছে চমৎকার গন্ধ!) এমনভাবে মুখ সরিয়ে নিয়ে 'বাই, বাই' বললো এবং স্টেশনের লোককে পাস দেখিয়ে একটু উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। রকি নিচু স্বরে ঘেউ ঘেউ করে অনেক্ষণ ধরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা তত্তচানকে নিরীক্ষণ করছিলো।

ট্রেন ক্লাসঘর

গতকাল প্রধান শিক্ষক তত্তচানকে বলেছিলো যে তার ক্লাসঘর ট্রেন। তত্তচান যখন সে ট্রেনে হাত রাখলো, তখন স্কুলের মাঠে কারও মুখ দেখা যায় নি। আগের ট্রেন আজকের ট্রেনের মতো নয়। বাইরে থেকে খোলার জন্য দরোজায় হাতল থাকতো। তত্তচান দু'হাত দিয়ে হাতল ধরে ডান দিকে টানলো, দরোজা সাথে সাথে খুলে গেলো। তত্তচানের বুক ধকধক করে কাঁপছিলো, সে আস্তে মুখ ঢুকিয়ে ভেতরটা দেখলো।

"বাহ্, বাহ্!!'

এখানে মনে হয় পড়াশোনা করতে করতে সব সময় ভ্রমণ করা যায়। জাল দিয়ে বানানো তাকও আছে। যখন এটা চলতো তখন যেমন জানালা ছিলো এখনও তেমনই আছে। শুধু পার্থক্য যা তা হচ্ছে চালকের বসার জায়গায় আছে একটা ব্ল্যাকবোর্ড, ট্রেনের লম্বা সিট তুলে ফেলে ট্রেনের

সামনের দিকে মুখ করে যে ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য সাজানো হয়েছে ডেস্ক ও চেয়ার আর ট্রেনে ধরার জন্য যে ঝুলন্ত চামড়ার দড়ি থাকে, তা নেই। এ-ছাড়া সিলিঙ ও মেঝে ট্রেনে আগে যা কিছু ছিলো সব কিছু আগের মতোই আছে। তত্তচান জুতো খুলে ভেতরে ঢুকে কোনো একটা ডেস্কে বসে দেখলো। আগের স্কুলের মতো প্রায় একই রকমের কাঠের চেয়ার, তবে এমন আরামদায়ক যে অনেকক্ষণ বসতে ইচ্ছে করে। তত্তচান এতো খুশি হলো যে সে দৃঢ়ভাবে মনস্থির করলো এমন পছন্দসই স্কুলে সে কখনো অনুপস্থিত থাকবে না, প্রত্যেক দিন আসবে।

তার পর তত্তচান জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। তখন ওই ট্রেন যদিও চলে না, তবুও স্কুলের মাঠের ফুল ও গাছপালা বাতাসে একটু দুলছিলো বলে তার মনে হলো যেন ট্রেনটা চলছে।

তত্তচান অবশেষে শব্দ করে বলে উঠলো, 'আহ্, আমার কী খুশি লাগছে!' তারপর তার গাল জানালার কাঁচের সাথে লাগিয়ে খুশি হলে সে যে গানটি গায় আবোলতাবোলভাবে সেটি গাইতে শুরু করলো—

আমার খুব খুশি লাগছে
আমার খুব খুশি লাগছে
কেন আমি খুশি যদি আমি তা বলি......

তখনই কেউ ট্রেনে চড়লো। সে ছিলো মেয়ে। সে খাতা ও পেন্সিল-বাক্স স্কুল-ব্যাগ থেকে বের করে ডেস্কের ওপরে রাখলো এবং পায়ের আঙুলের ডগার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জালের তৈরি তাকে তার স্কুল-ব্যাগটি রাখলো। তারপর সে তার ক্লাসে পরার চটির থলিও সেখানে রাখলো। তত্তচান গান বন্ধ করে তাড়াতাড়ি তাকে অনুসরণ করলো। তারপর একটি ছেলে ঢুকলো। সে দরোজার কাছ থেকে বাস্কেট বলের মতো স্কুল-ব্যাগটি জালের তাকে ছুঁড়ে মারলো। জালের তৈরি তাকটির জাল ঢেউ খেলে উঠে স্কুল-ব্যাগটিকে বাইরে ফেলে দিলো। স্কুল-ব্যাগটি পড়লো মেঝেতে। ছেলেটি 'হলো না!' বলে আবার একই জায়গা থেকে জালের তাক লক্ষ্য করে ব্যাগটি ছুঁড়ে মারলো। এবার ব্যাগটি ঠিক মতো পড়লো। ছেলেটি 'পেরেছি'! বলে চিৎকার করে উঠলো এবং তৎক্ষণাৎ 'হলো না' বলে ডেস্কের ওপরে উঠে জালের তাক থেকে স্কুলের ব্যাগটি নিয়ে খাতা,

পেন্সিল বাক্স বের করলো। এগুলো বের করতে সে ভুলে গিয়েছিলো, তাই মনে হয় 'হলো না' বলেছিলো।

এভাবে নয়জন ছাত্রছাত্রী তত্তচানের ট্রেন কক্ষে উঠেছিলো। তারাই ছিলো তোমোএ গাকুএন বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর সব ছাত্রছাত্রী।

আর তারা ছিলো একই ট্রেনে ভ্রমণরত সহপাঠী।

পাঠ

ক্লাসঘরটা ছিলো একটা সত্যিকার ট্রেনের কামরা। এটা তত্তচানের কাছে অদ্ভুত মনে হলো। তারপর আবার যা তত্তচানের কাছে অদ্ভুত মনে হলো তা হচ্ছে ক্লাসঘরে বসার জায়গা। আগের স্কুলে কে কোন ডেস্কে বসবে, কে সামনে, কে পাশে বসবে তা স্থির করাই ছিলো। তবে এ-স্কুলে মেজাজ ও সুবিধা অনুযায়ী পছন্দসই যে-কোনো জায়গায় বসা যেতো।

তাই তত্তচান অনেক কিছু ভেবে চারদিকে তাকিয়ে স্থির করলো সকালে যে-মেয়েটি তার পর ক্লাসঘরে ঢুকেছে সে-মেয়েটির পাশে বসবে। কারণ ওই মেয়েটি লম্বা কানঅলা খরগোশের ছবি আঁকা জাম্পার স্কার্ট পরেছিলো।

সবচেয়ে অবাক লাগার মতো ছিলো এ-স্কুলে পড়ানোর পদ্ধতি।

অন্যান্য স্কুলে প্রথম ঘণ্টা মাতৃভাষার ক্লাস হলে মাতৃভাষা পড়ানো হয়, দ্বিতীয় ঘণ্টা অঙ্কের ক্লাস হলে অঙ্ক শেখানো হয়। এমনভাবে রুটিন মাফিক চলে। এ-বিষয়ে এ-স্কুল একেবারে ভিন্ন।

প্রথম ঘণ্টা শুরু হওয়ার সময় সে দিনের সব ঘণ্টার পাঠ্য বিষয়ের প্রশ্ন শিক্ষিকা ব্ল্যাকবোর্ড ভরে লিখে বলে, 'আচ্ছা, তোমরা যে যার পছন্দসই বিষয় থেকে শুরু করো।' তাই মাতৃভাষা হোক বা অঙ্কই হোক, ছাত্র-ছাত্রীরা নিজনিজ পছন্দসই বিষয় থেকে শুরু করলে কোনো অসুবিধা ছিলো না। প্রত্যেকটি ক্লাসকক্ষে অবশ্য এমন দৃশ্য সাধারণত দেখা যেতো।

যে-ছাত্র রচনা লিখতে পছন্দ করে সে রচনা লিখছে, তার পেছনে যে-ছাত্র পদার্থবিদ্যা পছন্দ করে সে অ্যাল্‌কোহল্‌ বাতিতে আগুন ধরিয়ে কাঁচের পাত্র তাপ দিয়ে বুদবুদ ওঠে এমন কোনো তরল পদার্থে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। এ-পদ্ধতিতে ওপর থেকে ওপরের ক্লাসে উঠতে উঠতে শিক্ষকেরা স্পষ্টভাবে জানতে পারে কোন ছাত্র কোন ধরনের জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট, তাদের আকর্ষণের ধরন কেমন, তাদের চিন্তার ধারা কেমন, কার ব্যক্তিত্ব কেমন, তাই শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের জানার ও পাঠদানের এটা ছিলো উত্তম পদ্ধতি।

আর ছাত্রছাত্রীদের কাছেও খুব আনন্দদায়ক ছিলো যে তারা তাদের প্রিয় বিষয়টি থেকে শুরু করতে পারতো এবং অপ্রিয় বিষয় সব ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগে উত্তর করলে কোনো সমস্যা ছিলো না। তাই কোনো রকমে তারা তার সঠিক উত্তর দিতে পারতো। তাই অধিকাংশই ঘণ্টা ছিলো নিজনিজ পড়াশোনার ঘণ্টা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝতে না পারলে তারা শিক্ষকের কাছে জিজ্ঞেস করতে যেতো বা নিজ সিটে শিক্ষককে ডেকে পড়া বুঝে নিতো এবং আবার প্রশ্ন পেয়ে নিজনিজ পড়াশোনা আরম্ভ করতো। এটা ছিলো সত্যিকার পড়াশোনা। তাই শিক্ষকের কথা ও ব্যাখ্যা অন্যমনস্কভাবে শোনার মতো ব্যাপার সেখানে একেবারে ছিলো না বলা যায়।

তত্তচানরা প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা তখনও নিজেনিজে পড়াশোনা করার মতো বেশি বিষয় পায় নি। তবে নিজের পছন্দসই বিষয় থেকে পড়া শুরু করার ব্যাপারে তারাও ছিলো অভিন্ন।

এমন ছেলে বা মেয়ে ছিলো যে কাতাকানা অক্ষর লিখছে, কেউ ছবি আঁকছে, কেউ পড়ছে। তাদের মধ্যে এমন ছেলে বা মেয়েও ছিলো যে ব্যায়াম করছে। মনে হয় তত্তচানের পাশের মেয়েটি এর মধ্য হিরা-গানা অক্ষর লিখতে শিখেছে, তাই সে খাতায় লেখা অভ্যাস করছিলো। তত্তচানের কাছে সব কিছু অবাক মনে হয় আর সে রোমাঞ্চ অনুভব করে। তবে সকলের মতো সে তখনই পড়াশোনা করতে পারলো না।

এমন সময় তত্তচানের পেছনের ডেস্কের ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাক-বোর্ডের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। মনে হলো সে খাতা নিয়ে ব্ল্যাক-বোর্ডের পাশের ডেস্কে একটি ছেলেকে পড়াচ্ছে যে শিক্ষক তার কাছে

যাচ্ছে। তত্তচান যখন অস্থিরভাবে চারদিকে তাকাচ্ছিলো, তখন সে পেছন থেকে ছেলেটিকে হেঁটে যেতে দেখলো এবং হঠাৎ তার অস্থিরতা থামিয়ে হাতের ওপর থুতনি ভর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে ছেলেটিকে দেখলো। ছেলেটি পা টেনে টেনে হাঁটছিলো। যখন সে হাঁটে তখন তার দেহটা ভীষণভাবে দোলে। তত্তচান প্রথমে মনে করলো যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে অমন করছে। তবে কিছুক্ষণ তাকানোর পর তত্তচান বুঝলো যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করছে না, আপনাআপনি অমন হচ্ছে।

ছেলেটি যখন নিজের ডেস্কে ফিরে আসছিলো, তত্তচান আগের মতো হাতের ওপর থুতনি ভর দিয়ে তার দিকে তাকালো। তাদের চোখাচোখি হলো। তত্তচানকে দেখে ছেলেটি মৃদু হাসি হাসলো। তত্তচানও তাড়াহুড়ো করে মৃদু হাসি দিলো। ছেলেটি যখন পেছনের সিটে বসলো—বসতেও তার অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি সময় লাগে—তখন তত্তচান তার দিকে মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'অমনভাবে হাঁটো কেন?'

ছেলেটি বিনম্র শান্তভাবে উত্তর দিলো। তার স্বর কেন মনে হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত। ছেলেটি বললো, 'আমি পলিও।'

তত্তচান জিজ্ঞেস করলো, 'পলিও?'

তত্তচান এমন শব্দ আগে শোনো নি, তাই জিজ্ঞেস করলো। ছেলেটি একটু নিম্ন কণ্ঠে বললে, 'হুঁ, পলিও। শুধু পায়ে নয়, হাতেও . . .।' এ-কথা বলে ছেলেটি এক একটি লম্বা আঙুল একে অন্যের সাথে জড়াজড়ি করে আছে এমন ধরনের একটা বাঁকা হাত বের করলো। তত্তচান ছেলেটির বাঁ হাতটি দেখতে দেখতে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ভাল হবে না?'

ছেলেটি চুপ করে রইলো। মন্দ কথা জিজ্ঞেস করেছে ভেবে তত্তচান দুঃখ পেলো। তখন ছেলেটি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললো, 'আমার নাম ইয়ামামোতো ইয়াসুআকি। তোমার?'

ছেলেটি প্রাণবন্ত কণ্ঠে বললো। তাই তত্তচান উল্লসিত হয়ে উচ্চ-স্বরে বললো, 'আমি তত্তচান।'

এমন ভাবে ইয়ামামোতো ইয়াসুআকি ও তত্তচানের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো।

ট্রেনের ভেতরের রোদ গরম মনে হলো। কেউ একজন জানালা খুললো।

নব বসন্তের হাওয়া রেল-কামরার ভেতর বয়ে গেলো, ছেলেমেয়েদের চুল গানের সুরের মতো এলোমেলো নেচে নেচে উঠলো।

তত্তচানের তোমোএ গাকুএন বিদ্যালয়ের প্রথম দিন এভাবে শুরু হলো।

সামুদ্রিক জিনিস ও পাহাড়ী জিনিস

হুঁ, অবশেষে তত্তচান যার জন্য আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে আছে সে "সামুদ্রিক জিনিস ও পাহাড়ী জিনিসের" টিফিনের ঘণ্টা এলো। "সামুদ্রিক জিনিস ও পাহাড়ী জিনিস" কী জিনিস? এটা ছিলো প্রধান শিক্ষকের পরিকল্পিত টিফিনে খাওয়ার তরকারি। টিফিনের তরকারি সম্পর্কে সাধারণত বলা হয়ে থাকে—"ভেবে চিন্তে তৈরি করবেন যাতে ছেলে-মেয়েরা কোনোটাকে পছন্দ বা কোনোটাকে অপছন্দ করে" বা "অনুরোধ করি তা যেনো সব দিকে পুষ্টিকর হয়।" "তবে প্রধান শিক্ষক এ একটি কথা বলে ছেলেমেয়েদের পরিবারের লোকদের অনুরোধ করলো, "ছেলেমেয়েদের সাথে সামুদ্রিক ও পাহাড়ী জিনিস পাঠাবেন।"

পাহাড়ী জিনিস ...... উদাহরণ স্বরূপ শাকসব্জি, মাংস (মাংস পাহাড়ে পাওয়া যায় না, তবে মোটামুটিভাবে ভাগ করলে গরু, শুয়োর ও মোরগ ইত্যাদি স্থলে বাস করে তাই এগুলো পাহাড়ী জিনিস) সামুদ্রিক জিনিস হচ্ছে মাছ ওৎসুকুদানি ইত্যাদি। অনুরোধ করেছিলো ভুল না করে এ দুই ধরনের জিনিস টিফিনের খাবার হিশেবে দিতে হবে।

তত্তচানের মা অত্যন্ত মুগ্ধ হলো যে এতো সহজে দরকারী কথা প্রকাশ করার মতো বয়স্ক লোক প্রধান শিক্ষক ছাড়া আর বেশি কেউ নেই। তা ছাড়া মা'র কাছে বিস্ময়কর মনে হলো যে পাহাড় ও সমুদ্র এই দুই ভাগে ভাগ করলে তরকারি কথা ভাবা আর কঠিন থাকে না। তা ছাড়া প্রধান শিক্ষক বলেছে পাহাড় ও সমুদ্রের কথা বলা হলেও "এটা বাধ্যতামূলক নয়" ও "বিলাসিতা করো না" তাই পাহাড়ী জিনিস হিশেবে "কিম্পিরা-গোবো (ভাজা বার্ডোকশব্জি বিশেষ) ও অম্লেট" আর সামুদ্রিক জিনিস হিশেবে শুকনো বোনীটো মাছের কুচির মতো জিনিসই

যথেষ্ট। আরো সহজে পাহাড়ী ও সামুদ্রিক জিনিসের উদাহরণ দিলে নোরি (এক ধরনের সামুদ্রিক গুল্ম) ও উমেবোশি (কুলের আচার)"-র কথা বলা যায়।

প্রথম বার দেখে তত্তচানের যেমন হিংসা হয়েছিলো, তেমনই টিফিনের সময় প্রধান শিক্ষক ছেলেমেয়েদের টিফিন বক্সের ভেতর উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলো, 'সামুদ্রিক জিনিস ও পাহাড়ী জিনিস আছে?' এ-কথা বলে এক একজনের খাবার দেখলো। এটা খুব আনন্দের ব্যাপার ছিলো। আর কোনটি সামুদ্রিক জিনিস ও কোনটি পাহাড়ী জিনিস, তা আবিষ্কার করাও ছিলো ভীষণ রোমাঞ্চকর।

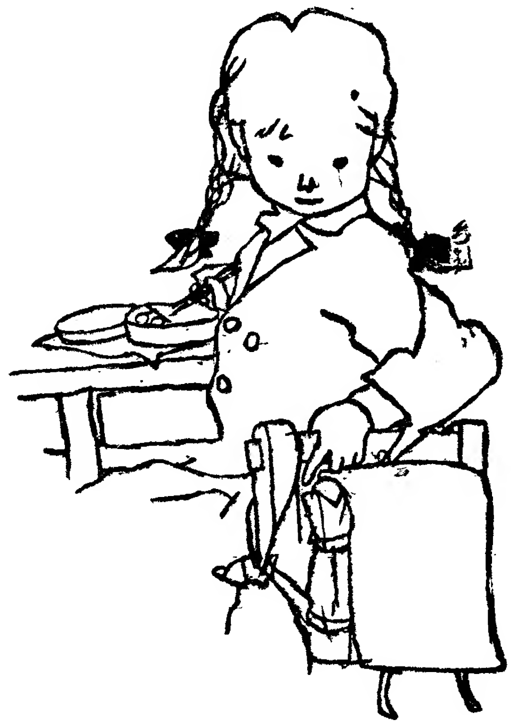

কোনো কোনো মা কখনো কখনো এটা সেটা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতো, তাই ঠিক মতো খাবার তৈরি করতে পারতো না। আর তার শিশু নিয়ে আসতো শুধু পাহাড়ী জিনিস বা সামুদ্রিক জিনিস। এমন অবস্থায়

পড়লেও ওই শিশুটির চিন্তার কোনো কারণ ছিলো না। কারণ টিফিন বাক্স দেখে দেখে এগিয়ে চলা, প্রধান শিক্ষকের এটা ছিলো রুটিন ওয়ার্ক। আর তার পেছনে পেছনে রান্নাঘরের শাদা এ্যাপ্রন পরে দুই হাতে দু'টি কড়াই হাতে করে তাকে অনুসরণ করা ছিলো তার স্ত্রীরও, নিত্যদিনের কাজ। আর প্রধান শিক্ষক কোনো ছাত্রের সামনে থেমে 'সমুদ্র!' বললে তার স্ত্রী সামুদ্রিক খাদ্যের কড়াই থেকে দুখানির মতো সিদ্ধ চিকুওয়া (মাছের রোল) উঠিয়ে টিফিন বাক্সের ঢাকনার ওপর রাখতো আর 'পাহাড়!' বললে অন্য হাতের পাহাড়ী খাদ্যের কড়াই থেকে বেরিয়ে আসতো সয়াসস দিয়ে সিদ্ধ করা আলুর একটা বড় টুকরো।

এমন অবস্থায় কেউ 'চিকুওয়া পছন্দ করি না' এ-ধরনের কথা বলতো না এবং কেউ মনে করতো না যে তার খাবার সবচেয়ে ভাল, আর অন্য কারোর খাবার খারাপ। বরং সামুদ্রিক ও পাহাড়ী উভয় জিনিস আছে—এতে খুশি হয়ে তারা হাসাহাসি আর চেচামেচি করতো।

অবশেষে তত্তচানও বুঝতে পারলো "সামুদ্রিক ও পাহাড়ী জিনিস" কী? তখন সে একটু চিন্তিত হলো এ-কথা ভেবে যে সকালে খুব তাড়াহুড়ো করে তৈরি টিফিন ঠিক হয়েছে কি না। তবে যখন তত্তচান টিফিন বাক্সের ঢাকনা খুললো, তখন এমন চমৎকার টিফিন দেখলো যে সে প্রায় 'বাহ্' বলে ওঠার উপক্রম করে মুখে হাত দিলো। তত্তচানের টিফিন বাক্সে হলুদ রঙের ভাজা ডিম, মটরশুটি, বাদামী রঙের দেন্‌বু ও পিঙ্ক রঙের গরম করা কড মাছের ডিমের কুচি,—এগুলো রঙিন ফুলের বাগানের নকশার মতো সাজানো ছিলো।

প্রধান শিক্ষক তত্তচানের টিফিন বাক্সের ভেতরে উঁকি দিয়ে বললো, 'কী সুন্দর!'

তত্তচান খুশি হয়ে বললো, 'আমার মা ভাল রাঁধতে পারে।'

প্রধান শিক্ষক বললো, 'তাই না কি?' আর বাদামী রঙের দেন্‌বু-র দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তত্তচানকে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা সমুদ্রের না পাহাড়ের?'

তত্তচান দেন্‌বু-র দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবলো, 'এটা কোনটা'? (এটা মাটির রঙের, তাই মনে হয় পাহাড়ের, তবে ঠিক জানি না।) এমন ভেবে সে উত্তর দিলো, 'ঠিক জানি না।'

তখন প্রধান শিক্ষক উচ্চ স্বরে সবাইকে জিজ্ঞেস করলো, 'দেন্‌বু কোনটা, সমুদ্রের না পাহাড়ের?'

একটু ভেবে সবাই এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, 'পাহাড়!' 'সমুদ্র!' কোনটাই স্থির হলো না।

সবাই চিৎকার করার পর প্রধান শিক্ষক বললো, 'ঠিক আছে? দেন্‌বু সমুদ্রের।'

একটি মোটা ছেলে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

প্রধান শিক্ষক ডেস্কের বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করলো, 'মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে ভেজে দেন্‌বু তৈরি করা হয়।'

সবাই বুঝেছে, এমন স্বরে বললো, 'হু-ন্' তখন একজন বললো, 'স্যার, তত্তচানের দেন্‌বু দেখতে পারি?'

'ঠিক আছে।'

সারা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়ে দল বেঁধে এসে তত্তচানের দেন্‌বু দেখলো। কোনো কোনো ছেলেমেয়ে দেন্‌বু কী জিনিস জানে, আগে খেয়েছে, তবে শিক্ষকের কথা শুনে কয়েকজন ছেলেমেয়ের আগ্রহ জাগে, আর তাদের বাসার দেন্‌বু ও তত্তচানের দেন্‌বু-র কোনো পার্থক্য আছে কি না তা দেখার ইচ্ছে হয়। দেন্‌বু দেখতে আসা ছেলেমেয়েদের কয়েকজন দেন্‌বুর গন্ধ শুঁকলো, তাই তত্তচান অনেকটা চিন্তিত হলো যে তাদের নাকের শ্বাসে তার দেন্‌বু না উড়ে যায়।

প্রথম বার টিফিনের সময় তত্তচানের বুক একটু ধুকধুক করছিলো, তবে তার আনন্দ লাগছিলো "কোনটা সমুদ্রের জিনিস, কোনটা পাহাড়ের জিনিস" তা ভাবা বেশ মজার বলে। সে বুঝলো দেন্‌বু মাছ থেকে তৈরি। মা "সামুদ্রিক জিনিস ও পাহাড়ী জিনিস" ঠিক মতো সাজিয়েছে—সব কিছু ভাল হয়েছে—তত্তচান খুব খুশি হলো আর দুই নম্বর সুখের কথা মায়ের তৈরি টিফিন খেতে ছিলো সুস্বাদু।

ভাল করে চিবাও

এরপর সাধারণত 'ইতাদাকিমাস্থ' (কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করছি) বলে খাওয়া শুরু করা হয়, তবে এই তোমোএ গাকুএন বিদ্যালয়ে এ ক্ষেত্রও ছিলো

ভিন্ন। এ-সময় ছাত্রছাত্রীরা সবাই একসঙ্গে গান শুরু করে। প্রধান শিক্ষক ছিলো সঙ্গীতজ্ঞ, তাই সে 'টিফিন খাওয়ার আগের গান' নামে একটি গান লিখেছিলো। এ-গানের সুরকার একজন ইংরেজ। প্রধান শিক্ষক শুধু কথাগুলো বসিয়ে ছিলো। তবে সঠিকভাবে বললে বলতে হয়, প্রধান শিক্ষক একটি বিখ্যাত মূল সুরের সাথে তার কথাগুলো যোগ করেছিলো মাত্র। ওই মূল সুর হচ্ছে বিখ্যাত "বাইয়া যাও তোমার নৌকো (Row Your Boat)"।

রোউ রোউ রোউ ইওর বোট
জেন্টলি ডাউন দি স্ট্রিম
মেরি মেরি মেরি মেরি
লাইফ ইজ বাট এ ড্রিম

এ সুরের সাথে প্রধান শিক্ষকের যোগ করা কথাগুলো ছিলো এমন:

ভাল করে চিবাও
খাবার জিনিস
চিবাও চিবাও চিবাও চিবাও
খাবার জিনিস

যখন এ-গান শেষ হয়, তখন 'ইতাদাকিমাসু' বলে খাবার শুরু করে।

"ভাল করে চিবাও" খাপে খাপে মিলে গেলো "রোউ রোউ রোউ ইওর বোট"-র সুরের সাথে। তাই এমনকি এ-স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়া শেষ করার অনেক বছর পরেও বিশ্বাস করতো যে এ-সুর টিফিনের আগের গানের সুর। নিজের কয়েকটা দাঁত পড়ে গিয়েছিলো বলে হয়তো প্রধান শিক্ষক এ-গান রচনা করেছিলো। সে সব সময় ছাত্রছাত্রীদের বলতো ভাল করে চিবাও, তবে আসল কথা হচ্ছে ধীরে ধীরে সময় নিয়ে প্রফুল্লচিত্তে নানা রকম আলাপ করতে করতে খাওয়া উচিত। আর এ-কথাটা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য হয়তো সে এ-গান রচনা করেছিলো। উচচস্বরে সবাই এ-গান গাওয়ার পর 'ইতাদাকিমাসু' বলে "সামুদ্রিক জিনিস ও পাহাড়ী জিনিস" খেতে শুরু করলো। তত্তচানও সকলের মতো করলো।

মিলনায়তনে ক্ষণিকের জন্য নীরবতা নেমে এলো।

হাঁটাহাঁটি

টিফিনের পর সবার সাথে তত্তচান স্কুলের মাঠে দৌড়াদৌড়ি করলো এবং ট্রেনের ক্লাসঘরে ফিরে এলো। তখন শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা সবাই আজ ভাল মতো পড়াশোনা করেছো, তাই দুপুর বেলা কী করতে চাও?'

(যা অমি করতে চাই, তা হচ্ছে......) তত্তচান এমন ভাবার আগে সবাই বলে উঠলো, 'হাঁটাহাঁটি।'

'তাহলে চলো।' বলে শিক্ষিকাও উঠে দাঁড়ালো। সবাই ট্রেনের দরোজা খুলে জুতো পরে ছুটে বেরুলো।

তত্তচান আগেও বাবা ও কুকুর রকির সাথে হাঁটতে গিয়েছে, তবে স্কুলেও হাঁটাহাঁটির ঘণ্টা আছে, তাই সে অবাক হলো। হাঁটাহাঁটি করতে তার খুব ভাল লাগে, তাই তত্তচানও ব্যস্ততার সাথে জুতো পায়ে দিলো।

পরে সে এ-কথা বুঝলো যে শিক্ষিকা সকালের প্রথম ঘণ্টায়ই সে-দিনের সব ঘণ্টার প্রশ্ন ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেয়, যদি সবাই খেটেখুটে সকালের মধ্যে সব কাজ শেষ করে ফেলে, তাহলে সাধারণত বিকেলের ঘণ্টাটা হয় হাঁটাহাঁটির ঘণ্টা। এটা প্রথম শ্রেণী ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে একই রকম ছিলো।

স্কুলের গেট দিয়ে বের হওয়ার পর প্রথম শ্রেণীর নয়জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষিকাকে নিজেদের মাঝখানে রেখে ছোট নদীর বাঁকে বাঁকে হাঁটতে লাগলো। নদীর উভয় পারে মাত্র কিছু দিন আগে পর্যন্ত ফুলে ফুলে ভরা সারি সারি চেরি ফুলের বড় বড় গাছ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো ছিলো। আর যত দূর দেখা যায় সর্ষে ফুলের খেত। এখন জিইয়ুগাওকা এলাকার এ-নদী ভরে মাটি ফেলে যেখানে ঠাসাঠাসিভাবে বাসস্থান (অ্যাপার্ট-মেন্ট হাউস) আর দোকানপাট তৈরি করা হয়েছে। সেকালে সেখানকার অধিকাংশ ছিলো ক্ষেতখামার।

খরগোশের ছবি আঁকা জাম্পার স্কার্ট পরা মেয়েটি বললো, 'হাঁটাহাঁটির জায়গা হচ্ছে কুহোন্‌বুৎসু।' তার নাম ছিলো "সাক্কোচান"।

সাক্কোচান আরো বললো, 'কুহোন্‌বুৎসু-র পুকুরের কাছে কিছু দিন আগে সাপ দেখেছিলাম।' আরও বললো, 'শুনেছি কুহোন্‌বুৎসু-র মন্দিরের পুরোনো কুয়োর মধ্যে উল্কা ছুটে এসে পড়ে।'

তারা সবাই নিজ নিজের মতো কথা বলে হৈচৈ করে হাঁটতে থাকে। আকাশ ছিলো নীল। প্রচুর প্রজাপতি এখানে সেখানে ডানা দুলিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলো।

দশ মিনিটের মতো হাঁটার পর শিক্ষিকা থামলো আর হলুদ রঙের সর্ষে ফুলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'এটা সর্ষে ফুল, তাই না? কিভাবে ফুল ফোটে, জানো?'

তার পর পুংকেশর ও গর্ভকেশরের গল্প বললো। ছাত্রছাত্রীরা পথে উবু হয়ে বসে সর্ষে ফুল দেখলো। শিক্ষিকা বললো, প্রজাপতি ফুল ফোটাতে সাহায্য করছে। দেখে মনে হলো বেশ ব্যস্ততার সাথে প্রজা-পতি সত্যিই সাহায্য করছে।

তার পর শিক্ষিকা আবার হাঁটতে শুরু করলো, তাই তারাও সবাই দেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো।

কেউ বললো, 'পুংকেশর ও সিংহকেশর ভিন্ন জিনিস, তাই না?'

তত্তচানের মনে হলো ওগুলো ভিন্ন জিনিস। তবে সে ঠিক জানে না। এখন সকলের মতো ভাল করে বুঝলো পুংকেশর ও গর্ভকেশর অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তার পর আবার পাঁচ মিনিটের মতো হাঁটলো। গাছপালায় ভরা একটা ছোট বন দেখা গেলো, ওটা ছিলো কুহোন্‌বুৎসু-র মন্দির।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে সবাই যার যা দেখতে ইচ্ছে হলো তার দিকে চেঁচামেচি করে ছুটতে লাগলো।

সাক্কোচান বললো, 'উল্কার কুয়ো দেখতে যাবে না?'

তত্তচান নির্দ্বিধায় 'হুঁ' বলে সাক্কোচানের পেছনে পেছনে ছুটলো। কুয়ো হলেও এটি পাথরের মতো জিনিস দিয়ে তৈরি। প্রায় দুজনের বুক সমান উঁচু। তার ওপর ছিলো কাঠের ঢাকনা। দুজন এক সঙ্গে ঢাকনা তুলে নিচের দিক তাকালো। ভেতরটা ছিলো নিকষ অন্ধকার। তারা ভাল করে দেখলো, সেখানে শুধু কংক্রিটের বা পাথরের পিণ্ডের মতো জিনিস পড়েছিলো। তত্তচান যেমন কল্পনা করেছিলো তেমন ঝিকমিক করা তারা কোথাও দেখা গেলো না। অনেকক্ষণ ধরে কুয়োর ভেতর মাথা ঢুকিয়ে রাখার পর মাথা তুলে সাক্কোচানকে জিজ্ঞেস করলো, 'তারা দেখেছো?'

সাক্কোচান মাথা দুলিয়ে বললো, 'এক বারও দেখি নি।'

তত্তচান ভাবলো কেন তারা ঝিকমিক করছে না এবং বললো, 'তারা এখন ঘুমোচ্ছে, না?'

সাক্কোচান ডাগর চোখ আরো বড় করে বললো, 'তারা বুঝি ঘুমোয়?'

তত্তচান খুব নিশ্চিত ছিলো তাই তাড়াতাড়ি বললো, 'আমার মনে হয় তারা দিনের বেলা ঘুমোয় আর রাতে উঠে ঝিকমিক করে।'

তার পর তারা সবাই দেবরাজের মূর্তির পেট দেখে হাসলো, মন্দিরের হালকা অন্ধকার হলের ভেতরে বৌদ্ধ মূর্তির দিকে (একটু ভয় পেয়ে) উঁকি দিলো। তেন্‌গু (লম্বা নাকঅলা দৈত্য)-র বড় পায়ের ছাপ আঁকা পাথরে নিজদের পা রেখে তুলনা করলো, পুকুরের চার দিকে ঘুরলো আর যারা নৌকোয় ছিলো, তাদেরকে 'আদাব' বললো, সমাধির আশে-পাশের কালো তেলতেলে পাথর দিয়ে পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি খেললো, এবং ভীষণ আনন্দ পেলো। বিশেষ করে তত্তচানের জন্য এই অভিজ্ঞতা ছিলো প্রথম। তাই সে উত্তেজিত হয়ে একটার পর একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করে চিৎকার করলো।

বসন্ত সূর্যের আলো একটু ঢলে পড়লো।

শিক্ষিকা বললো, 'এবার ফেরা যাক্।' আবার সবাই সর্ষে ফুল ও চেরি গাছের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে লাইন ধরে স্কুলের দিকে হাঁটতে লাগলো।

এ-হাঁটাহাঁটি ওই শিশুদের জন্য মুক্তির আর খেলা করার সময়, কিন্তু তারা লক্ষ্য করে নি যে এই হাঁটাহাঁটির ফলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পাঠ হয়ে গেলো।

তত্তচান সবার সাথে এমন গভীর বন্ধুত্ব পাতালো যে তার মনে হলো অনেক দিন ধরে তাদের সাথে আছে। তাই ফেরার পথে সে সবাইকে উঁচু কণ্ঠে বললো, 'কালকেও হাঁটাহাঁটি করবো।'

সবাই লাফিয়ে উঠে বললো, 'আচ্ছা, আমরা তাই করবো।'

প্রজাপতিরা তখনও ব্যস্ততার সাথে কাজ করে চলছিলো আর কাছে দূরে শোনা যাচ্ছিলো পাখির কলকাকলী।

তত্তচানের বুকটা ভরা ছিলো আনন্দঘন পুলকে।

বিদ্যালয় সংগীত

তোমোএ গাকুএন বিদ্যালয়ের প্রতিদিন তত্তচানের জন্য নতুন নতুন বিস্ময়ে ভরা ছিলো।

প্রতিদিন সে স্কুলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকে যে কখন সকাল হবে তার জন্য পরম আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে। যখন সে স্কুল থেকে ফিরে আসে তখন সে কুকুর রকি ও মা-বাবাকে বলতে শুরু করে সে দিন সে স্কুলে কী কী করেছে আর কী মজা পেয়েছে বা কত বিস্মিত হয়েছে ইত্যাদি।

'তুমি একটু কথা বন্ধ করে খাও, কেমন?' অবশেষে মা এ-কথা বললেও তত্তচানের কথা তবুও থামে না। বেশ কিছু দিন ধরে তত্তচান এ-স্কুলে পড়লেও আগের মতোই প্রত্যেক দিন তার বলার মতো কথার পাহাড় জমে হয়ে থাকতো।

তার এতো বলার মতো কথা আছে জেনে মা কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দ বোধ করতো।

একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে ট্রেনের মধ্যে হঠাৎ মনে হলো 'আচ্ছা, তোমোএ স্কুলে কোনো বিদ্যালয় সংগীত নেই?' এ-কথা মনে হতেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার স্কুলে পেঁছে যেতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু তখনও তার স্টেশন আরও দুই স্টেশন পরে। তবে সে দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে যাতে জিইয়ুগাওকা স্টেশনে ট্রেন পেঁছনোর সাথে সাথে বের হতে পারে। তাই 'প্রস্তুত, যাও!' ভঙ্গিতে অপেক্ষা সে করতে লাগলো। তার স্টেশনের আগের স্টেশনে যখন দরোজা খুললো, তখন ট্রেনে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিলো একজন মহিলা। সে দরোজার কাছে তত্তচানের 'প্রস্তুত, যাও' ভঙ্গি দেখে মনে করলো যে সে নেমে যাবে, তবে তত্তচান ওই ভঙ্গিতে অনড়, তাই সে 'এই মেয়েটির কী হলো?' বলে কামরায় ঢুকে পড়লো।

এমন অবস্থায় যখন ট্রেন তত্তচানের স্টেশনে পেঁছলো, তখন তত্তচানের দ্রুত নেমে যাওয়ার দৃশ্যটা ছিলো অবর্ণনীয়। তখনও পুরোপুরি না-থামা ট্রেন থেকে তরুণ কণ্ডাক্টর যখন চৌকশ ভঙিতে তার একটা পা প্লাটফর্মে রেখে নামতে নামতে বললো, 'জিইয়ুগাওকা স্টেশন! যারা নামছেন তাঁরা......' ততক্ষণে তত্তচান টিকেট গেট থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো।

স্কুলে পেঁছে ট্রেন-ক্লাসঘরে ঢুকেই তত্তচান তার আগে আসা ইয়ামানোউচি তাইজিকে জিজ্ঞেস করলো, 'শোনো, তাইচান, এ-স্কুলে বিদ্যালয়-সংগীত আছে?'

তাইচানের পছন্দ পদার্থবিদ্যা। সে অত্যন্ত চিন্তাশীল কণ্ঠে উত্তর দিলো, 'নেই তো মনে হচ্ছে।'

তত্তচান একটু গম্ভীর হয়ে বললো, 'হু-ন্' 'আমার মনে হয় থাকা উচিত। আগের স্কুলে ভীষণ চমৎকার গান ছিলো!' আর সে গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করলো:

'সেঞ্জোকুইকে পুকুর অগভীর,
তবে পণ্ডিতদের বক্ষ সুগভীর।'

এটা আগের স্কুলের সংগীত। তত্তচান অল্প কয়েকদিন মাত্র ওই স্কুলে গিয়েছিলো আর ওই গানে এমন শব্দ ছিলো যা প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য কঠিন। তবে তত্তচান হুবহু মনে রেখেছিলো। (তবে শুধু এ অংশটুকুই মাত্র)

শুনে তাইচান একটু মুগ্ধ হয়ে বার দুই মাথা হালকাভাবে দুলিয়ে বললো, 'হু-ন্'।

এরমাঝে অন্য ছাত্রছাত্রীরাও এসে পেঁছেছে আর তারাও তত্তচানের কঠিন শব্দ শুনে শ্রদ্ধাশীল হয়ে আকুল কামনার সাথে বললো, 'হু-ন্'।

তত্তচান বললো, 'শোনো, প্রধান শিক্ষককে স্কুল-সংগীত রচনা করতে বলা যাক।'

তার প্রস্তাব সকলেরই মনে ধরলো, তাই তারা 'তাই বলবো, তাই বলবো।' বলে দল বেঁধে প্রধান শিক্ষকের ঘরে গেলো।

তত্তচানের গান শুনে আর সবার অনুরোধ শুনে, প্রধান শিক্ষক বললো, 'ঠিক আছে। আমি আগামীকাল সকালের মধ্যে তৈরি করবো।'

'কথা দাও।' বলে সবাই আবার দল বেঁধে ক্লাসঘরে ফিরে গেলো।

পরদিন সকালের কথা। প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে প্রত্যেক ক্লাসে নোটিস এলো, 'সবাই স্কুলের মাঠে সমবেত হও।' তত্তচানরা আগ্রহভরে দুরু দুরু বুকে স্কুল মাঠে জড়ো হলো। প্রধান শিক্ষক স্কুল মাঠের মাঝখানে ব্ল্যাকবোর্ড নিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, এটা তোমাদের তোমোএ

বিদ্যালয়-সংগীত।' আর সে ব্ল্যাকবোর্ডে পাঁচটা লাইন টেনে তার ওপর ব্যাঙের বাচ্চার মতো নিম্নরূপ স্বরলিপি সাজানো হলো।

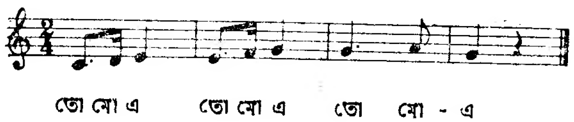

তারপর কণ্ডাক্টরের মতো হাত উঠিয়ে প্রধান শিক্ষক বললো, 'এসো, এক সঙ্গে গান গাইবো।' তারপর হাত নামালো।

সারা স্কুলের পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী প্রধান শিক্ষকের সাথে গলা মিলিয়ে গাইলো, 'তোমোএ, তোমোএ, তোমোএ।'

একটু বিরতির পর তত্তচান জিজ্ঞেস করলো, 'এইটুকু মাত্র?'

প্রধান শিক্ষক গর্বের সাথে উত্তর দিলো, 'হুঁ'।

ভীষণ হতাশ হয়ে তত্তচান শিক্ষককে বললো, 'গানটি আরো কঠিন হওয়া উচিত ছিলো। সেঙ্গোকু পুকুর অগভীর—এমন ধরনের।'

শিক্ষক তার মুখ লাল করে হাসতে হাসতে বললো, 'ভাল লাগছে না বুঝি? আমার মনে হয় এটা খুব ভালো।'

অবশেষে অন্য ছেলেমেয়েরাও 'এমন সোজা গান দরকার নেই।', বলে অসম্মতি জানালো।

শিক্ষককে একটু ব্যথিত বলে মনে হলো, তবে সে রাগ না করে গানটি মুছে ফেললো। তত্তচানের মনে হলো তারা শিক্ষকের সাথে অভদ্রতা করেছে, তবে তার মনে হলো তারা আরো একটু গুরুগম্ভীর গান আশা করেছিলো। তাই কোন উপায় ছিলো না।

আসল কথা হচ্ছে এমন সহজ আর "স্কুল ও ছেলেমেয়েদের ভালবাসে" এমন প্রধান শিক্ষকের অনুভূতি মিশ্রিত বিদ্যালয়-সংগীত আর একটিও ছিলো না, এ-সত্যটি ছেলেমেয়েরা তখন বোঝে নি। তারপর ছেলেমেয়েরাও স্কুল-সংগীতের কথা ভুলে গেলো আর শিক্ষকেরও মনে হলো ওটার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলার পর তোমোএ স্কুলের কোনো বিদ্যালয়-সংগীত রইলো না।

আগের জায়গায় রাখো

আজ ছিলো তত্তচানের জন্য অনেক কাজের দিন। কারণ তার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস টাকা রাখার ব্যাগটি স্কুলের টয়লেটে পড়ে গিয়েছিলো। তাতে টাকা-পয়সা একেবারে ছিলো না, তবে সেটি এতো মূল্যবান ছিলো যে সেটিকে টয়লেট পর্যন্ত নিয়ে যেতে হতো। ওটি লাল, হলুদ ও সবুজ রঙের রিবনে তৈরি। ওটি ছিলো চার কোণা, এবং চ্যাপ্টা, তাতে ছিলো তিন কোণা ঝুলন্ত কাপড়ের ঢাকনা। হুকের ওপরে ছিলো স্কচ টেরিয়ারের মতো ব্রেচি লাগানো। ব্যাগটি ছিলো খুবই সুরুচিশীল।

ছেলেবেলা থেকে তার এমন অদ্ভুত অভ্যাস ছিলো যে টয়লেটে গিয়ে কাজ শেষ করার পর নিচের দিকে উঁকি দিয়ে দেখতো সে। এ-কারণে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই খড়ের বা লেইস লাগানো অনেক হ্যাট নিচে পড়ে হারিয়ে গিয়েছিলো। এখনকার মতো সেকালে টয়লেটে ফ্লাশ পদ্ধতি ছিলো না। তখন হাতা দিয়েই ময়লা জল তোলা হতো। নিচে গর্তে ছিলো ময়লার ট্যাঙ্ক। তাই তার হ্যাট প্রায়ই তাতে ভাসতো। সে কারণে মা তত্তচানকে সবসময় বলতো, 'কাজ শেষ হলে নিচের দিকে তাকিও না।'

একদিন স্কুল শুরু হওয়ার আগে টয়লেটে গিয়ে ভুল করে নিচের দিকে তাকালো তত্তচান। সে মুহূর্তে আলতোভাবে হাতে ধরা মূল্যবান মানি-ব্যাগটি টুপ করে নিচে পড়ে গেলো। তত্তচান যখন 'আ-আ!!' করে চিৎকার করে উঠলো, তখন মানি-ব্যাগটি নিচে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তখন তত্তচান কী করলো, তা বলা দরকার। সে কাঁদলো না, আশাও ছাড়লো না, তখনই সে স্কুলের কাজের লোকটির জিনিসপত্র রাখার ঘরের দিকে ছুটে গেলো আর বাগানে পানি দেয়ার হাতাটা কাঁধে করে নিয়ে এলো। তত্তচান ছোট আর হাতার হাতলটি ছিলো তার দ্বিগুণের মতো বড়। তবুও সে দমলো না। তত্তচান স্কুলের পেছনের দিকে ঘুরে গিয়ে ময়লার ট্যাঙ্কের মুখ খুঁজলো। সে ভাবলো মুখটি টয়লেটের বাইরের দেয়ালের পাশে আছে, তবে কোথাও পাওয়া গেলো না। অনেক

খোঁজাখুঁজির পর তত্তচান দেখলো দেয়াল থেকে মিটার খানেক দূরে আছে একটা গোলাকার কংক্রিটের ঢাকনা। তার মনে হলো ওটা হয়তো ময়লার ট্যাঙ্কের মুখ। কষ্ট করে তত্তচান সেটা সরালো। সেখানে একটা গর্ত দেখতে পেলো। নিঃসন্দেহে সেটাই ছিলো ময়লার ট্যাঙ্কের মুখ। মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিয়ে তত্তচান বললো, 'কুহেনুবুৎসু-পুকুরের মতো বড় মনে হয়।'

তখন শুরু হলো তত্তচানের আসল কাজ। সে হাতাটি ভেতরে ঢুকিয়ে ময়লা তুলতে লাগলো। যেখানে মানি-ব্যাগটি পড়েছিলো, তত্তচান প্রথমে সেখানে হাতল চালালো, তবে ট্যাঙ্কটি ছিলো খুব গভীর আর অন্ধকার। ওপরের পায়খানাতে তিনটি খোপ, তাই তার নিচের জায়গাটা একটা পুকুরের মতো, এবং খুব বড়। মাথা বেশি নিচে ঝুঁকলে ভেতরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে তাই সে শুধু হাতা দিয়ে ময়লা উঠিয়ে দেখলো। তুলে নেয়া জিনিস-পত্র গর্তের আশেপাশে স্তূপাকারে রাখলো। প্রত্যেক বার সে ভালো করে দেখলো ব্যাগটি আছে কি না। সে ভেবেছিলো সহজে পাওয়া যাবে, কিন্তু ব্যাগটি কোথায় যে লুকিয়ে আছে, হাতার মধ্যে উঠছে না। এর মাঝে ক্লাস শুরু হওয়ার ঘণ্টা বাজতে শোনা গেলো। (কী করবো?)-তত্তচান ভাবলো, কষ্টকরে এতোটা করেছি, ভেবে সে ঠিক করলো খুঁজতে থাকবে। সে আগের চেয়ে আরো বেশি উদ্যমে ময়লা তুলে বড় স্তূপ করে ফেললো।

তখন প্রধান শিক্ষক পায়খানার পেছনের পথ দিয়ে আসছিলো। শিক্ষক তত্তচানের কর্মকাণ্ড দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কী করছো?'

হাত থামিয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না বলে তত্তচান হাতা তুলতে তুলতে উত্তর দিলো, 'মানিব্যাগ পড়ে গেছে।'

'তাই?', বলে প্রধান শিক্ষক তার হাত দুটি পেছনের দিকে মুঠো করে ধরে তার সব সময়ের হাঁটার ভঙ্গিতে কোথাও চলে গেলো।

আরো কিছুক্ষণ কাটলো। সে এখনও মানিব্যাগ পায় নি। অবর্জনার স্তূপ ক্রমশ উঁচু হতে থাকলো।

কিছুক্ষণ পর প্রধান শিক্ষক আবারও তার পাশ দিয়ে চলে গেলো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'পেয়েছো?'

তত্তচানের শরীর ঘামে জরজর, গাল টকটকে লাল হয়ে গেছে, চার পাশে ময়লার স্তূপ। তত্তচান উত্তর দিলো, 'না' শিক্ষক তত্তচানের মুখের

কাছে মুখ এনে বন্ধুর মতো স্বরে বললো, 'কাজ শেষ হয়ে গেলে সবটা ময়লা আবার ট্যাঙ্কে ভরে রেখো।'

একটু আগের মতো আবার সে কোথাও চলে গেলো।

তত্তচান প্রাণবন্তভাবে উত্তর দিলো, 'জী' এবং আবার কাজে হাত লাগালো। হঠাৎ তত্তচানের মাথায় একটি বুদ্ধি এলো সে স্তূপের দিকে তাকালো।

'কাজ শেষ হলে সবটা ট্যাঙ্কে ভরে রাখতে পারবো, তবে পানির কী করবো?

ময়লার পানিটুক দ্রুত মাটিতে শুষে গেছে, তাই তখন পানি ছিলো না। তত্তচান তার কর্মরত হাত থামিয়ে ভাবলো সে তো শিক্ষককে কথা দিলো তবে মাটিতে শুষে যাওয়া পানি কীভাবে সে ট্যাঙ্কে ভরে রাখবে। সে সিদ্ধান্ত নিলো পানি শুষে ভিজে যাওয়া মাটি কিছুটা ট্যাঙ্কে ভরে দিলেই ঠিক হবে।

স্তূপটা পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গেলো আর টয়লেটের ট্যাঙ্কের পানি প্রায় শেষ হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত মানিব্যাগটি আর পাওয়া গেলো না। হয়তো সেটি ট্যাঙ্কের কিনারে বা তলায় আটকিয়ে গেছে, তবে না পাওয়া গেলেও তত্তচান সন্তুষ্ট ছিলো। কেননা সে নিজে বহু চেষ্টা করলো। আসলে তার সন্তুষ্টির কারণ ছিলো প্রধান শিক্ষক তার কাজে রাগ না করে তাকে বিশ্বাস করেছে আর তাকে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিশেবে গণ্য করেছে। তবে তখন এমন কঠিন কথা তত্তচান বুঝে নি।

তত্তচানের কাণ্ড দেখলে অধিকাংশ বয়স্ক লোক সাধারণত বলে, 'কী যে করেছো!' বা 'এটা বিপজ্জনক, এমন করো না।' আবার অন্য দিকে কিছু কিছু লোক ছিলো যারা বলতো, 'তোমাকে সাহায্য করবো?' কিন্তু প্রধান শিক্ষক শুধু এ-কথা বললো, 'শেষ হলে সব ট্যাঙ্কে ভরে রেখো।'

এ-কথা তত্তচানের কাছ থেকে শুনে তার মা ভাবলো, প্রধান শিক্ষক কী চমৎকার মানুষ!

এ-ঘটনার পর থেকে তত্তচান "টয়লেটের নিচের দিকে আর কখনো তাকাতো না"। তা ছাড়া তার মনে হলো প্রধান শিক্ষক এমন মানুষ

যাকে "অন্তর থেকে বিশ্বাস করা যায়" এবং" "প্রধান শিক্ষককে তার আগের থেকে অনেক বেশি ভাল লাগলো"।

প্রধান শিক্ষকের কথা মতো তত্তচান ময়লার পাহাড় ভেঙে সবটুক টয়লেটের পুকুরে ভরে রাখলো। যখন যে ময়লা তুলছিলো, তখন কাজটা ছিলো ভীষণ কঠিন, তবে ভরে দেয়ার সময় কাজ খুব দ্রুত হলো আর পানি শুষে ভিজে যাওয়া মাটিও হাতা দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে কিছুটা ট্যাঙ্কে ভরে দিলো। জায়গাটা সমতল করে কংক্রিটের ঢাকনা আগের মতো ঠিক মতো বসিয়ে হাতাও জিনিসপত্র রাখার ঘরে রেখে এলো।

সে-রাতে ঘুমোবার আগে তত্তচান অন্ধকারে পড়ে যাওয়া সুন্দর মানি-ব্যাগের রূপ মনে করে পুরোনো জিনিসের কথা ভাবতে ভাবতে দিনের বেলার কাজের ক্লান্তিতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লো।

তত্তচান দিনের বেলায় যেখানে ভীষণ খাটুনি খেটেছে সেখানকার মাটির আশপাশ তখনও ভিজে ছিলো আর চাঁদের আলোর নিচে তা সুন্দর জিনিসের মতো ঝিকমিক করছিলো।

আর মানিব্যাগটিও নিশ্চয় নীরবে কোথাও লুকিয়ে ছিলো।

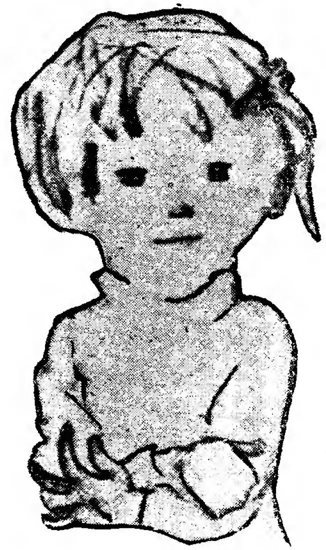

নামের কথা

তত্তচানের আসল নাম 'তেৎসুকো।' তার নাম কেন এমন হলো তা বলছি। তার জন্মের সময় আত্মীয়স্বজন ও মা-বাবার বন্ধুরা সবাই বললো, 'অবশ্যই ছেলে হবে।' তার মা-বাবার এই প্রথম সন্তান হচ্ছে, তারা এ-কথা বিশ্বাস করে 'তোওরু' নামে রাখার কথা ঠিক করলো। শেষমেষ জন্ম নিলো মেয়ে। তাই তারা একটু অসুবিধা বোধ করলো, তবে এ-অক্ষরটি 徹 দুজনেরই ভাল লাগতো। তাই হতাশ না হয়ে তারা এ-'তেৎসু' অক্ষরটির (তেৎসু চীনা উচ্চারণ থেকে উদ্ভূত উচচারণ) সাথে 'কো' অক্ষর যোগ করে 'তেৎসুকো' করলো।

অবস্থা যখন এই, তাই তার আশেপাশের লোকেরা ছেলেবেলা থেকে তাকে 'তেৎসুকো-চান', বলে ডাকে। তবে সে এমন না ভেবে যখনই কেউ জিজ্ঞেস করতো, 'তোমার নাম?'

তখন সে ভুল না করে উত্তর দিতো, 'তত্তচান'!

ছেলেবেলায় জিভের জড়তার জন্য ছেলেমেয়েরা যে সহজে কথা বলতে পারে না, শুধু তাই নয়, বরং তারা বহু শব্দ জানেও না। তাই তারা কোনো কোনো সময় অন্যের কথার ধ্বনি নিজেদের মতো করে শুনে থাকে। তত্তচানের সাথে ছোটবেলা থেকে পরিচিত একটি ছেলে 'সেক্কেন্ নো আবুকু (সাবানের বুদ্‌বুদ্)'কে 'ছেন্‌কেন্ নো আবুকে' উচচারণ করতো। আরেকটি মেয়ে কান্‌গোহু-সান (সেবিকা)'কে 'কান্‌গোকু-সান' বলতো। এ-ভাবে শুরু থেকে 'তেৎসুকো-চান', তেৎসুকো-চান' ডাককে তার মনে হলো, 'তত্তচান, তত্তচান'। তা ছাড়া 'চান' (শিশুদের নামের পর এ-উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়) পর্যন্ত নিজের নাম বলে মনে করতো। এর মাঝে বাবা তাকে ডাকতে শুরু করলো, 'তত্তসুকে' ('সুকে' হচ্ছে ছেলেদের নামের পর ব্যবহৃত উপসর্গ)। সে জানে না কেন বাবা শুধু এমন ডাকতো।

'তত্তসুকে! গোলাপ ফুলের পোকা বাছতে সাহায্য করবে?'—এমন ভাবে। অবশেষে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হলেও বাবা ও রকি ছাড়া অন্যরা তাকে 'তত্তচান' ডাকতো। তত্তচানও খাতায় 'তেৎসুকো' লিখলেও আসলে সে নিজের নাম 'তত্তচান' মনে করতো।

হাস্যকৌতুকের গল্প

গতকাল তত্তচান অত্যন্ত হতাশ হয়েছে। কারণ তার মা বললো, 'তুমি আর রেডিওতে হাস্যকৌতুকের গল্প শুনবে না'।

সেকালের রেডিও ছিলো বড় ও কাঠের তৈরি। তার আকৃতি ছিলো অত্যন্ত রুচিশীল, উঁচু আয়তক্ষেত্রাকার, গোলাকার চুঁড়োঅলা, পাটল রঙের রেশমী কাপড় জড়ানো স্পিকার বসানো থাকতো সামনে আর মাঝখানে খোদাই করা থাকতো আরবী ধরনের নকশা, মাত্র দুটি সুইচ লাগানো ছিলো। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই তত্তচান সেই পাটল রঙের অংশে তার কান লাগিয়ে হাস্যকৌতুকের গল্প শুনতে ভালবাসতো। হাস্যকৌতুকের গল্প শুনতে তার যে খুব মজা লাগতো। গতকাল পর্যন্ত তার মা-ও তত্তচানের হাস্যকৌতুকের গল্প শোনায় কোনো বাধা দেয় নি।

তবে গতকাল সন্ধ্যায় চার রকম বাদ্যযন্ত্র বাজানো অনুশীলন করার জন্য তার বাবার অর্কেস্ট্রার সহকর্মীরা তাদের বাসার বৈঠকখানায় একত্র হয়। তখন মা বললো, চেলো বাদক তাচিবানা ৎস্নুনেসাদা তত্তচানের জন্য কিছু কলা উপহার নিয়ে এসেছে। তখন কলাগুলো হাতে নিয়ে বিনম্রভাবে মাথা নত করে তাচিবানাকে অভিবাদন জানালো এবং আনন্দে ডগমগ হয়ে বলে ফেললো, 'মা গো, এগুলো যে খাসা জিনিস।'

এরপর থেকে মা-বাবা বাসায় না থাকলে সে গোপনে হাস্যকৌতুকের গল্প শুনতো। গল্পকার ভাল হলে তত্তচান উচচ হাসিতে ফেটে পড়ে। যদি কোনো বয়স্ক লোক তাকে এ অবস্থা দেখে, তখন হয়তো সে মনে করবে এতোটুকুন মেয়ে এমন কঠিন গল্পে মজা পায়।' তবে সত্য কথা বলতে কী খোকাখুকিরা বয়সে যতোই ছোট হোক না কেন সত্যিই মজার গল্প বুঝতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না।

ট্রেন আসবে

আজ দুপুরের বিরতির সময় মিইয়োচান বললো, 'আজ রাতে নতুন ট্রেন আসবে।' মিইয়োচান প্রধান শিক্ষকের তৃতীয় কন্যা, তত্তচানের সহপাঠিনী।

স্কুলের প্রাঙ্গণে সাজানো ছিলো ক্লাসঘর হিশেবে ব্যবহৃত ট্রেনের ছটি কামরা। সেখানে আরো একটি আসবে। মিইয়োচান বললো সেটা লাইব্রেরি হিশেবে ব্যবহারের জন্য। সবাই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তখন কিন্তু কেউ বললো, 'কোন পথ দিয়ে আসবে?'

এটা ছিলো একটা কঠিন প্রশ্ন।

একটু নীরবতার পর কোনো একজন বললো, 'ওইমাচিমেন্-লাইনের রেলপথ দিয়ে এসে সেখানের রেল-ক্রোসিং থেকে আলাদা হয়ে এখানে আসবে না?'

আর একজন বললো, 'তাহলে সেটা লাইন ছুট হওয়ার মতো অবস্থা হবে।'

আরেকজন বললো, 'তাহলে সেটা সাইকেল-রিক্সা করে নিয়ে আসা হবে না?'

তখনই কেউ বললো, 'অত বড় ট্রেন উঠতে পারে এমন সাইকেল-রিক্সা কি আছে?'

সবাই চিন্তিত হয়ে বললো, 'হুঁ...' এটা ঠিকই ওই ট্রেনের একটা কামরা উঠতে পারে এমন সাইকেল-রিক্সা ও ট্রাক ছিলো না।

তত্তচান অনেক চিন্তাভাবনা করে বললো, 'শোনো, স্কুলে হয়তো রেল লাইন বসানো হবে'।

কোনো একজন বললো, 'কোথা থেকে?'

'কোথা থেকে? এখন যেখানে ট্রেন আছে, সেখান থেকে......', এ-কথা বলতে বলতে তত্তচানের মনে হলো সে যা ভেবেছে তা তেমন উত্তম নয়। কারণ তার মনে হলো ট্রেন এখন কোথায় আছে তা সে জানে না আর ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে স্কুল পর্যন্ত সোজা রেল লাইন বসানোর কোনো সম্ভাবনা ছিলো না।

তার পর কিছুক্ষণ ধরে তারা এটা নয় সেটা নয় বলে কথা কাটাকাটি করে শেষে ঠিক করলো, 'আজ রাতে বাসায় না ফিরে ট্রেন আগমন দেখা যাক।'

সবাই রাত পর্যন্ত স্কুলে থাকতে পারে কি-না সকলের প্রতিনিধি হিশেবে মিইয়োচান তার বাবা, প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতে গেলো। ক্ষাণিক পর ফিরে এসে মিইয়োচান বললো, "ট্রেন আসবে অনেক রাতে। ট্রেন চলাচল শেষ হওয়ার পর। তবে যারা ট্রেন আসা দেখতে চাও, তারা বাড়ি

গিয়ে মা-বাবার অনুমতি পেলে রাতের খাওয়া সেরে নৈশ পোশাক ও কম্বল নিয়ে আসবে।'

'বা—হ্ !!'

সবাই আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

'কী বলে নৈশ পোশাক?'

'কী বলে কম্বল?', বলে সবাই কোলাহল করতে লাগলো।

সেদিন বিকেলে পড়াশোনার সময় সকলকে মনে হলো অস্থির। ক্লাসের পর ছেলেমেয়েরা সবাই বন্দুকের গুলীর মতো বাসায় ফিরে গেলো। তারা একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করতে করতে গেলো যাতে নৈশ পোশাক ও কম্বল নিয়ে তারা আবার একত্র হতে পারে······

বাসায় ফিরতে না ফিরতে তত্তচান তার মাকে বললো, 'ট্রেন আসবে, তবে জানি না কীভাবে আসবে। নৈশ পোশাক ও কম্বল চাই। শোনো, আমি কি যেতে পারি?'

মনে হয় এতোটুক কথায় কোনো মা বুঝে উঠবে না ব্যাপারটা কী? তত্তচানের মাও তার কথার অর্থ বুঝতে পারলো না। তবে তত্তচানের গম্ভীর মুখভঙ্গি থেকে অনুমান করলো অত্যন্ত অবাক কোনো কিছু ঘটবে।

মা তত্তচানকে নানা রকম প্রশ্ন করলো আর শেষে সে ভাল করে বুঝলো ব্যাপারটা কী, কী ঘটবে এখন। এখন কি মা'র মনে হলো এমন সুযোগ তত্তচান খুবই কম পাবে তাই তত্তচানের ট্রেন দেখতে পাওয়ার স্বর্ণ সুযোগ। তাছাড়া মায়েরও খুব ট্রেন দেখার ইচ্ছে হলো।

মা তত্তচানের নৈশ পোশাক ও কম্বল গোছগাছ করে দিলো এবং রাতের খাওয়ার পর তত্তচানকে স্কুলে নিয়ে গেলো।

স্কুলে যারা একত্র হলো তাদের মধ্যে ওপরের ক্লাসের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীও ছিলো, যারা ট্রেন আসার খবর শুনেছে। মোট দশজনের মতো হবে। তত্তচানের মা ছাড়াও আরো দু'তিনজন মা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছিলো। ট্রেন আসা দেখার বাসনা তাদেরও ছিলো, তবে তারা প্রধান শিক্ষকের ওপর ছেলেমেয়েদের ভার দিয়ে ফিরে গেলো।

প্রধান শিক্ষক বললো, 'ট্রেন এলে জাগাবো।' সবাই মিলনায়তনে কম্বল মুড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারা মনে করলো, ট্রেন কীভাবে বয়ে নিয়ে আসা হবে তা ভাবতে থাকলে ঘুম আসবে না, তবে দীর্ঘ সময় ধরে উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে 'জাগাতে ভুল করো না' বলতে বলতে ধীরে ধীরে সকলেই ঘুমিয়ে পড়লো।

'এসেছে! এসেছে!'

হৈচৈ শুনে তত্তচান লাফিয়ে উঠে স্কুলের মাঠ থেকে ফটকের বাইরে দৌড়ে গেলো। ঠিক সেই সময় ভোরের কুয়াশার মধ্যে ট্রেন তার বিরাট মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হলো। কেন যেন স্বপ্নের মতো মনে হলো। কারণ রেল লাইনহীন সাধারণ রাস্তা দিয়ে ট্রেন কোন আওয়াজ না করে চলে এসেছে।

তারা শুনলো এই ট্রেন ওইমাচি লাইনের বগি লাগানোর প্রাঙ্গণ থেকে ট্র্যাক্টর করে আনা হয়েছে। সাইকেল রিক্সার চেয়ে অনেক বড়, তাদের অচেনা ট্র্যাক্টর-নামের জিনিস আছে—এ-কথা জেনে তত্তচানরা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

এই বড় ট্র্যাক্টরের সাহায্যে জনমানবহীন ভোরের শহরের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে নিয়ে আসা হলো।

তার পর মহা হৈচৈ। সেকালে বিরাট আকারের ক্রেন ছিল না, তাই ট্র্যাক্টর থেকে ট্রেন নামিয়ে স্কুলের মাঠের কোণায় স্থাপন করা ছিলো অত্যন্ত কঠিন কাজ। ট্র্যাক্টরের লোকেরা নিয়ে এসেছে অনেকগুলো মোটা গোলাকার কাঠ। তারা সেগুলো ট্রেনের নিচে পেতে একটু একটু করে গড়িয়ে ট্র্যাক্টর থেকে ট্রেন স্কুলের মাঠে নামাতে লাগলো।

প্রধান শিক্ষক ছেলেমেয়েদের ব্যাখ্যা করলো, 'ভাল করে দেখো। একে বলা হয় গড়ানো। গড়ানোর গতি ব্যবহার করে তারা এতো বড় ট্রেন এগিয়ে নেয়।'

ছেলেমেয়েরা গম্ভীর মুখে দেখছিলো।

বাহকদের 'হেইয়া, হেইয়া' কলকণ্ঠের তালে তালে ভোরের সূর্য উঠতে লাগলো।

এই ট্রেন আগে বহু লোক বহন করে ব্যস্ততার সাথে কাজ করেছে, এখন এই স্কুলে আগে আসা অন্য ছয়খানা ট্রেনের মতো তার চাকা

সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন আর তার চলার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে সেটা শুধু ছেলেমেয়েদের হাসি আর হৈহল্লার শব্দ বহন করে আরামে থাকলেই যথেষ্ট।

ছেলেমেয়েরা ভোরের আলোতে নৈশ পোশাক পরিধান অবস্থায় ছিলো। তারা ঘটনাস্থলে আছে, এতে অন্তর থেকে তারা নিজেদের সুখী মনে করলো। তারা এতো খুশি হয়েছিলো যে একের পর এক প্রধান শিক্ষকের কাঁধ আঁকড়ে ধরলো আর বাহু থেকে ঝুলতে লাগলো।

প্রধান শিক্ষক টলতে টলতে খুশিতে হেসে উঠলো। তার হাসিমুখ দেখে ছেলেমেয়েরাও খুশিতে হেসে উঠলো, প্রত্যেকটি লোক হেসে উঠলো।

যে সময় তারা সবাই হেসে উঠেছিলো সে সময়ের এ-কথাটি তারা কেউ কখনো ভোলে নি।

সাঁতার-দিঘি

আজ ছিলো তত্তচানের জন্য একটা স্মরণীয় দিন। জন্মের পর এই প্রথম সে খালি গায়ে সাঁতার কাটলো সাঁতার-দিঘিতে।

আজ সকালের কথা। প্রধান শিক্ষক সবাইকে বললো, 'হঠাৎ বেশ গরম পড়েছে, তাই ভাবছি সাঁতার-দিঘিতে পানি ভরবো।'

'বা-হ্!' বলে সবাই লাফিয়ে উঠলো।

প্রথম শ্রেণীর তত্তচানরাও অবশ্যই 'বা-হ্!', বলে ওপরের শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে অনেক বেশি লাফিয়ে উঠলো। তোমোএ স্কুলে সাঁতার-দিঘি সাধারণ দিঘির মতো চার কোণা ছিলো না। (জমির জন্য বোধ হয় এমন হয়েছে) তার একটা প্রান্ত ছিলো সরু, তাই ওটা নৌকোর মতো দেখায়। তবে দিঘিটা ছিলো বড় এবং খুব চমৎকার। সেটা ছিলো ক্লাসঘর ও মিলনায়তনের মাঝখানে।

ক্লাসের সময়ও তত্তচানরা সাঁতারের কথা ভেবে ট্রেন কামরার ক্লাসঘর থেকে বার বার দিঘির দিকে তাকালো। দিঘিতে যখন পানি ছিলো না,

তখন মনে হতো ওটা যেন ঝরা পাতার খেলার মাঠ। তবে ঝাড়ু দিয়ে যখন সেটাতে পানি ভরা শুরু হয়, তখন স্পষ্ট বোঝা গেলো ওটা সাঁতার-দিঘি।

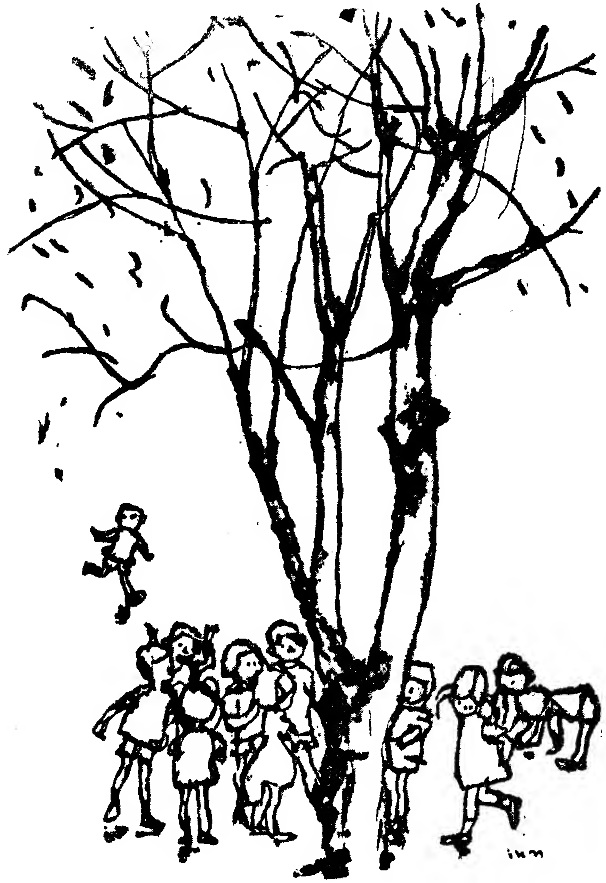

অবশেষে এলো দুপুরের বিরতি। সবাই জমায়েত হলো দিঘির ধারে। তখন প্রধান শিক্ষক বললো, 'আচ্ছা, ব্যায়াম করার পর সাঁতার কাটবো।'

তত্তচান ভাবলো (আমি ঠিক জানি না, তবে সাঁতারের পোশাক কি আবার প্রয়োজন নেই? যখন আমি মা-বাবার সাথে কামাকুরা-এ গিয়েছিলাম,

তখন আমি সাঁতারের পোশাক, রবারের চাকা ও নানা রকমের জিনিস নিয়ে গিয়েছিলাম, তবে কি শিক্ষক আজকের জন্য এগুলো নিয়ে আসতে বললো ?......)

মনে হলো প্রধান শিক্ষক যেন তত্তচানের ভাবনা বুঝে ফেললো আর বললো, 'পোশাকের জন্য চিন্তা করো না, মিলনায়তনে গিয়ে দেখো।'

তত্তচান ও প্রথম শ্রেণীর অন্য ছাত্রছাত্রীরা দৌড়ে গিয়ে মিলনায়তনে দেখলো ওপরের শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করতে করতে তাদের কাপড় খুলছে। আর খোলার পর গোসল করার মতো উলঙ্গ হয়ে স্কুলের মাঠে একের পর এক ছুটছে। তত্তচানরাও তাড়াহুড়ো করে কাপড় খুললো। গরম হাওয়া বইছিলো, তাই উলঙ্গ হওয়ার পর তাদের খুব আরাম লাগলো। মিলনায়তন থেকে বের হয়ে সিঁড়ির ওপর দাঁড়ালো। দেখলো স্কুলের মাঠে চলছে প্রস্তুতি-ব্যায়াম। তত্তচানরা খালি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে দৌড়ে নেমে এলো।

সাঁতারের শিক্ষক ছিলো মিইয়োচানের বড় ভাই,—প্রধান শিক্ষকের ছেলে। সে ছিলো ব্যায়ামবিদ। তবে তোমোএ স্কুলের শিক্ষক ছিলো না, সে ছিলো কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতারু ছাত্রদের একজন সদস্য। স্কুলের নামের মতো তার নামও ছিলো তোমোএ। তোমোএসান্ সাঁতার-পোশাক পরিধান করেছিলো।

ব্যায়ামের পর কোনো একজন তাদের শরীরে পানি ছিঁটিয়ে দিলো আর তারা 'কী—!' হিয়া—!' ও 'ওয়া হাহাহা' নানা রকম শব্দ করতে করতে দিঘিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তত্তচানও একটু দাঁড়িয়ে সবাইকে দিঘিতে নামতে দেখলো। সে বুঝলো পুকুরে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। তখন সে দিঘিতে নামলো। স্নানাগারের পানি গরম, তবে দিঘির পানি ঠাণ্ডা। দিঘিটা ছিলো বড়, যত দূরেই হাত বাড়াও তত দূরেই পানি।

হ্যাংলা শিশু, মোটা শিশু, ছেলে ও মেয়ে সবাই জন্মের সময়ের বেশে হাসলো, চিৎকার করলো ও পানির মধ্যে ডুব দিলো।

তত্তচানের কাছে দিঘিটাকে খুব মজার ও সুখকর মনে হলো। আর সে একটু দুঃখ পেলো এ-কথা ভেবে যে কুকুর রকি তার সাথে স্কুলে আসতে পারে না। সাঁতার-পোশাক পরার দরকার নেই এ-কথা যদি তত্তচান আগে জানতো তাহলে রকিও অবশ্য দিঘিতে নেমে সাঁতার কাটতে পারতো।

প্রধান শিক্ষক সাঁতার-পোশাক না পরে সাঁতার কাটতে বললেও এটা বাধ্যতামূলক নিয়ম ছিলো না। তাই যারা সাঁতারের পোশাক নিয়ে আসতো, তারা পরতে পারতো। আর আজকের মতো হঠাৎ সাঁতার কাটার দিনে পোশাক নিয়ে আসে নি বলে কোনো অসুবিধা ছিলো না। উলঙ্গ দেহে সাঁতার কাটতে পারতো। সে যে ছাত্রছাত্রীদের উলঙ্গ সাঁতার কাটতে বললো, তার কারণ হচ্ছে শিক্ষক ভাবলো ছেলে ও মেয়েদের পরস্পরের দেহের ব্যবধানের প্রতি অদ্ভুত কৌতূহলী হওয়া ভাল কথা নয় আর নিজের দেহ জোর করে অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা স্বাভাবিক নয়। প্রধান শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে চেয়েছিলো সব দেহই সুন্দর। তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্য ইয়াসুআকিচানের মতো পলিও গ্রস্ত ও খুব বেটে ধরনের প্রতিবন্ধী কয়েজন ছেলেমেয়ে ছিলো, তাই প্রধান শিক্ষক এমন কথাও ভেবেছিলো যদি উলঙ্গ হয়ে সবাই এক সঙ্গে খেলা করে, তবে অমন প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের লজ্জা কেটে যাবে, এবং তার সাথে সাথে কেটে যাবে হীনতাবোধ। বোধ করছিলো ফলে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ে যারা প্রথম লজ্জা পেয়ে অস্বস্তিতে, তারাও এর মাঝে নিশ্চিন্তে আনন্দ উপভোগ করতে শুরু করলো এবং তাদের লজ্জা অজান্তে মিলিয়ে গেলো।

তবে কোনো কোনো ছেলেমেয়ের পরিবারের লোকেরা এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলো। তারা ছেলেমেয়েদের 'অবশ্যই পোশাক পরো!', বলে স্কুলে সাঁতারের পোশাক নিয়ে যেতে বলতো। তবে তত্তচান এবং আর কয়েকজনের প্রথম থেকেই ভাল লাগলো উলঙ্গ সাঁতার কাটতে। তারা এরপর 'পোশাক আনতে ভুলে গেছে' বলে উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটছে এমন ছেলেমেয়েদের সাথে উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কেটে বাসায় ফিরে যাওয়ার সময় হৈচৈ করে সাঁতারের পোশাক পানিতে ভিজিয়ে নিতো। এর জন্য তোমোএ স্কুলের ছেলেমেয়েদের গায়ের সমস্ত চামড়া কালচে হয়ে গেলো। তাদের গায়ে পোশাকের শাদা দাগ প্রায় আর রইলো না।

তত্তচান যখন স্কুল-ব্যাগের 'কাতা কাতা' শব্দ করে এ-দিক ও-দিকে না তাকিয়ে স্টেশন থেকে বাড়ির দিকে ছুটছে তখন কেউ দেখলে মনে করবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। স্কুলের গেট থেকে বেরুনোর পর সারাক্ষণ তত্তচানের আচরণ ছিলো এমনটি।

বাসায় পৌঁছে সামনের দরোজা খুলে আর 'আমি এসেছি' বলে রকির খোঁজ করতো। রকি বারন্দার মেঝেয় পেট নামিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলো। তত্তান চুপ করে রকির মুখের সামনে বসলো এবং পিঠ থেকে স্কুল ব্যাগ নামিয়ে ভেতর থেকে রিপোর্ট কার্ড বের করলো। এই প্রথম সে রিপোর্ট কার্ড পেয়েছে। রকি যাতে ভাল করে দেখতে পায়, তাই তত্তচান তার চোখের সামনে নম্বরের পৃষ্ঠাগুলো মেলে ধরলো এবং একটু গর্বের সঙ্গে বললো, 'দেখো' সেখানে ক, খ ও নানা অক্ষর লেখা ছিলো। সে তখনও জানতো না ক খ-র চেয়ে ভালো না খ ক-র চেয়ে ভালো। তাই ওটা ছিলো রকির জন্য আরো কঠিন জিনিস। তবে তত্তচান ভেবেছিলো, এই প্রথম রিপোর্ট কার্ড অন্য কারো আগে সে রকিকে দেখাবে, তাতে রকিও অবশ্যই পুলকিত হবে।

রকি চোখের সামনে কাগজ দেখে শুঁকলো এবং তত্তচানের মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো।

তত্তচান বললো, 'তুমি মুগ্ধ হয়েছো, অনেক চীনা অক্ষর আছে তাই মনে হয় কোনো কোনো জায়গা তোমার জন্য কঠিন হয়েছে।'

রকি আরেক বার কাগজের দিকে ভালো করে তাকানোর মতো ভঙ্গি করে মাথা দুলিয়ে তত্তচানের হাত চাটতে লাগলো।

তত্তচান দাঁড়াতে দাঁড়াতে খুশি হয়ে বললো, 'বেশ, এখন মাকে দেখাতে যাবো।'

তত্তচান চলে যাওয়ার পর রকি আরো একটু ঠাণ্ডা জায়গা খোঁজার জন্য উঠে দাঁড়ালো এবং আবার আস্তে বসে চোখ বুজলো। রকি এমন-ভাবে চোখ বুজলো যে শুধু তত্তচান নয় অন্য লোকেরা দেখলেও মনে করতো যে সে রিপোর্ট কার্ড সম্পর্কে ভাবছে।

'আগামীকাল আমরা তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্পিং করবো। কম্বল ও নৈশ পোশাকসহ সন্ধ্যায় স্কুলে পাঠাবেন।'

স্কুল থেকে প্রধান শিক্ষকের এমন চিঠি নিয়ে তত্তচান তার মাকে দেখালো। তার পরের দিন থেকে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হওয়ার কথা ছিলো।

তত্তচান মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যাম্পিং মানে কী?'

মাও তখন ভাবছিলো, তবে সে উত্তর দিলো, 'এটা কি বাইরে কোথাও তাঁবু খাটিয়ে ঘুমানোর কথা নয়? তাঁবুতে রাত কাটালে শুয়ে শুয়ে চাঁদ ও তারা দেখা যায়। তবে কোথায় তাঁবু খাটাবে? যাতায়াতের খরচের কথা লেখে নি, তাই মনে হয় অবশ্যই স্কুলের কাছাকাছি হবে।'

সে রাতে ঘুমুতে যাওয়ার পরেও বাইরে রাত কাটানোর কথা ভেবে তত্তচানের একটু ভয় লাগলো যেন এটা একটা ভীষণ অভিযানের মতো। তার বুক ধুক ধুক করছিলো, তাই অনেকক্ষণ সে ঘুমোতে পারলো না।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, তত্তচান তখনই জিনিস-পত্র গোছাতে শুরু করলো। আর নৈশ পোশাক রুকস্যাকের ভেতরে রেখে তার ওপর কম্বল রাখলো। সন্ধ্যায় রুকস্যাকের ভারে অনেকটা চ্যাপ্টা হয়ে ভেঙে পড়া অবস্থায় সে মা-বাবাকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলো।

সবাই স্কুলে জড়ো হলো, তখন প্রধান শিক্ষক বললো, 'সবাই মিল-নায়তনে এসো।'

সবাই মিলনায়তনে জড়ো হলো, তখন সে ছোট মঞ্চের ওপর একটা মোটা ধরনের কাপড় নিয়ে উঠলো। সেটা ছিলো সবুজ রঙের তাঁবু। শিক্ষক সেটাকে ছড়িয়ে বললো, 'এখন তাঁবু খাটানোর কৌশল শেখাবো। ভাল করে দেখতে থাকো।'

আর শিক্ষক একা "হুঁ হুঁ", বলতে বলতে ওইটার একদিকে একটা রশি টেনে অন্য দিকে একটা খুঁটি দাঁড় করিয়ে চোখের পলকে তিন কোণা একটা খুব চমৎকার তাঁবু খাটিয়ে ফেললো এবং বললো, 'ঠিক আছে। এখন তোমরা সবাই মিলনায়তনে তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্পিং শুরু করো!'

অধিকাংশ লোকের মতো মা ভেবেছিলো বাইরে তাঁবু খাটানো হবে, তবে প্রধান শিক্ষক ভেবেছিলো অন্য রকম—"মিলনায়তনে ক্যাম্পিং করলে বৃষ্টি হলেও আর মাঝ রাতে কিছুটা শীত পড়লেও চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না।"

ছেলেমেয়েরা এক সাথে 'ক্যাম্পিং! ক্যাম্পিং!' চিৎকার করতে করতে দলে দলে ভাগ হয়ে শিক্ষকদের সাহায্যে মিলনায়তনের মেঝের ওপর তাঁবু খাটিয়ে ফেললো। এক একটা তাঁবুতে তিনজন করে শুতে পারে। তত্তচান তাড়াতাড়ি নৈশ পোশাক পরিধান করে এই তাঁবু ও সেই তাঁবুতে ঢোকার পথ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে আর বের হতে থাকলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার তৃপ্তি মিটলো, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এমন করলো। সকলে এ রকমভাবে অন্যদের তাঁবু দেখলো।

সবাই রাতের পোশাক পরার পর যাতে সবাই তাকে দেখতে পায় মাঝখানে এমন একটি জায়গায় প্রধান শিক্ষক বসে তার বিদেশ ভ্রমণের গল্প বললো।

কোনো কোনো ছেলেমেয়ে শুয়ে শুয়ে তাঁবু থেকে আধা মুখ বের করে, কেউ কেউ যথারীতি বসে, কেউ কেউ ওপরের শ্রেণীর কারো কোলে মাথা হেলান দিয়ে বিদেশের গল্প শুনলো, যেখানে তারা কখনো যায় নি, যার গল্প তারা কখনো শোন নি। শিক্ষক যে গল্প বললো, তেমন গল্প তারা আগে শুনে নি আর কোনো কোনো সময় এমন মনে হলো যেন সমুদ্রের ও-পারের ছেলেমেয়েরা তাদের বন্ধুবান্ধব।

শুধু এইটুকু কাজ, মিলনায়তনে তাঁবু খাটিয়ে ঘুমোনো, ছেলেমেয়েদের কাছে সারা জীবন মনে রাখার মতো আনন্দদায়ক, মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়ে থাকলো। প্রধান শিক্ষক নিশ্চিত জানতো যে ছেলেমেয়েরা এতে আনন্দ পাবে।

শিক্ষকের গল্প শেষ হলো। মিলনায়তনের আলো নিভে গেলো, তখন সবাই হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

এদিকের তাঁবুতে হাসাহাসি···ওদিকের তাঁবুতে ফিসফিসানি, সেখানকার তাঁবুতে হাতাহাতি লড়াই......।—তাও ধীরে ধীরে নীরব হয়ে গেলো।

যদিও এ-ক্যাম্পিং ছিলো তারকাবিহীন চন্দ্রবিহীন রাতে, তবুও ছেলেমেয়েরা এ-ক্যাম্পিং-এ অপার আনন্দ পেয়েছিলো। ছোট্ট মিলনায়তনের

সেই ক্যামপিং। তাদের কাছে আসল ক্যামপিং-মাঠ বলে মনে হলো এবং তাদের স্মৃতির মণিকোঠায় ওই রাতের অজস্র তারা ও চাঁদের আলোর ঝিকমিক চিরঞ্জীব হয়ে রইলো।

দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা

মিলনায়তনে ক্যাম্পিঙের পরের দিনের পরের দিন এলো তত্তচানের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার দিন। ইয়াসুআকিচানকে সে একটি কথা দিয়েছিলো। সে কথা সে নিজের মা-বাবা ও ইয়াসুআকিচানের পরিবারের লোকদের কাছেও গোপন করে রাখলো। তা কী ছিলো বলছি, সেটা ছিলো 'তত্তচানের গাছে ইয়াসুআকিচানকে নিমন্ত্রণ'। তত্তচানের ছিলো তোমোএ স্কুলের মাঠের একটা গাছ। তোমোএ স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুলের মাঠে এখানে সেখানে যে গাছগুলো ছিলো সেগুলোকে এক একজন নিজে চড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলো। তত্তচানের গাছটি স্কুলের মাঠের এক ধারে কুহোম্বুৎসু যাওয়ার সরু রাস্তার সামনের বেড়ার পাশে ছিলো। সেটা ছিলো মোটাসোটা ও তেলতেলে। ঝানু চড়ুয়ার মতো উপরে উঠলে পাওয়া যেতো দুই মিটারের মতো ওপরে দু'দিকে প্রসারিত হয়ে যাওয়া ডালপালা। সে জায়গাটি ছিলো হ্যামকের মতো আরামদায়ক। স্কুলের বিরতির সময় ও ক্লাসের পর তত্তচান প্রায়ই সেখানে বসে দূরের দৃশ্য দেখতো, আকাশ দেখতো এবং পথচারীদের দেখতো।

ছেলেমেয়েরা 'তাদের' সংরক্ষিত গাছগুলোকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করতো। তাই অন্য কেউ তাদের সংরক্ষিত গাছে উঠতে চাইলে বিনম্রভাবে 'ওপরে কেউ আছো? একটু বিরক্তি করছি। দয়া করে তোমার গাছে আমাকে একটু চড়তে দেবে', বলে অনুমতি প্রার্থনা করতে হতো।

ইয়াসুআকিচান ছিলো পোলিও রোগগ্রস্ত, তাই সে কখনো গাছে উঠে নি আর নিজের জন্য গাছও কব্জা করে নি। তাই তত্তচান ঠিক করলো আজ তার নিজের গাছে ইয়াসুআকিচানকে নিমন্ত্রণ করবে এবং সে জন্য

ইয়াসুআকিচানকে নিমন্ত্রণ করলো। তত্তচান সকলের কাছ থেকে তা গোপন করেছিলো নিশ্চয় সবাই তার বিপক্ষে যাবে এ-কথা ভেবেই।

তত্তচান বাসা থেকে বের সময় মাকে 'দেন্ এন্‌চোহুর ইয়াসুআকিচানের বাসায় যাচ্ছি।' বলে আসলো।

সে মিথ্যে কথা বললো, তাই সে মায়ের মুখের দিকে যতটা সম্ভব কম তাকিয়ে জুতোর ফিতের দিকে তাকালো, তবে স্টেশন পর্যন্ত তার পথ-সঙ্গী রকিকে বিদায়ের সময় সত্যি কথা বললো, 'আমি ইয়াসুআকিচানকে আমার গাছে ওঠাবো।'

গলায় ফিতা দিয়ে ঝোলানো ট্রেনপাস পত্ পত্ করে উড়িয়ে যখন তত্তচান স্কুলে পৌঁছলো, তখন গ্রীষ্মের ছুটিতে নির্জন স্কুলের মাঠে ফুল বাগানের ধারে ইয়াসুআকিচান দাঁড়িয়ে ছিলো। বয়সে ইয়াসুআকিচান তত্তচানের চেয়ে মাত্র এক বছর বড় হলেও সে সব সময় বয়সে অনেক বড় ছেলেদের মতো কথা বলতো।

যখন ইয়াসুআকিচান তত্তচানকে দেখলো, তখন সে তার পা টেনেটেনে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে তত্তচানের দিকে ছুটে এলো। তত্তচানের যখন মনে হলো যে সে সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে একটা দুঃসাহসিক কাজ করলো, তখন সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ইয়াসুআকিচানের মুখ দেখে 'হিহিহিহিহি' করে হেসে উঠলো। ইয়াসুআকিচানও হাসলো। তত্তচান নিজের গাছের কাছে ইয়াসুআকিচানকে নিয়ে গেলো আর গত রাত থেকে সে যেমন ভেবে ঠিক করেছিলো, ঠিক তেমন স্কুলের কাজের লোকটির জিনিসপত্র রাখার ঘরে ছুটে গিয়ে একটা মই টেনে টেনে নিয়ে এলো। মইটাকে গাছের যেখানে ডালপালা ভাগ হয়েছে সেখানে হেলান দিয়ে তাড়াতাড়ি গাছে উঠলো আর সেটাকে চেপে ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলো, 'ঠিক আছে, ওঠার চেষ্টা করো।'

ইয়াসুআকিচানের হাত-পা তো শক্তি ছিলো না, তাই তার মনে হলো সে একা এক ধাপও উঠতে পারবে না। তাই তত্তচান দ্রুত বেগে মই বেয়ে নেমে গেলো আর ইয়াসুআকিচানের নিতম্ব ধরে ঠেলে ঠেলে ওপরে ওঠানোর চেষ্টা করলো। তত্তচান ছোট ও রোগা, হালকা-পাতলা গড়নের মেয়ে, তাই ইয়াসুআকিচানের নিতম্ব ঠেলে ধরে রাখার মতো শক্তি

তার ছিলো না। নড়াচড়া করা মই চেপে ধরে রাখার শক্তিও তার একে-বারেই ছিলো না। ইয়াসুআকিচান মইয়ের ওপর রাখা তার পাখানি নামিয়ে চুপ করে নিচের দিকে তাকিয়ে মইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। তত্তচান প্রথম বার বুঝলো সে যা ভেবেছিলো এটা তার চেয়ে কঠিন কাজ।

(কী করবো ...... ?)

তবে যে-কোনো উপায়ে তত্তচান ইয়াসুআকিচানকে নিজের গাছে চড়াতে চেয়েছিলো আর ইয়াসুআকিচানও গাছে ওঠার বাসনা ছিলো। তত্তচান ইয়াসুআকিচানের বিষণ্ন-বিমর্ষ মুখের দিকে ঘুরে নিজের গাল ফুলিয়ে কৌতুককর মুখ-ভঙ্গি করে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, 'দাঁড়াও, মাথায় ভাল একটা বুদ্ধি এসেছে!!'

তার পর আবার জিনিসপত্র রাখার ঘরে ছুটে গেলো এবং কাজে লাগার মতো কোনো জিনিস পাওয়া যাবে কিনা সে জন্য নানা জিনিস একটার পর একটা টেনে বের করে দেখতে থাকলো। অবশেষে সে খুঁজে পেলো একটি ঘড়াঞ্চি।

(এটা কাঁপে না, নড়াচড়া করে না, তাই চেপে ধরে রাখার দরকার নেই।—)

আর তত্তচান সে ঘড়াঞ্চি টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেলো। তখন পর্যন্ত সে জানতো না যে তার গায়ে এতো প্রচণ্ড শক্তি আছে। ঘড়াঞ্চি খাড়া করে দেখলো। সেটা গাছের প্রায় শাখা-প্রশাখা ভাগাভাগি হওয়া জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তারপর তত্তচান ইয়াসুআকিচানের বড় বোনের মতো স্বর করে বললো, 'ঠিক আছে? ভয় পেয়ো না। এখন নড়বে চড়বে না।'

ইয়াসুআকিচন অত্যন্ত ভীরুভীরু চোখে ঘড়াঞ্চির দিকে তাকালো। তারপর ঘামে জবজব তত্তচানের দিকে তাকালো। ইয়াসুআকিচানও তখন ঘামে জবজব। এবার ইয়াসুআকিচান ওপরে গাছের দিকে তাকালো এবং যেন সে মন স্থির করেছে এমনভাবে প্রথম ধাপে পা ফেললো।

তারপর ইয়াসুআকিচান ঘড়াঞ্চির সব চেয়ে ওপরে উঠতে কতো ঘণ্টা সময় লাগলো তা তারা দুজনই বুঝলো না। গ্রীষ্মের খাঁ খাঁ রোদে তারা দুজন আর কিছু ভাবলো না। যেভাবেই হোক ইয়াসুআকিচান যদি

ঘড়াঞ্চির ওপর পর্যন্ত উঠতে পারে তাহলেই ঢের। তত্তচান ইয়াসুআকি-চানের দু'পায়ের নিচে মাথা ঢুকিয়ে তার পা ওপরে উঠিয়ে মাথা দিয়ে ইয়াসুআকিচানের নিতম্বের ভর বহন করলো। ইয়াসুআকিচানও তার যতটা শক্তি আছে ততটা ভর দিয়ে অবশেষে ঘড়াঞ্চির চূড়া অবধি বেয়ে উঠলো।

'হা!'

তারপর তারা হতাশ হলো। গাছের যেখানে ডালপালা ভাগ হয়েছে তত্তচান সেখানে লাফিয়ে উঠলো আর অনেক টানাটানি করেও ঘড়াঞ্চি থেকে ইয়াসুআকিচান গাছে আসতে পারলো না। ঘড়াঞ্চিটা হাতে ধরে ইয়াসুআকি-চান তত্তচানের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলো। তত্তচানের হঠাৎ কান্না পেলো।

এমন হওয়ার কথা নয়। আমার গাছে ইয়াসুআকিচানকে নিমন্ত্রণ করে নানা জিনিস দেখাতে চেয়েছিলাম......

তত্তচান তবে কাঁদলো না। কারণ তার মনে হলো যদি সে কাঁদে, তাহলে ইয়াসুআকিচানও নিশ্চয় কেঁদে ফেলবে।

পোলিও-র ফলে ইয়াসুআকিচানের সবগুলো আঙুল এক সাথে লেগে থাকা হাত ধরলো তত্তচান। ইয়াসুআকিচানের আঙুল ও হাত ছিলো তত্তচানের হাতের চেয়ে বড়। তত্তচান সে-হাত কিছুক্ষণ ধরে রেখে বললো, 'একটু শোয়ার মতো ভঙ্গি করো। আমি টেনে দেখি।'

তত্তচান দু'দিকে ডালপালা ভাগ হওয়া জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘড়াঞ্চির ওপর পেট চ্যাপ্টা করে শুয়ে থাকা ইয়াসুআকিচানকে টানতে শুরু করলো। এ-দৃশ্য যদি কোনো বয়স্ক লোকের নজরে পড়তো তাহলে সে অবশ্যই চিৎকার করে উঠতো। দু'জনের অবস্থা এমনই পড়োপড়ো ছিলো।

ইয়াসুআকিচান তখন তত্তচানকে বিশ্বাস করছিলো। আর নিজেকে বিপন্ন করে তুলেছিলো তত্তচান তখন। তাই খাটো হাতে ইয়াসু-আকিচানের হাত শক্তভাবে ধরে যতটা সম্ভব শক্তি দিয়ে ইয়াসুআকিচানকে টানলো সে।

পুঞ্জপুঞ্জ মেঘের আড়ালে মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ছিলো প্রখর রৌদ্র।

অবশেষে তারা দু'জন গাছের ওপর মুখোমুখি বসতে পারলো। তত্তচান জবজবে ঘামে ভিজে যাওয়া চুলের এক দিকে হাত বুলোতে বুলোতে মাথা নত করে বললো, 'স্বাগতম!'

ইয়াসুআকিচান গাছে হেলান দিয়ে একটু লাজুক লাজুক হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, 'বিরক্ত করতে এলাম।'

এমন দৃশ্য ইয়াসুআকিচান এই প্রথম দেখলো।

সে তৃপ্তির সাথে বললো, 'এখন বুঝলাম গাছে ওঠার কী সুখ!'

তারপর দুজন অনেকক্ষণ ধরে গাছে বসে নানা রকম গল্প করলো। ইয়াসুআকিচান আগ্রহের সাথে বললো, 'আমার বড় বোন আমেরিকায় থাকে। তার কাছে শুনেছি আমেরিকায় টেলিভিশন তৈরি করা হয়েছে। তা জাপানে এলে জাতীয় স্টেডিয়ামের সুমো-কুস্তি বাড়িতে বসে দেখা যাবে। শুনেছি সেটা দেখতে বাক্সের মতো।'

ইয়াসুআকিচানের জন্য দূরে যাওয়া অসুবিধাজনক, তাই তার কাছে বাসায় বসে নানা জিনিস দেখতে পাওয়া কতটা সুখকর, তত্তচান তা তখন বুঝলো না। তাই ভাবলো—বাক্স থেকে সুমো-কুস্তিগীর বের হবে, এর মানে কী? সুমো-কুস্তিগীর তো বড়, তাহলে কীভাবে বাসা পর্যন্ত এসে বাক্সের মধ্যে ঢুকবে?

এটা তার কাছে অত্যন্ত অবাক লাগা কাহিনী বলে মনে হলো। তখন টেলিভিশনের কথা কেউ জানতো না। তত্তচানকে এই প্রথম টেলিভিশনের কথা শোনালো ইয়াসুআকিচান।

এখানে সেখানে চার দিকে ডাকছিলো ঘুর্ঘুরে পোকা।

তারা দুজনেই খুব তৃপ্তি পেয়েছিলো।

আর ইয়াসুআকিচানের জন্য এটাই ছিলো প্রথম ও শেষ বৃক্ষারোহণ।

সাহস পরীক্ষা

'কোন জিনিস ভীতিকর, দুর্গন্ধ ও সুস্বাদু?' এই ধাঁধাটা বার বার শুনতেও মজা। তাই তত্তচানরা এর উত্তর জানলেও 'শোনো, "কোন জিনিস ভীতিকর" ওই ধাঁধাটা জিজ্ঞেস করো।' বলে পরস্পরকে ধাঁধাটা জিজ্ঞেস করে আনন্দ পেতো।

এর উত্তর হচ্ছে 'টয়লেটে ওমান্‌জু-মিষ্টি খাচ্ছে দৈত্য'।

আজ রাতে তোমোএ স্কুলে "সাহস পরীক্ষা" শেষ হয়েছে এমন এক ধাঁধার মধ্য দিয়ে। 'ভৌতিকর, চুলকানো ও হাস্যকর জিনিস কী?' এমন ধাঁধা দিয়ে।

মিলনায়তনে তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্‌পিং-এর রাতে প্রধান শিক্ষক বললো, 'রাতে কুহোন্‌বুৎসু মন্দিরে "সাহস পরীক্ষা" করবো, যারা ভূত হতে চাও, তারা হাত তোলো দেখি!'

তখন স্থির হলো যে জন সাতেক ছেলে ভূত হবে। আজ সন্ধ্যায় যখন সবাই স্কুলে একত্র হলো, তখন যে ছেলেরা ভূত হবে ঠিক করা হয়েছিলো তারা যেমন খুশি তেমন ভূতের পোশাক তৈরি করে নিয়ে এলো।

'দারুণ ভয় দেখাবো!!' বলে ছেলেরা কুহোন্‌বুৎসু মন্দিরের কোথাও লুকিয়ে থাকতে গেলো। বাকি ত্রিশজনের মতো ছেলেমেয়েকে পাঁচ জনের মতো এক একটি দলে ভাগ হয়ে ক' মিনিট পর পর স্কুল থেকে রওনা হয়ে কুহোন্‌বুৎসু-মন্দির ও সমাধি ঘুরে স্কুলে ফিরে আসতে হবে।

অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক বললো, 'কতটা ভয় সহ্য করতে পারো এটা তার পরীক্ষা। তবে যদি কেউ ভয় পাও, তাহলে সে ফিরে আসতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই।'

তত্তচান মায়ের কাছ থেকে টর্চ ধার করে নিয়ে এসেছিলো। মা বললো, 'হারিয়ে ফেলো না যেন।'

কোনো কোনো ছেলে 'ভূত ধরবো' বলে প্রজাপতি ধরার জাল ও 'ভূতকে দড়ি দিয়ে বাঁধবো', বলে খড়ের দড়িও নিয়ে এসেছে।

প্রধান শিক্ষক ব্যাখ্যা করতে করতে ও 'কাগজ-কাঁচ-পাথর'—খেলার সাহায্যে দল ঠিক করতে করতে ঘন অন্ধকার নেমে এলো।

'এখন প্রথম দল রওনা হতে পারো।'—প্রধান শিক্ষক বললো।

সবাই উত্তেজনায় হৈচৈ করতে করতে স্কুলের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলো। এক সময় তত্তচানের দলের পালা এলো।

(শিক্ষক বললো—কুহোন্‌বুৎসু-মন্দিরে পৌঁছানোর আগে ভূত বের হবে না। তবে সত্যিই কি পথের মধ্যে বের হবে না?...) এমনভাবে ভয়ে ভয়ে অবশেষে তারা মন্দিরের প্রবেশ পথে যেখানে দেবরাজের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে পৌঁছলো। চাঁদ উঠেছে, কিন্তু রাতে মন্দিরের চারদিকে

অন্ধকার। মন্দিরের প্রাঙ্গণ দিনের বেলা বিশাল ও মনোরম হলেও এখন কোন দিক থেকে ভূত আসবে—এ-কথা ভেবে ভেবে তত্তচানরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। তাই যখন সামান্য বাতাসে গাছ দুলে ওঠে, তারা চিৎকার করলো, 'কিয়া—ৎ!!' যখন কোনো নরম থলথলে জিনিসের ওপর পা পড়ে, তখন তারা বলে উঠলো, 'ভূত বেরিয়েছে।' অবশেষে তারা এতোটা ভয় পেলো যে এমন কি তাদের সন্দেহ হতে লাগলো তারা যাদের হাত ধরে আছে তারাও ভূত কি না!? তত্তচান তখন স্থির করলো যে সে সমাধি পর্যন্ত যাবে না। কারণ ভূতেরা নিশ্চয় সমাধিক্ষেত্রে অপেক্ষা করছে আর তারা ভালভাবে জেনে গেছে "সাহস পরীক্ষা" কাকে বলে। তাই তাদের মনে হলো ফিরে যাওয়াই উত্তম। তার দলের সবারই ওই একই মত ছিলো। তাই তত্তচান মনে করলো 'ভালোই হলো আমি একা নই।' ফেরার সময় সবাই ছুটতে লাগলো উর্ধ্ব-শ্বাসে। যখন তারা স্কুলে ফিরলো, দেখলো তাদের আগের দলও ফিরে এসেছে। জানা গেলো তারাও ভয় পেয়ে সমাধি পর্যন্ত যায় নি।

এমন সময় একজন শিক্ষকের সাথে শাদা কাপড়ে মাথা ঢাকা একটি ছেলে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে গেট দিয়ে প্রবেশ করলো। ছেলেটি ভূত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে সমাধিক্ষেত্রে উবু হয়ে বসে সবাইর আসার অপেক্ষায় ছিলো, কিন্তু কেউ আসে নি। আর সে একটু একটু করে ভয় পেয়ে শেষে সমাধিক্ষেত্র থেকে বাইরে রাস্তায় গিয়ে কাঁদছিলো। তখন যে শিক্ষক পাহারা দিচ্ছিলো সে তাকে দেখে স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সবাই তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো, তখন কাঁদতে কাঁদতে আরেকটি ভূত ও একটি ছেলে ফিরে এলো। যখন একটি ছেলে সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন ভূত হওয়া একটি ছেলে 'আমি ভূত!', বলে সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ে। তখন দৌড়ে আসা ছেলের সঙ্গে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তারা দুজনেই বিস্মিত হয়ে ব্যথা পেয়ে করুণভাবে কাঁদতে কাঁদতে এক সঙ্গে ফিরে এলো। ভয় কেটে যাওয়ার পর এ মজার ঘটনায় সবাই প্রাণ খুলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। ভূতেরাও কাঁদতে কাঁদতে হাসলো। তখন পত্রিকার কাগজে তৈরি ভূতের মুখোশ পরে 'এটা অন্যায়, এটা অন্যায়, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম, তবে ......'. বলতে বলতে তত্তচানের সহপাঠী মিগিতা ফিরে এসে মশায় কামড়ানো হাত-পা খশখশ করে আঁচড়াতে লাগলো।

এ-দৃশ্য দেখে কেউ একজন বললো, 'ভূতকে মশায় কামড় দিয়েছে!'

তাই সবাই আবার হেসে উঠলো।

পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষক মারুইয়ামা 'আচ্ছা, বাকি ভূতদের নিয়ে আসবো।' বলে বের হলো। রাস্তার আলোর নিচে অস্থির চোখে তাকিয়ে থাকা ভূত আর ভয় পেয়ে নিজের বাসায় ফিরে যাওয়া ভূত, সকলকে নিয়ে ফিরে এলো।

এ-রাতের পর থেকে তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আর ভূতকে ভয় পায় নি। কারণ তারা জেনে ফেললো ভূতেরাও ভর পায়।

রিহার্সাল হল

তত্তচান ভদ্রভাবে হাঁটছে। কুকুর রকিও তত্তচানের মুখের দিকে খুব কম তাকিয়ে তত্তচানের মতো ভদ্রভাবে হাঁটছে। এখন নিশ্চয় তারা বাবার রিহার্সাল হল উঁকি দিতে যাচ্ছে। সাধারণত তত্তচান দ্রুত বেগে দৌড়োয় বা পড়ে যাওয়া জিনিস খুঁজতে যাওয়ার জন্য চঞ্চল দৃষ্টিতে আসা-যাওয়া করে বা একটার পর একটা অন্যদের বাগানে বেড়ার নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে

ঢোকে বা বাইরে বেরিয়ে দ্রুত এগোতে থাকে। তাই সে খুব কম সময় আজ-কের মতো ভঙ্গিতে হাঁটে। এতে সহজেই বোঝা যায় তারা এখন রিহার্সাল হলে যাচ্ছে। এটা তত্তচানদের বাসা থেকে পাঁচ মিনিটের পথ।

তত্তচানের বাবা ছিলো অর্কেস্ট্রার কনসার্ট মাস্টার। কনসার্ট মাস্টার সাধারণত বেহালা বাদক। এক দিন তত্তচান কনসার্টে গিয়ে খুব মজা পেয়েছিলো। অনুষ্ঠানের শেষে যখন সবাই হাততালি দিলো, তখন ঘামে ভিজে যাওয়া কণ্ডাক্টর শ্রোতাদের দিকে ঘুরে মঞ্চ থেকে নেমে তত্তচানের বাবার সঙ্গে হাত মিলালো—যে কণ্ডাক্টরের সবচেয়ে কাছে বসে বেহালা বাজাচ্ছিলো। যখন বাবা উঠে দাঁড়ালো, তখন অর্কেস্ট্রার সবাই উঠে দাঁড়ালো।

তত্তচান নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো 'কেন হাত মিলালো?'

মা বললো, 'বাবা এবং তার সঙ্গীরা মন প্রাণ দিয়ে বাজিয়েছে, তাই কণ্ডাক্টর সকলকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য তাদের প্রতিনিধি হিশেবে বাবার সাথে হাত মিলালো।'

তত্তচান রিহার্সাল হলটি পছন্দ করতো, কারণ স্কুলে শুধু ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা আর এখানে শুধু বয়স্ক লোকেরা একত্র হয়ে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজায়। আর কণ্ডাক্টর রোজেনস্টকের জাপানী বলার ধরনটাও ছিলো খুব চমকপ্রদ।

রোজেনস্টকের পুরা নাম য়োজেফ রোজেনস্টক। সে ইয়ুরোপের খুব নামকরা কণ্ডাক্টর। বাবা তাকে বলেছিলো হিটলার নামের একটা লোক যখন ভয়াবহ কান্ড করতে শুরু করে, তখন সে তার সঙ্গীত সাধনা অব্যাহত রাখার জন্য পালিয়ে এত দূর দেশ জাপান পর্যন্ত এসেছিলো। বাবা বললো সে রোজেনস্টককে শ্রদ্ধা করে। তত্তচানের তখনও পৃথিবীর অবস্থা বুঝে ওঠার বয়স হয় নি। তবে হিটলার সে সময়ই ইহুদীদের নির্যাতন করতে শুরু করেছে। এমন না হলে রোজেনস্টকের জাপানে আসার কথা ছিলো না আর ইয়ামাদা কোসাকু প্রতিষ্ঠিত এ-অর্কেস্ট্রাও আন্তর্জাতিক মানের একজন কণ্ডাক্টরের পরিচালনায় এতো তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করতো না। যাই হোক, সে চেয়েছিলো জাপানের অর্কেস্ট্রা ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর অর্কেস্ট্রার মতো একই মানের হয়ে উঠুক। তাই অনুশীলনের শেষে সব সময় রোজেনস্টক ছলোছলো চোখে কাঁদতো, 'আমি এতো প্রাণপণ চেষ্টা করছি, তবুও তোমরা কেন পারছো না?'

এমন অবস্থায় মাঝেমাঝে রোজেনস্টক বিশ্রাম নিতো, তখন তার জায়গায় কণ্ডাক্টরের কাজ করতো প্রথম চেলোবাদক সাইতো হিদেও। সে

সবচেয়ে ভাল জার্মান ভাষা বলতে পারতো, সবার হয়ে সকলের অনুভূতি জানিয়ে সে রেজেনস্টককে সান্ত্বনা দিতো, 'আমরা সবাই প্রাণপণে চেষ্টা করছি। তবে আমরা এখনও যথেষ্ট দক্ষ হই নি। ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা এমন করছি না।'

তত্তচান এ-সব ঝুটঝামেলার কারণ জানতো না। তবে সে মাঝেমধ্যে দেখেছে যে রোজেনস্টক মুখ লাল করে যেন মাথা থেকে গরম বাষ্প বেরোচ্ছে এমন অবস্থায় জার্মান ভাষায় জোরে জোরে চিৎকার করছে। এমন সময় নিজের পছন্দসই জানালার হাতের ওপর থুৎনি ভর দিয়ে উঁকি দেয়া তত্তচান জানালা থেকে মাথা সরিয়ে রকির সঙ্গে মাটিতে উবু হয়ে বসে নিশ্বাস চেপে আবার সঙ্গীত শুরু হওয়ার অপেক্ষা করতো।

রোজেনস্টক কোমল প্রকৃতির মানুষ আর তার জাপানী ভাষায় কথা বলার ভঙ্গিও ছিলো মজার। সঠিক অনুশীলন যখন জমে উঠতে হতো তখন সে বলতো, 'কুরোইয়ানাগি-সান্, খুব ভাল।' ও 'চমৎকার।'

তত্তচান এক বারও অনুশীলন কক্ষের ভেতর যায় নি। সে সব সময় চুপ করে জানালা দিয়ে তাকাতে তাকাতে সঙ্গীত শুনতে ভালবাসতো, তাই বিরতির সময় সবাই যখন সিগারেট খাওয়ার জন্য বাইরে আসতো, তখন প্রায়ই তাকে দেখে তার বাবা বলতো, 'ও, তত্তসুকে, তুমি এসেছো?'

রোজেনস্টক তত্তচানকে দেখলে 'শুপ্রভাত' বা 'শুভ অপরাহ্ন' বলতো। এখন তত্তচান বড় হয়ে গেছে তবুও ছেলেবেলার মতো তাকে ধরে উঠিয়ে তত্তচানের গালে তার গাল লাগাতো। সে একটু লজ্জা পেতো, তবে তত্তচান সরু রূপালী ফ্রেমের চাশমা পরা উঁচু নাকঅলা, বেটেখাটো রোজেনস্টককে পছন্দ করতো। তার চেহারা এতো সুন্দর ও মনলোভা ছিলো যে দেখলে বোঝা যেতো সে একজন শিল্পী।

সেন্‌জোকুদিঘি থেকে প্রবাহিত হাওয়া রিহার্সাল হলের সঙ্গীতের সুর অনেক দূর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতো। মাঝেমাঝে তার সাথে মিশে যেতো 'সোনালী মাছ! সোনালী মাছ' হাঁকা সোনালী মাছ ফেরিঅলার কণ্ঠস্বর। যাই হোক, হেলে পড়া কিছুটা ইয়ুরোপীয় ধরনের এ অনুশীলন-ভবনটিকে তত্তচান পছন্দ করতো।

উষ্ণ প্রস্রবণে ভ্রমণ

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ প্রায়। তখন এলো উষ্ণ প্রস্রবণে ভ্রমণের দিন। ছেলে-মেয়েরা এটাকে স্মরণীয় ঘটনা বলে বিবেচনা করতো। তত্তচানের মা কোনো ব্যাপারে অতটা বিস্মিত হয় না, তবে গ্রীষ্মের ছুটির আগে একদিন তত্তচান স্কুল থেকে ফিরে এসে মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'সবার সঙ্গে উষ্ণ প্রস্রবণে বেড়াতে যেতে পারি?' তখন মা বিস্মিত হলো। বুড়োবুড়ীদের দলে দলে উষ্ণ প্রস্রবণে যাওয়ার কথা শুনেছি, তাই বলে প্রাইমারি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা...। তবে প্রধান শিক্ষকের চিঠি ভাল করে পাঠ করার পর মায়ের কাছে এটা একটা চমৎকার ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হলো এবং সে মুগ্ধ হলো। নোটিশে লেখা ছিলো তারা ভ্রমণে যাবে শিজুওকা বিভাগের ইজু উপদ্বীপের তোই নামক স্থানে। সেখানে হবে তাদের 'সমুদ্রতীরের স্কুল'। সেখানে সমুদ্রের মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে—ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটতে পারবে এবং গরম পানিতে স্নান করতে পারবে। মাত্র দুই রাত তিন দিনের ভ্রমণ। তাতে লেখা আছে, সেখানে তোমোএ স্কুলের একটি ছাত্রের পিতার অবকাশ যাপনের বাসভবন আছে আর তাতে প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত গোটা স্কুলের প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী থাকতে পারে। মা এতে অবশ্যই সম্মতি জানালো।

আজ তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উষ্ণ প্রস্রবণ যাওয়ার জন্য স্কুলে জড়ো হলো। যখন সবাই স্কুলের মাঠে এলো তখন প্রধান শিক্ষক বললো, 'তোমাদের সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো? আমরা ট্রেন ও জাহাজ দুটোতে করেই যাবো। কেউ হারিয়ে যেও না, বুঝেছো। চলো, রওনা হই।'

প্রধান শিক্ষক এতোটুক সতর্ক করলো। তবে যখন তারা সবাই জিইয়ু-গাওকা স্টেশন থেকে তোও-সেন্ লাইনের ট্রেনে উঠলো, তখন তারা বিস্ময়করভাবে শান্ত রইলো, কেউ ছোটাছুটি করলো না। আর কথাও বললো শুধু পাশে বসা ছেলে ও মেয়ের সাথে শান্ত সুবোধভাবে। তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের একবারও স্কুলে এমন নির্দেশ দেয়া হয় নি যে 'সারি বেঁধে ভদ্রভাবে হাঁটবে!', 'ট্রেনের মধ্য নীরব থাকবে!' বা 'কোনো কিছু খাওয়ার সময় আবর্জনা ফেলবে না।' ইত্যাদি। প্রত্যেক দিন জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে অজান্তে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছিলো

যে, নিজেদের চেয়ে ছোট ও দুর্বল লোকদের ঠেলা দিয়ে এগুনো বা তাদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করা লজ্জাকর ব্যাপার; যদি তাদের চোখে পড়ে ছড়ানো ছিটানো ময়লা আবর্জনা, তাহলে নিজদের হাতে তুলে নেয়া বা পরিষ্কার করা উচিত আর এমন আচরণ করা উচিত নয় যা অন্যের কাছে বিরক্তিকর। মাত্র কয়েক মাস আগেও ক্লাসের সময় তত্তচান জানালা দিয়ে বাদকদলের সঙ্গে কথা বলে সবাইকে বিরক্ত করতো। আর সেই তত্তচানই তোমোএ আসার দিন থেকে রীতি মতো নিজের ডেস্কে বসে পড়াশোনা করতে শুরু করলো এমনটি ভাবতেও বিস্ময় লাগে। আগের স্কুলের শিক্ষিকা যদি তত্তচানকে দেখতো তাহলে সে বলতো, 'এ অন্য মেয়ে।' এমনভাবে সবার সঙ্গে ঠিকঠাকভাবে বসে তত্তচান ভ্রমণ করছে।

নুমাজুতে তারা সবাই জাহাজে চড়লো। এটা তাদের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হলো। জাহাজটা খুব বেশি বড় ছিলো না, তবে সবাই উত্তেজিত হয়ে এদিকে ওদিকে উঁকি দিলো, ছুঁয়ে দেখলো, আর ঝুলে দেখলো। অবশেষে যখন জাহাজটা বন্দর থেকে যাত্রা করলো, তখন তারা শহরের লোকজনকে হাত নেড়ে বিদায় জানালো। বৃষ্টি শুরু হওয়ায়, তাই সবাই ডেক থেকে ভেতরে যেতে বাধ্য হলো। তা ছাড়া জাহাজটা ভীষণভাবে দুলতে শুরু করলো। এর মাঝে তত্তচান অসুস্থ বোধ করতে লাগলো। আরো কয়েকজনেরও এমন হলো। তখন ওপরের শ্রেণীর একটি ছেলে আন্দোলিত জাহাজটির মাঝখানে গিয়ে স্থির থাকার ভঙ্গিতে দাঁড়ালো আর যখন জাহাজটি গড়াতে শুরু করলো, তখন সে 'ও!, বাবা ও, বাবা!', বলে বাম ও ডান দিকে ছুটে গেলো। সবাই অসুস্থ বোধ করে প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থায় ছেলেটির 'ও, বাবা!, ও, বাবা!' বলে দৌড়ানো দৃশ্য দেখে সবাই-র হাসি পেলো এবং হাসতে হাসতে তারা তোইতে পৌঁছে গেলো। বলতে একটু বেদনাবোধ হয়, সে সঙ্গে মজার কথাও বটে, সে যখন জাহাজ থেকে নেমে সবাই ভাল হয়ে গেছে তখন শুধু 'ও, বাবা!' বলে দৌড়ানো ছেলেটিই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

উষ্ণ প্রস্রবণের জায়গা তোই ছিলো সমুদ্র, ঝোপঝাপ ও পাহাড়ে ঘেরা একটা শান্ত সুন্দর গ্রাম। একটু বিরতির পর শিক্ষকেরা সকলকেই সমুদ্রে নিয়ে গেলো। এটা স্কুলের সাঁতারদিঘি নয়, তাই সমুদ্রে নামার সময় সবাই সাঁতার পোশাক পরিধান করলো।

সমুদ্রের মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণ থাকা একটা অনন্য ব্যাপার। কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত উষ্ণ প্রস্রবণ আর কোন জায়গা থেকে সমুদ্র, তা নির্দেশ করার লাইন ও বেড়া ছিলো না।

তাই 'এইখানে উষ্ণ প্রস্রবণ', বলে প্রস্রবণের জায়গাটি দেখিয়ে দেয় ওই জায়গায় উবু হয়ে বসলে স্নানাগারেরর পানির মতো গরম পানি গলা পর্যন্ত ওঠে তখন খুব ভাল লাগে। আর প্রস্রবণ থেকে সমুদ্রে যেতে চাইলে কাত হয়ে পাঁচ মিটার মতো হাঁটলে ধীরে ধীরে উষ্ণতা কমে যায় এবং আরো এগুলে পানি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাই সেখান থেকে সমুদ্র শুরু— এটা বোঝা যায়। সমুদ্রে সাঁতার কেটে কেটে যখন ঠাণ্ডা লাগলো সকলে, তখন খুব ব্যস্ততার সাথে গরম প্রস্রবণে ফিরে এসে তারা গলা পর্যন্ত ডুবে রইলো এমন অবস্থায় কেন যেন মনে হয় নিজের বাসায় আছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সমুদ্রের ভাগে গেলে ছেলেমেয়েরা সাঁতারের টুপি শক্ত করে পরে, তবে একই সমুদ্রে হলেও যখন তারা উষ্ণ প্রস্রবণের ভাগে থাকে, তখন তারা গোল হয়ে আরামের ভঙ্গিতে ভেসে ভেসে গল্প করে। কেউ এমন দৃশ্য দেখলে মনে করবে যে এরা প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রী হলেও উষ্ণ প্রস্রবণে প্রবেশ করে এরা বুড়োবুড়ির মতো আচরণ করছে।

তখন সমুদ্র প্রায় জনহীন, তাই সমুদ্র ও উষ্ণ প্রসবণটিও যেন ছিলো একান্তভাবে তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ। সবাই মনপ্রাণ দিয়ে এই অদ্ভুত উষ্ণ প্রসবণে সাঁতার কাটার আনন্দ পেলো। তাই সন্ধ্যায় তারা যখন অবকাশ যাপনের বাসভবনে ফিরে এলো, তখন তারা যেহেতু অনেকক্ষণ ধরে পানির মধ্যে ছিলো, তাই তাদের আঙুলের ডগার চামড়ায় কোঁচকানো অনেক রেখা দেখা গেলো।

প্রত্যেক রাতে শোয়ার পর তারা পালা করে ভূতের গল্প বললো। প্রথম শ্রেণীর ছাত্র তত্তচানরা সবাই ভয় পেয়ে কাঁদলো। আর কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'তারপর?''

তোই উষ্ণ প্রস্রবণে তিন দিনের এই ভ্রমণ, স্কুলের আগের ক্যাম্পিং ও সাহস পরীক্ষা থেকে ছিলো ভিন্ন। এটা ছিলো খাঁটি জীবন। উদাহরণ হিশেবে বলা যায় রাতের খাবারের জিনিসপত্র কেনার জন্য বার বার তাদের শাকসব্জির দোকানে যেতে হলো আর অপরিচিত বয়স্ক লোকজন জিজ্ঞেস করলো, 'কোন স্কুলের ছাত্র? 'কোথা থেকে এসেছো?' তখন

তাদের ঠিক মতো উত্তর দিতে হলো। এদিকে একজন তো ঝোপের মধ্যে প্রায় হারিয়ে গেলো, কোনো একজন দূর পর্যন্ত সাঁতার কাটতে গিয়ে ফিরে আসতে না পেরে সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুললো, সমুদ্রের তীরে কাঁচের টুকরোয় একটি ছেলের পা কেটে গেলো। প্রত্যেকবারই তারা ভাবলো কী করে তারা প্রত্যেকের উপকারে আসতে পারে।

তবে আনন্দের কথাও ছিলো অনেক অঢেল। অনেক বড় ঝোপ ছিলো, যেখানে ছিলো প্রচুর ঘুর্ঘুরে পোকা। আইসক্রিমঅলাও ছিলো। আর এমন একজন লোকের সাথে দেখা হলো যে সমুদ্রতীরে একা একটা বড় কাঠের জাহাজ তৈরি করছিলো। জাহাজটা তৈরি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো, তাই সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সবাই জাহাজটির কাছে ছুটে যায়, এটা দেখার জন্য—গতকালের পর কতোটুকু তৈরি হয়েছে। তত্তচান লোকটির কাছ থেকে উপহার পেলো রেঁদা দিয়ে চেঁছে ফেলা কাঠের একটা ফালি।

ঘরে ফেরার দিন প্রধান শিক্ষক বললো, 'স্মৃতি-ছবি তুলবে না তোমরা?' আগে একসঙ্গে সবাইর ছবি তোলা হয় নি, তাই তারা আবার উত্তেজিত হলো।

যখন একজন শিক্ষিকা বললো, 'আমি তোমাদের ছবি তুলছি।' তখন কোনো একজন টয়লেটে গিয়েছিলো, আবার যখন সে বললো, 'এবারে ঠিক আছে?' তখন ধরা পড়লো যে একজন ডান পায়ের জুতো বাঁ পায়ে আর বাঁ পায়ের জুতো ডান পায়ে পরেছে। তখন সে ঠিক মতো জুতো পরলো।

যারা অনেকক্ষণ ধরে বুক টানটান করে পোজ দিচ্ছিলো, যখন শিক্ষিকা বললো, 'সত্যিই প্রস্তুত!' তখন তারা 'আ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমরা আর পারছি না!', বলে শুয়ে পড়লো। এভাবে অনেক সময় লাগলো ছবি তুলতে।

তবে সমুদ্রের পটভূমিতে যার যার নিজের ভঙ্গিতে তোলা এই ছবিটি ছেলেমেয়েদের কাছে হলো একটা মূল্যবান সম্পদ। এ-ছবি দেখলে জাহাজের কথা, উষ্ণ প্রস্রবণের কথা, ভূতের গল্পের কথা ও 'ও, বাবা!', বলা ছেলেটির কথা এক সঙ্গে মনে উদিত হয়।

এভাবে তত্তচানের প্রথম গ্রীষ্মের ছুটি নানা অবিস্মরণীয় আনন্দময় ঘটনার মধ্য দিয়ে কেটে গেলো।

তখন টোকিওর পুকুরে অনেক বাগ্‌দা চিংড়ি পাওয়া যেতো আর বড় বড় গরুগুলো আবর্জনার গাড়ী টানতো।

ইউরিদ্‌মিক্স বা তাললয় বিদ্যা

গ্রীষ্মের ছুটির শেষে দ্বিতীয় সিমেস্টার শুরু হলো। গ্রীষ্মের ছুটির সময় যখনই কোনো সমাবেশ হয় তখনই তত্তচান নিজের ক্লাসের সহপাঠীদের ছাড়াও ওপরের শ্রেণীর প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালো এবং আগের চেয়ে আরো বেশি করে তোমোএ স্কুলকে ভালবাসতে লাগলো।

তোমোএ স্কুলে পড়ানোর পদ্ধতি অন্যান্য স্কুল থেকে ভিন্ন ছিলো। তা ছাড়া সঙ্গীতের ক্লাস বেশি ছিলো। নানা ধরনের সঙ্গীতের পাঠ ছিলো, তবে সেগুলোর মধ্যে প্রত্যেকদিন ছিলো ইউরিদ্‌মিক্স বা তাললয়ের ঘণ্টা। ইউরিদ্‌মিক্স হচ্ছে ডালক্রোজ নামক সুইজ্যারল্যান্ডের একজন শিক্ষাবিদের দ্বারা উদ্ভাবিত বিশেষ ধরনের তাললয়ের শিক্ষা। ১৯০৫ সালের দিকে এই শিক্ষা প্রচার লাভ করে। তখন তা সারা ইউরোপ ও আমেরিকায় অবিলম্বে গৃহীত হয়, এমনকি প্রত্যেক দেশে এর প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট ও গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট স্থাপিত হয়। তোমোএ স্কুলে কেমন করে শিক্ষক ডালক্রোজ-এর ইউরিদ্‌মিক্স বা তাললয় বিদ্যা প্রবেশ করলো তার কাহিনী বলছি।

তোমোএ স্কুল শুরু করার আগে বিদেশী শিশুদের কী ভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, তা দেখার জন্য প্রধান শিক্ষক কোবাইয়াশি সোসাকু ইউরোপ যাত্রা করে। সেখানে সে বহু প্রাইমারি স্কুল দেখে এবং শিক্ষাবিদদের কথা শোনে। এমন সময় প্যারিসে শিক্ষক কোবাইয়াশির সাথে দেখা হয় সুরকার ও শিক্ষাবিদ ডালক্রোজের সাথে।

'ছেলেমেয়েরা কান দিয়ে নয় বরং মন দিয়ে শুনে অনুভব করে কী করে সঙ্গীত শিক্ষা করতে পারে এ-সম্পর্কে ডালক্রোজ দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা-ভাবনা করছিলো। নিস্তেজ শিক্ষা না হয়ে বরং গতিশীল, জীবন্ত

সঙ্গীত কী করে উপলব্ধি করানো যায় ...। কী করে ছেলেমেয়েদের অনুভূতি জাগানো যায়?'

অবশেষে সে ছেলেমেয়েদের নিজের ইচ্ছামতো লাফাতে ঝাপাতে দেখে সে ইউরিদ্‌মিক্স বা তাললয় বিদ্যা নামের ছন্দোস্পন্দিত ব্যায়াম সৃষ্টি করে। এ-কথা জেনে শিক্ষক কোবাইয়াশি ডালক্রোজের প্যারিসের বিদ্যালয়ে এক বছরেও বেশি সময় অবস্থান করে ইউরিদ্‌মিক্স পুরোপুরি-ভাবে আয়ত্ত করে। একটু ঐতিহাসিক কাহিনী বলছি। ওই সময় বহু জাপানী ডালক্রোজ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো। যেমন সুরকার ইয়ামাদা কোসাকু, আধুনিক নৃত্যের প্রবর্তক ইশিই বাকু, কাবুকি অভিনেতা দ্বিতীয় ইচিকাওয়া সাদানৃজি, নব নাট্য আন্দোলনের প্রবর্তক ওসানাই কাওরু ও নৃত্যশিল্পী ইতো মিচিরো প্রমুখ ডালক্রোজ থেকে তালিম পেয়েছিলো যে ইউরিদ্‌মিক্স হচ্ছে প্রতিটি শিল্পকলার মূল। তবে ইউরিদ্‌মিক্সকে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার প্রথম গ্রহণ করার চেষ্টা শিক্ষক কোবাইয়াশি করে।

'ইউরিদ্‌মিক্স কী ধরনের ব্যাপার?' এমন প্রশ্ন করা হলে শিক্ষক কোবাইয়াশি উত্তর দিতো, 'ইউরিদমিক্স হচ্ছে দেহ কাঠামোকে আরো সূক্ষ্ম সংবেদনাশীল করার খেলা। ইউরিদ্‌মিক্স হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল শেখানোর খেলা। ইউরিদ্‌মিক্স হচ্ছে মন ও শরীরকে ছন্দোস্পন্দন অনুভব করানোর খেলা। ইউরিদ্‌মিক্স অনুশীলনকালে স্বভাব ছন্দোস্পন্দনময় হয়ে যায়। ছন্দোস্পন্দনময় স্বভাব প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে সুন্দর, সরল ও সহজভাবে।'

এ-সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলার আছে, তবে যাই হোক তত্তচানদের ক্লাস শুরু হলো শরীরকে তাললয় অনুভব করানোর ব্যায়াম থেকে। মিলনায়তনের ছোট মঞ্চের ওপর প্রধান শিক্ষক পিয়ানো বাজায়। তার সঙ্গীতের সাথে তাল মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে হাঁটতে শুরু করে। তারা নিজের ইচ্ছামতো হাঁটতে পারে, তবে অন্যরা যে অভিমুখে হাঁটে, তার বিপরীতে হাঁটলে ধাক্কা খেতে হয় বলে ভাল লাগে না। তাই একই দিকে অর্থাৎ একটি বৃত্ত তৈরির মতো, তবে এক লাইন না বেঁধে নিজের ইচ্ছামতো তারা হাঁটে। "দুই বিট"-এর সুর শুনলে কণ্ডাক্টরের মতো দুহাত বাড়িয়ে দুতালে ওপরে নিচে দোলাতে

দোলাতে তারা হাঁটে। তারা জোরে জোরে বা সশব্দে হাঁটে না, তার মানে এই নয় যে তারা ব্যালের মতো পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হাঁটে। শিক্ষক বললো, 'পায়ের বুড়ো আঙুল হ্যাঁচড়ানোর মতো নিজের ভাল লাগে এমনভাবে গড়ানোর ভঙ্গিতে হাঁটা ভাল।' তবে যাই হোক সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে স্বাভাবিকতা, তাই প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজের যেভাবে হাঁটতে ভাল লাগে সেভাবে হাঁটতে পারতো। আর ছন্দোস্পন্দন যখন "তিন বিট"-এর হয়, তখন তারা দু'হাত তিন তালে দুলিয়ে তালের সাথে মিলিয়ে দ্রুত বা আস্তে হাঁটতে হয়। কণ্ডাক্টরের ভঙ্গির মতো দুই হাত ওপরে নিচে দোলানো "ছয় বিট" পর্যন্ত ছিলো।

'চার বিট'-র সময় সহজ—'হাত নিচু করে, ঘুরিয়ে, পাশ থেকে ওপরের দিকে।'

তবে পাঁচ বিটের সময় 'হাত নিচু করে, ঘুরিয়ে সামনে বাড়িয়ে পাশে টেনে ওই অবস্থায় ওপরের দিকে।'

ছয় বিটের সময় 'এমন হাত নিচু করে ঘুরিয়ে সামনে বাড়িয়ে আরেক বার বুকের সামনে ঘুরিয়ে পাশের দিকে সরিয়ে ওই অবস্থায় ওপরের দিকে।'

তাই যখন তাল একের পর এক পরিবর্তিত হতো, তখন বেশ কঠিন মনে হতো এবং আরো কঠিন মনে হতো যখন প্রধান শিক্ষক মাঝেমাঝে পিয়ানো বাজাতে বাজাতে জোরে বলতো, 'পিয়ানোর তাল বদলের সাথে সাথে তোমরা তাল বদল কোরো না!' উদাহরণ হিসেবে বলা হয় তারা যখন 'দুই বিট'-র তালে হাঁটছে, তখন পিয়ানোর সুর হয়ে যায় 'তিন বিট'-এর। তবে তারা 'তিন বিট' শুনতে শুনতে 'দুই বিট'-র অবস্থায় হাঁটতে থাকে। এটা খুব কঠিন, তবে শিক্ষকের ধারণা ছিলো যে এমন সময় ছেলেমেয়েরা নিজেদের একাগ্রতার শক্তি ও নিজ নিজ দৃঢ় সংকল্প ইত্যাদির চর্চা করতে পারে।

যখন শিক্ষক চিৎকার করে 'এখন ঠিক আছে!' তখন ছাত্রছাত্রীরা 'আ, বাঁচা গেলো ...', মনে করে অবিলম্বে তিন বিটে পরিবর্তন করে, তবে এ-সময় কোনো দ্বিধা না করে তারা তৎক্ষণাৎ আগের দুই বিট ছেড়ে মস্তিষ্কের আদেশ অনুসারে শরীরে অর্থাৎ মাংসপেশীর গতির মধ্যে স্থানান্তরিত করে তিন বিটের তালের সাথে তাল মিলায়। আর তার পর

মুহূর্তে পিয়ানোর তাল পাঁচ বিটে বদলে যায়। প্রথমে তাদের হাত ও পা এলোমেলোভাবে চালিত হতো আর সবাই 'স্যার, দাঁড়ান', দাঁড়ান', বলে গুটিয়ে উঠতো। তবে অভ্যস্ত হতে হতে এটা তাদের কাছে খুব আনন্দদায়ক মনে হতে লাগলো এবং তারা নিজেরা নানা রকম মুদ্রা ব্যবহার করতে পারতো বলে আনন্দ পেতো। অধিকাংশ সময় হাঁটার প্রবাহের মধ্যে তারা একা একা চলতো, তবে ভাল লাগলে অন্য কারো পাশাপাশি হাঁটতো। শুধু দুই বিটের সময় অন্য কারো হাত ধরে বা চোখ বন্ধ করে চলতো। তবে শুধু কথা বলাই বারণ ছিলো। অভিভাবক ও শিক্ষক সমাবেশের সময় কখনো কখনো মায়েরা চুপ করে জানালা দিয়ে দেখতো। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে হাত-পা প্রসারিত করে অত্যন্ত মনোহর ভঙ্গিতে লাফ দিচ্ছে এবং পিয়ানোর স্বরের তালে তালে ঠিক মতো চলছে—এ দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগতো।

ইউরিদ্‌মিক্স শুরু হয় শরীর ও মনে তাললয় বোধ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে, এটা শরীর ও মনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে সাহায্য করে এবং সাথে সাথে কল্পনা-শক্তি জাগিয়ে সৃষ্টি শক্তির বিকাশ ঘটায়। স্কুলে আসার প্রথম দিনে স্কুল গেটের পাশে তত্তচান তার মাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলো, 'তোমোএ মানে কী?' এ-স্কুলের তোমোএ হচ্ছে একটা শাদা ও একটা কালো প্রতীকের মিলনে সৃষ্ট একটি প্রতীক (এতে দুটি বড় কমা-চিহ্নকে বিন্যস্ত করে একটি বিশুদ্ধ বৃত্ত তৈরি করা হয়।) প্রধান শিক্ষক ছেলেমেয়েদের মন ও শরীর উভয়ের উন্নতি ও সামঞ্জস্য সাধনের যে কামনা পোষণ করছে, এটা ছিলো তারই প্রকাশ।

নানা রকমের ইউরিদ্‌মিক্স ছিলো। তবে প্রধান শিক্ষক সব সময় ভাবতো ছেলেমেয়েদের জন্ম-স্বভাবকে বয়স্ক লোকদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে কী করে উন্নত করা যায়। আর সে দুঃখ করে বলতো, 'বর্তমান শিক্ষা অক্ষর ও ভাষার ওপর বড় বেশি নির্ভরশীল। এ-শিক্ষা ছেলেমেয়েদের মন

দিয়ে প্রকৃতিকে দেখার, ঈশ্বরের নিঃশব্দ বাণী শোনার ও অনুপ্রেরণা লাভের মতো ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষতি করছে না?'

ফুরুইকেইয়া কাওয়াজু তোবিকোমু মিজু নো ওতো।

(পুরোনো পুকুরে ব্যাঙের লাফ, পানির শব্দ—জাপানী হাইকু ...... কবিতা) পুকুরে ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ে ডুবে যাওয়ার ঘটনা শুধু বাশো নয়, অনেক দেখেছে। পানি ফোটানো লোহার কেত্‌লি থেকে বাষ্প নির্গত হতে অনেকে দেখেছে, অনেক দেখেছে আপেল পড়তে, যুগে যুগে পূর্বে-পশ্চিমে শুধু একজন ওয়াট, শুধু একজন নিউটন হওয়ার কথা নয়।

এ জগতে শুধু চোখ থাকলেও সৌন্দর্য দেখতে পায় না, কান থাকলেও সঙ্গীত শোনে না, মন থাকলেও সত্য বোঝে না, আলোড়িত হয় না বলে জ্বলে না......এমন ধরনের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের সংশয় ছিলো।

এ-কথা ভেবেই প্রধান শিক্ষক সুফল ফলবে বলে ইউরিদ্‌মিক্স পাঠ হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। তত্তচান ইসাডোরা ডাংকানের ভঙ্গিতে খালি পায়ে চার দিকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঘুরছিলো। এটা স্কুলে পড়াশোনার একটা অংশ হতে যাচ্ছে জেনে তত্তচান ভীষণ আনন্দ পেতো।

জীবনের সেরা সাধ!

জীবনে প্রথম তত্তচান মন্দিরের মেলায় গিয়েছিলো। আগের স্কুলের ধারে সেনজোকু পুকুরের মাঝখানে ছিলো একটি ছোট দ্বীপ। আর সে দ্বীপে ছিলো ভাগ্যদেবী বেন্‌তেন-এর নামে উৎসর্গ করা একটি মন্দির। মা-বাবা তত্তচানকে নিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, মেলায় পৌঁছার আগেই হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। মেলা সেখানে বসেছিলো সে রাস্তাটা রং বেরঙের আলোতে আলোকিত ছিলো। একবার সেদিকে তাকিয়েই তত্তচান উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং প্রত্যেকটি ছোট দোকানে মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিচ্ছিলো। এখানে ওখানে শোনা গেলো 'পি পি',

'ফট্' ও 'হিস্‌হিস্' নানা রকম শব্দ এবং নাকে প্রবেশ করলো নানা রকম গন্ধ। প্রত্যেক দোকান এমন সব নতুন জিনিসে ঠাসা ছিলো যা সে আগে কোনোদিন দেখে নি। লাল, হলুদ ও পাটল রঙের সুতো দিয়ে ঝোলানো ছিলো মেনথল পাইপ। পাইপের কলকের অংশ কুকুর, বেড়াল ও বেটির ছবি দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিলো। আর ছিলো হাওয়াই মিঠাই, কচ্ছপের খোলের আকারের মিছরি। ছিলো বাঁশের নল দিয়ে তৈরি ইয়ামাবুকি নামের খেলনা বন্দুক। সাদা রঙের ইয়ামাবুকি ফুলের শাঁস ঢুকিয়ে লাঠি দিয়ে চাপ দিলে 'ফট্!' করে স্প্রীংয়ের মতো, লাফিয়ে উঠার মতো শব্দ হয়। রাস্তার ধারে খেলা দেখাচ্ছিলো একজন। সে তলোয়ার গিলে ফেলছিলো ও কাঁচের টুকরো খেয়ে ফেলছিলো। অন্য দিকে বসে আছে একজন গুঁড়ো বিক্রেতা। তার গুঁড়ো বড় বাটির কিনারে লাগালে 'ওয়া-ন্' করে শব্দ হয়। তাছাড়া ছিলো টাকা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার যাদু—যার নাম 'সোনালী বৃত্ত'। সূর্যের আলোতে ছবি তোলার খেলনা, ছিলো এমন কৃত্রিম ফুল যা গ্লাসের পানিতে রাখলেই ফোটে......

এদিকে সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো তত্তচান। হঠাৎ সে 'বা-হ্!' বলে থেমে গেলো। সেখানে দেখলো খাঁটি হলুদ রঙের কত-গুলো মুরগির ছানা। ছোট একটি বাক্সের অনেকগুলো লেদা গোলগাল মুরগির ছানা কিচিরমিচির করছিলো।

তত্তচান বলে উঠলো, 'আমি নিতে চাই।'

তত্তচান মা-বাবার হাত ধরে টেনে বললো, 'আমার জন্য এটাই কেনো।'

ছানাগুলো তত্তচানের দিকে তাকিয়ে ছোট ছোট পুচ্ছ তুলে ঠোঁট উঠিয়ে আরো জোরে জোরে কিচিরমিচির করতে লাগলো।

'কী মিষ্টি ...!' তত্তচানের মনে হলো এমন মন ভোলানো জিনিস এর আগে সে কখনো দেখে নি। ওগুলোর পাশেই সে হাঁটু গেড়ে বসে রইলো।

'শোনো'—বলে তত্তচান মা-বাবার দিকে তাকালো, তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে কালবিলম্ব না করে তার বাবা-মা তত্তচানকে দ্রুত নিয়ে যেতে উদ্যত হলো।

তত্তচান বললো, 'শোনো, তোমরা বলছো আমাকে, কিছু কিনে দেবে। এগুলো ছাড়া আর কিছু আমি চাই না।'

মা শান্তভাবে বললো, 'সোনা মণি আমার, এগুলো যখন তখন মরে যাবে। এগুলো চেয়ো না, সোনা।'

তত্তচান কাঁদো কাঁদো স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

ছানাঅলা যাতে শুনতে না পায়, সেজন্য বাবা তাকে রাস্তার এক পাশে নিয়ে তাকে বুঝাতে চেষ্ট করলো, 'এগুলো দেখতে এখন মিষ্টি, তবে এগুলোর শরীর খুব দুর্বল, তাই শিগগির মরে যাবে, যখন মরে যাবে তখন তোমার কান্নাকাটি ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না তাই এগুলো তোমাকে দিতে চাই না।'

তত্তচানের মনপ্রাণ ছানাগুলোর জন্য বস হয়ে গেছে, তাই বাবার কথা শুনতে চাইলো না। সে বললো, 'আমি এগুলোকে মরতে দেবো না। আমি এগুলো পালবো, তাই আমার অনুরোধ।', বলে গোঁ ধরলো।

মা-বাবা ছানার বাক্সের সামনে থেকে তত্তচানকে জোরে টেনে নিলো। তখন তত্তচান ছানাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। ছানাগুলোও তত্তচানের সাথে চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আরো জোরে জোরে কিচিরমিচির করে উঠলো। তত্তচানের মনে হলো ছানা ছাড়া আর কিছু সে চায় না। মাথা নত করে মা-বাবাকে বললো, 'আমার অনুরোধ, ছানাগুলো কেনো।'

মা-বাবা তবুও অটল। তারা বললো, 'শেষে তুমি কাঁদবে, তাই না কেনাই মনে হয় ভালো।'

তত্তচান ভীষণভাবে কান্না শুরু করলো আর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো। তারা যখন অন্ধকার রাস্তায় পৌঁছলো, তখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'অনুরোধ করছি, এটা আমার সারা জীবনের সাধ! সারা জীবনে আমি আর কিছু কিনতে চাইবো না। দয়া করে ওই ছানাগুলো কিনে দাও।'

অবশেষে বাবা-মা তার কথা মেনে নিলো।

কিছুক্ষণ আগে যে কাক কাঁদছিলো সে এখন খুশিতে হাসছে—কারণ তত্তচানের হাতের মধ্যে ছিলো ছোট একটি বাক্সে দুটি মুরগির ছানা।

পরের দিন মা কাঠ মিস্ত্রীকে বলে শিক লাগানো বিশেষ ধরনের একটি বাক্স তৈরি করলো এবং ভেতরে বাল্‌ব রেখে বাক্সটি গরম রাখার ব্যবস্থা

করলো। তত্তচান সারাদিন ছানাগুলো দেখেফিরে কাটালো। হলুদ রঙের ছানাগুলো কী মিষ্টি! তবে চার দিনের দিন হঠাৎ একটা ছানা নিশ্চুপ হয়ে গেলো এবং পরের দিন নিশ্চুপ হয়ে গেলো অন্য ছানাটিও। বারবার তাদের গায়ে হাত বুলালেও, তাদের নাম ধরে ডাকলেও তারা আরেকবার কিচির-মিচির করলো না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেও তারা আর চোখ খুললো না। ঠিক মা-বাবার কথা মতো তত্তচান একা কাঁদতে কাঁদতে বাগানে গর্ত খুঁড়ে ছানা দুটিকে কবর দিলো আর সেখানে অর্পণ করলো কয়েকটি ছোট ফুল। তখন ছানাহীন বাক্সটি শূন্য আর বিশাল দেখাচ্ছিলো। বাক্সের ভেতরে যখন ছোট্ট হলুদ রঙের পালক তার চোখে পড়লো, তখন তার মনে পড়লো মেলায় তাকে দেখে তারা যেমন কিচিরমিচির করেছিলো সে-কথা মনে পড়তেই তত্তচান শক্তভাবে দাঁতে দাঁত চেপে কাঁদতে থাকলো।

তত্তচানের সারা জীবনের একমাত্র সাধ এতো তাড়াতাড়ি মিটে গেলো। এটা ছিলো তত্তচানের জীবনে প্রথম 'বিচ্ছেদ-বেদনার' অভিজ্ঞতা।

সবচেয়ে খারাপ পোশাক

প্রধান শিক্ষক সবসময় ছাত্রছাত্রীদের মা-বাবাকে বলতো, 'সবচেয়ে খারাপ পোশাক পরিয়ে স্কুলে পাঠাবেন।' কেননা "নোংরা করলে মা বকবে" বা "ছিঁড়ে যাবে, তাই খেলবো না"—এমন কথা ছেলেমেদের কাছে বিরক্তিকর, তাই যে পোশাকে ভীষণভাবে কাদা মেখে গেলেও বা ছিঁড়ে ছেড়ে গেলেও কোনো অসুবিধা নেই, তেমন খারাপ পোশাক পরিয়ে স্কুলে পাঠানোর জন্য প্রধান শিক্ষক অনুরোধ করছিলো। তোমোএ স্কুলের কাছের কোনো কোনো স্কুলের ছেলেমেয়েরা উর্দি পরতো আর নাবিকদের পোশাক পরতো বা ছাত্র পোশাকের নিচে হাফ প্যান্ট পরতো। তবে তোমোএ স্কুলের ছেলেমেয়েরা দৈনন্দিন সাধারণ পোশাক পরে স্কুলে আসতো। তাই তারা শিক্ষকের কথামতো পোশাকের কথা না ভেবে যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে খেলতো। সেকালে এখনকার জিনসের মতো টেকসই কাপড় তখন ছিলো না, তাই প্রত্যেকটি ছেলেদের প্যান্টে তালি দেয়া হতো আর মেয়েদের স্কার্টও যথাসম্ভব টেকসই কাপড় দিয়ে তৈরি করা হতো।

তত্তচানের সবচেয়ে পছন্দসই খেলা হচ্ছে অন্যের বাসার বেড়ার নিচ দিয়ে বা খোলা মাঠে বেড়ার নিচ দিয়ে পার হয়ে যাওয়া। তাই পোশাকের কথা ভাবতে হতো না বলে এটা তার কাছে সুবিধাজনক ছিলো। সেকালের বেড়াকে বলতো কাঁটা তারের বেড়া। কোনো কোনো বেড়ার তার প্রায় মাটির ওপর লেগে শক্ত করে জট পাকিয়ে থাকতো। এ-বেড়ার নিচে মাথা ঢুকিয়ে কাঁটা তার উপরে তুলে ধরে গর্ত তৈরি করে সে তারের নিচ দিয়ে আসা যাওয়া করতো। ঠিক কুকুর যেমন করে, তেমন-ভাবে। তখন তত্তচানও সাবধানে থাকতো, তবুও কাঁটা তারে পোশাক আটকে ছিঁড়ে যেতো। একবার তত্তচান পরেছিলো একটা মসলিন ধরনের কাপড়ে তৈরি খুব পুরোনো একপিসের পোশাক যার সুতো মাত্র অবশিষ্ট ছিলো। তখন তার স্কার্ট তারে লেগে ছিঁড়ে গিয়েছিলো এমন বলা যায় না, বরং তার পিঠ থেকে নিতম্ব পর্যন্ত সাত সাতটা জায়গায় এমন আঁকা-বাঁকাভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিলো যে দেখে মনে হচ্ছিলো সে যেন তার পিঠে একটি ঝুলঝারনি বহন করছে। তত্তচান জানতো এ পোশাকটি

পুরোনো, তবে তার মা ওটিকে খুব পছন্দ করতো। তাই তত্তচান ভীষণ চিন্তায় পড়লো। অর্থাৎ সে ভাবলো যদি সে মাকে বলে যে 'কাঁটা তারের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় পোশাক ছিঁড়ে গেছে', তাহলে মা দুঃখ পাবে। তাই সে মনে করলো মিথ্যে হলেও সে যদি বলে, 'আমি ছিঁড়ি নি, এমনই ছিঁড়ে গেছে।' তাহলে উত্তম হয়।

বাসায় ফেরার সাথে সাথে মিথ্যে কথাটি তার মনে পড়লো, তত্তচান তার মাকে তাই বললো, 'কিছুক্ষণ আগে আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম, তখন অচেনা ক'টা ছেলে আমার পিঠে চাকু মারলো, তাই আমার পোশাক এমনভাবে ছিঁড়ে গেছে।'

বলার সময় তার মনে হচ্ছিলো যে মা যদি সব কথা খতিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে তাহলে অসুবিধা হবে।

তবে আনন্দের কথা হচ্ছে মা শুধু বললো, 'অ্যা, তাই নাকি? ভীষণ বিপদে পড়েছিলে, তাই না!'

'আহ্, বাঁচা গেলো।', বলে তত্তচান হাঁফ ছাড়লো। তবে তার মনে হলো মায়ের পছন্দসই পোশাকটি যে ছিঁড়ে যাওয়ার হাত থেকে সে রক্ষা করতে পারে নি এ-কথা অবশ্যই মা বুঝেছে। এটা ছুরির আঘাতে ছিঁড়েছে তা অবশ্যই মায়ের বিশ্বাস করার কথা নয়। পেছন থেকে পিঠে চাকু মারলো অথচ তাতে শরীরের কোনো অংশ ক্ষতবিক্ষত হলো না শুধু পোশাকটি ফালি ফালি হয়ে গেলো এটা অসম্ভব। তা ছাড়া দেখে মনে হলো তত্তচান একটুও ভয় পায় নি। তাই তখনই বোঝা গেলো ওটা মিথ্যে কথা। তবে তত্তচানের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনামূলক কথা বলা একটু অসাধারণ ব্যাপার, তাই মা মনে করলো তত্তচান নিশ্চয়ই নিজের পোশাক নিয়ে উদ্বিগ্ন, আর সে ভাল মেয়ে। অনেক দিন ধরেই মা জিজ্ঞেস করবে বলে ঠিক করলো। সে বললো, 'তোমার পোশাক চাকু ও নানা কিছুতে লেগে ছিঁড়ে যায়— তাই বুঝি, তবে এমনকি জাঙিয়াও কেন প্রত্যেকদিন আঁকাবাঁকা করে ছেঁড়া থাকে?'

মা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না লেস্ ও রাবারের ফিতা লাগানো শাদা সূতি কাপড়ে তৈরি জাঙিয়া নিতম্বের অংশে কেন প্রত্যেক দিন ছেঁড়া থাকে।

(পিছন জায়গায় পিছলে পিছলে বা নিতম্ব থেকে খুলে পড়ায় তার জাঙিয়ায় কাদা মেখে যায় বা তা পাতলা হয়ে যায় এটা বোঝা যায়, তবে ফালি ফালি হয়ে ছিঁড়ে যায় কেন?)'

তত্তচান একটু ভেবে বললো, 'দেখো, নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দেয়ার সময় প্রথমে স্কার্ট তারে আটকে যায় আর "ভেতরে কেউ আছে?" ও "আচ্ছা, তাহলে আসি।", বলে বেড়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঢুকতে ও বেরুতে জাঙিয়া ছিঁড়ে যায়!'

তার কথা ঠিক মতো বোঝা গেলো না, তবে মা কৌতুক বোধ করে জিজ্ঞেস করলো, 'এমন করতে মজা লাগে বুঝি!?'

মায়ের এমন প্রশ্নে তত্তচান অবাক হয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে বললো, 'মা, তুমিও এমন করে দেখো। দারুণ মজা। আমার মনে হয় তাহলে তোমার জাঙিয়াও নিশ্চয় ছিঁড়ে যাবে!?'

তত্তচানের মজাদার রোমাঞ্চকর খেলা এমনভাবে চলে; খেলা এলাকায় লম্বা কাঁটাতারের বেড়া দেখলে সে তার এক প্রান্ত তুলে ধরে নিচে গর্ত তৈরি করে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে বলে, 'ভেতরে আসতে পারি? একটু বিরক্তি করছি।' তার পর কাঁটা তারের একটু পাশের অংশ ভেতর থেকে উপরে তুলে ধরে আবার গর্ত তৈরি করে, 'আচ্ছা, এখন আসি।', বলে নিতম্ব আগে বের করে বেরোয়। মা অবশেষে বুঝলো যে এ-সময় অর্থাৎ নিতম্ব আগে বের করে বেরুনোর সময় স্কার্ট উপরে ওঠে যায় আর জাঙিয়া তারে আটকা পড়ে। এমনভাবে একটার পর একটা গর্ত তৈরি করে 'ভেতরে আসতে পারি? একটু বিরক্তি করছি।' ও 'তাহলে এখন আসি।', বলে বার বার প্রবেশ ও বেরুনোর সময় স্কার্ট ও জাঙিয়া তারে আটকে যায়। অর্থাৎ উপর থেকে দেখলে দেখা যাবে যে সে বেড়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আঁকাবাঁকাভাবে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে তাই এটা স্বাভাবিক যে তার জাঙিয়াও ছিঁড়ে যায়।

শুধু চুল নয়, নখ ও কানের ভেতর পর্যন্ত কাদা মাখা তত্তচানকে দেখতে দেখতে মায়ের মনে হলো (বয়স্ক লোকের কাছে মনে হবে এটা ক্লান্তিকর, তারা মজা পায় না, তবে ছেলেমেয়েদের কাছে এটা অত্যন্ত মজা, ভাবতে হিংসা হয়......) আর প্রধান শিক্ষক যে 'নোংরা করলেও কোনো অসুবিধা

নেই, এমন পোশাক' পরানোর পরামর্শ দিয়েছিলো, এটা এমন একজন অভিজ্ঞ প্রধান লোকের ধারণা, যে ছেলেমেয়েদের আচার-আচরণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে। এমন ভেবে বরাবরের মতো মা এবারও মুগ্ধ হলো।

তাকাহাশি

আজ সকালে যখন স্কুলের মাঠে সবাই দৌড়াদৌড়ি করছিলো, তখন প্রধান শিক্ষক বললো 'তোমাদের নতুন এক বন্ধু এসেছে। তাকাহাশি। ট্রেন কামরার প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। বুঝেছো?'

তত্তচানরা তাকাহাশির দিকে তাকালো।

তাকাহাশি টুপি খুলে মাথা নত করে নিচু গলায় বললো, 'শুভ অপরাহ্ন।'

তত্তচানরাও প্রথম শ্রেণীর আর খুব ছোট। তাকাহাশি ছেলে হলেও খুব বেটে, তার হাত ও পা খাটোখাটো। তার টুপি ধরা হাতটিও ছিলো ছোট, তবে তার কাঁধ ছিলো বলিষ্ঠ। তাকাহাশি একা একা দাঁড়িয়েছিলো। তত্তচান 'তার সাথে কথা বলবো', বলে মিইয়োচান ও সাক্কোচানকে সঙ্গে নিয়ে তাকাহাশির কাছে গেলো।

তত্তচানরা কাছে গেলে তাকাহাশি অমায়িকভাবে হাসলো, তত্তচানরাও হাসলো। তাকাহাশির চোখ বড় বড়—গোলাকার। চোখ দেখে মনে হয় সে কিছু বলতে চায়।

'ট্রেন ক্লাসঘর দেখবে?' তত্তচান এমনভাবে বললো যেন সে তাকাহাশির চেয়ে প্রবীণ।

তাকাহাশি তার টুপি মাথায় রেখে বললো, 'হুঁ'।

তত্তচান তাড়াতাড়ি দেখাতে চায়, তাই প্রচণ্ড বেগে ট্রেনের ভেতরে ঢুকে দরোজায় দাঁড়িয়ে ডাকলো, 'তাড়াতাড়ি এসো!'

তাকাহাশি ব্যস্তভাবে হাঁটলো, তখন সে অনেক দূরে পড়েছিলো। সে দৌড়ানোর চেষ্টা করে টলতে টলতে চলতে চলতে আর বললো, 'দুঃখিত, আমি এখনই আসছি ......'

তত্তচান লক্ষ্য করলো তাকাহাশি ইয়াসুআকিচানের মতো পা টেনে টেনে হাঁটে না, তবে ট্রেনে পেঁছাতে তার অনেক সময় লাগলো। তত্তচান এখন ডাকাডাকি না করে তাকাহাশির দিকে তাকালো। তাকাহাশি প্রাণপণে তত্তচানের দিকে ছুটে আসছিলো। তত্তচানের এখন 'তাড়াতাড়ি।' বলার দরকার ছিলো না, সে ভাল করে জানে যে তাকাহাশি ব্যস্তভাবে দৌড়োচ্ছে। তার পা খুব খাটো, ধনুকের মতো বাঁকা। শিক্ষক ও বয়স্করা জানতো তাকাহাশির উচ্চতা এমনই থাকবে। তাকাহাশি বুঝতে পারলো তত্তচান তার দিকে তাকিয়ে আছে, সে দু'হাত সামনে পেছনে দোলাতে দোলাতে আরো ব্যস্তভাবে হাঁটতে লাগলো আর দরোজার কাছে পেঁছে বললো, 'তুমি বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটো।' এবং আরো বললো, 'আমি ওসাকা থেকে এসেছি।'

তত্তচান খুব জোরে বললো, 'ওসাকা?' কারণ তত্তচানের কাছে ওসাকা স্বপ্নের শহর, যে শহর সে এখনো দেখে নি। মা'র ছোট ভাই তার মামা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সে যখন তত্তচানদের বাসায় আসে, তখন সে কানের দিকে মাথা দুপাশে ধরে তত্তচানকে উঁচুতে তুলে ধরে বলে, 'ওসাকা শহর দেখাবো, ওসাকা দেখতে পাচ্ছো?' বয়স্ক লোকেরা শিশুদের সাথে এ-খেলা খেলতো। এটা ছিলো এক রকম দুষ্টুমি, তবে তত্তচান এটা সত্য মনে করেছিলো, তাই তার মুখের চামড়া উপরে দিকে ফুলে উঠলেও চোখ উপরের দিকে টান টান হলেও, কান ব্যাথায় টন টন করলেও প্রাণপণে সে চঞ্চল চোখে দূরের দিকে তাকাতো। কিন্তু সে কখোনই ওসাকা দেখতে পেতো না। তবে একদিন দেখা যাবে মনে করে যখনই সে মামা আসে তখনই অনুরোধ করে, 'ওসাকা শহর দেখাও, মামা।' তাই তত্তচানের কাছে ওসাকা ছিলো আগে না দেখা স্বপ্নের শহর। এই তাকাহাশিও এসেছে সেই ওসাকা থেকে।

তত্তচান বললো, 'ওসাকার গল্প বলো?'

তাকাহাশি খুশি হয়ে হেসে বললো, 'ওসাকার গল্প...'

তার কণ্ঠস্বর ছিলো স্পষ্ট ও বয়স্ক লোকের মতো। তখন ক্লাস শুরু হওয়ার ঘণ্টা বেজে উঠলো।

'দুঃখিত!' তত্তচান বললো।

স্কুল-ব্যাগের আড়ালে প্রায় হারিয়ে যাওয়া ছোট দেহটি দোলাতে দোলাতে তাকাহাশি উৎফুল্লভাবে সবচেয়ে সামনের সারিতে বসলো। তত্তচান ব্যস্তভাবে বসলো তার পাশে। এ-স্কুল যে ইচ্ছামতো যেখানে সেখানে বসতে পারা যায় তত্তচান তাতে কৃতজ্ঞতা বোধ করলো। কারণ তার মনে হলো তাকাহাশির কাছ থেকে আলাদা হওয়া খুব বেদনাদায়ক। এভাবে তাকাহাশিও তাদের বন্ধু হয়ে গেলো।

ঝাঁপিয়ে পড়ো না!

স্কুল থেকে ফেরার পথে যখন বাসার কাছাকাছি এলো তত্তচান, তখন রাস্তার পাশে একটা আকর্ষণীয় জিনিস আবিষ্কার করলো। সেটা ছিলো একটা বড় বালুর স্তূপ (কী আশ্চর্য এটা সমুদ্র থেকে কত দূরে তবুও ওই বালু স্বপ্নে দেখছি না তো?) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তত্তচান একবার 'ফুট!' শব্দ করে লাফিয়ে উঠে প্রস্তুতি নেয়। তার পর তীব্র বেগে দৌড়ে সে বালুর স্তূপের চূড়োর ওপর 'ফট!!' করে লাফিয়ে পড়ে। সে যে ওটাকে বালুর স্তূপ মনে করছিলো আসলে সেটা বালুর টিবি ছিলো না। ওটা ছিলো দেয়ালে লাগানোর ছাই রঙের প্লাস্টার মাটি। তাই তত্তচান স্কুল-ব্যাগ ও চটি হাতে নিয়ে ওই আঠালো জিনিসের মধ্যে মূর্তির মতো 'ঝুপ!' করে বুক পর্যন্ত ডুবে গেলো। সে যখন বেরুনোর জন্য কসরত করছিলো, তখন তার পায়ের তালু তেলতেলে ও পিচ্ছিল হয়ে জুতো প্রায় খুলে যাচ্ছিলো। সে যদি সাবধান না হতো, তাহলে ওই আঠালো জিনিসের মধ্যে মাথা পর্যন্ত ডুবে যাওয়ার মতো বিপদ ছিলো। তাই তত্তচান তার বাঁ-হাতের চটিসমেত ওই আঠালো জিনিসের মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। মাঝেমাঝে সম্মুখ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিলো অপরিচিত মহিলারা। তত্তচান নিচু গলায় তাদের ডাকলো, 'শুনুন...' তবে তারা সবাই মনে করলো তত্তচান খেলছে, তাই মৃদু হেসে তারা আপন মনে চলে গেলো।

সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার নামতে তার মা খোঁজ করতে এসে অবাক হলো। কারণ বালুর স্তূপ থেকে তত্তচান বের করেছিলো তার মুখমণ্ডল। মা লাঠি খুঁজে এনে তত্তচানের হাতে তার এক প্রান্ত ধরে দিলো আর টেনে তাকে স্তূপ থেকে বের করলো। হাত দিয়ে টানলে মা'র পা-ও ওই আঠালো বস্তুর মধ্যে ঢুকে যেতো। প্রায় সারা শরীর ছাই রঙের দেয়ালের মতো হয়ে যাওয়া তত্তচানকে মা বললো, 'তোমাকে আগে বলেছি, কোনো মজার বস্তু দেখলেই তাতে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ো না। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে শুনে তবে ঝাঁপ দিও।'

আগে মানে একদিন স্কুলে দুপুরের বিরতির সময় তত্তচান মিলনায়-তনের পেছনের সরু রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছিলো, তখন সে দেখলো রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে একটা খবরের কাগজ। কী মজা!—ভেবে তত্তচান 'বা—হ্!!' বলে অন্যান্য দিনের মতো একটু পেছনে সরে ফট্ করে ওপরে লাফিয়ে দিয়ে অতি দ্রুত বেগে ছুটে গিয়ে খবরের কাগজের মাঝখানে লাফিয়ে পড়লো। তবে সেটা ছিলো কিছুদিন আগে মানি-ব্যাগ পড়ে যাওয়া টয়লেটের ময়লার ট্যাঙ্কের মুখ। স্কুলের কাজের লোকটি ট্যাঙ্কের মুখ খুলে কাজ করছিলো, হঠাৎ কোনো কারণে তাকে একটু বাইরে যেতে হয়। দুর্গন্ধ হবে বলে সে কংক্রিটের ঢাকনার জায়গায় খবরের কাগজ দিয়ে ট্যাঙ্কের মুখটি ঢেকে রাখে, তাই তত্তচান 'ঝুপ!' করে টয়লেটের মধ্যে পড়ে গেলো—এতে অনেক ঝামেলা হয়েছিলো। তবে যাই হোক, সৌভাগ্যবশতঃ তত্তচান আগের মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলো। মা তখনকার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো।

তত্তচান দেয়ালের মতো শান্তভাবে বললো, 'আর ঝাঁপিয়ে পড়বো না।'

মা নিশ্চিত হলো। কিন্তু তার পরেই তত্তচান যা বললো, তা শুনে মায়ের মনে হলো এতো তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। কেননা তার পর তত্তচান এমন কথা বললো, 'খবরের কাগজ আর বালুর স্তূপে লাফিয়ে পড়বো না।'...অর্থাৎ মা ভালভাবে বুঝলো অন্য জিনিসের ওপর সে অবশ্যই আবার লাফিয়ে পড়বে।

দিনদিন সন্ধ্যা আরো তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করলো।

'তার পর—'

তোমোএ স্কুলের টিফিনের সময়টা সব সময়ই মজার। তাতে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আরেকটি মজার ব্যাপার।

তখন পর্যন্ত তত্তচান স্কুলের টিফিনের সময় স্কুলের পঞ্চাশজনের মতো ছাত্রছাত্রীর 'সামুদ্রিক জিনিস' ও 'পাহাড়ী জিনিসের' তরকারি প্রধান শিক্ষক দেখতো। তাতে সমুদ্র বা পাহাড় যে-কোনো একটার অভাব দেখলে প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী তার দু'হাতের সমুদ্র ও পাহাড়ের কড়াই থেকে তরকারি পরিবেশন করতো। তারপর 'ভাল করে চিবাও, খাবারের জিনিস......'এ-গান দিয়ে' 'এখন খাওয়া শুরু করছি', বলে খেতে শুরু করতো', তবে এবার থেকে 'এখন খাওয়া শুরু করছি'-র পর যোগ করা হয়েছিলো 'গল্প বলা'।

কিছুদিন আগে প্রধান শিক্ষক বললো, 'আমার মনে হয় তোমরা সবাই যদি আরো ভাল করে গল্প করতে পারো, তাহলে বেশ হয়। এবার থেকে প্রত্যেক দিন টিফিনের সময় যখন সবাই খাবে, তখন যে-কোনো একজন বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গল্প শোনাবে, এটা কেমন লাগে?'

ছেলেমেয়েরা নানাভাবে ভাবলো যেমন (নিজে ভাল করে গল্প শোনাতে পারি না, তবে শুনতে মজা পাই) বা (বা—হ্! সবাইকে গল্প শোনাতে দারুণ ভালো লাগে)। তত্তচান মনে করলো (আমি এখন জানি না কী ধরনের গল্প শোনাবো, তবে শোনানোর চেষ্টা করবো!)

এভাবে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী প্রধান শিক্ষকের কথায় সম্মতি দিলো; তাই পরের দিন থেকে 'গল্প বলা' শুরু হয়েছিলো।

জাপানে সাধারণত বাসায় ছেলেমেয়েদের বলা হয় 'খাওয়ার সময় চুপ করে খাও।' তবে নিজের প্রবাসের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রধান শিক্ষক সব সময় বলতো, 'খাওয়ার সময়টা আনন্দময় হওয়া উচিত, তাই ব্যস্ততার সাথে না খেয়ে সময় নিয়ে টিফিনের সময় গল্প করতে করতে খাবে।' ছেলেমেয়েদের অপরের সামনে নিজের ধারণা সহজে, সুষ্ঠুভাবে, নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পারাটাকে তার কাছে খুব জরুরী মনে হয়েছিলো, এখনই সে তা শুরু করা স্থির করলো। তাই সবাই যখন বললো, 'আমরা রাজি!'

তখন প্রধান শিক্ষক বললো, 'ঠিক আছে, খুব মজার গল্প শোনাবো, এমন কথা কখনো ভাববে না; আর যে গল্প শোনাতে ইচ্ছা হয় তোমরা সেই গল্পই শোনাবে। যাই হোক, এখন গল্প বলে দেখা যাক।' তত্তচান শিক্ষকের কথা মন দিয়ে শুনলো।

কে আগে বলবে কে পরে বলবে তাও স্থির হলো। ঠিক করা হলো, 'ভাল করে চিবাও...' গানটি গাওয়ার পর যে গল্প বলবে শুধু সে একা তাড়াতাড়ি করে টিফিন খেতে পারবে।

তবে এটা ক্লাসের বিরতির সময় তিন চার জনের ছোট দলের মধ্যে গল্প বলা থেকে ভিন্ন। সারা স্কুলের পঞ্চাশজন ছেলেমেয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গল্প শোনানো কঠিন কাজ, এর জন্য দরকার প্রচুর সাহস। প্রথম দিকে কোনো কোনো ছেলেমেয়ে লজ্জা পেয়ে শুধু 'হি হি হি হি' করে

হেসে ওঠে। এমন একটি ছেলে ছিলো যে মনপ্রাণ দিয়ে গল্প শোনাবে ভেবে স্কুলে এসেছিলো, তবে সবার সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথে সে যা বলবে বলে মনে করে এসেছিলো বেমালুম ভুলে যায়। তার গল্পের নাম মনে হয়েছিলো 'ব্যাঙের পাশ থেকে লাফ'। এ-কথাটা বার বার বলার পর অবশেষে সে 'বৃষ্টি যখন হয়......, গল্প শেষ' বলে মাথা নিচু করে নিজের সিটে ফিরে যায়।

এখনও তত্তচানের পালা আসে নি, তবে সে ঠিক করেছিলো যখন তার পালা আসবে তখন সে তার সবচেয়ে প্রিয় 'রাজকুমার ও রাজকুমারী'র গল্পটি শোনাবে,—তত্তচানের 'রাজকুমার ও রাজকুমারী'র গল্প সবার জানা। এমন কি স্কুলের বিরতির সময় যখনই সে শোনাতে চাইতো, তখনই সবাই বলতো, 'আর শুনতে চাই না।' তবে তত্তচান ভাবছিলো সে ওই গল্পই শোনাবে।

এ-ভাবে প্রত্যকদিন পালা করে সবার সামনে দাঁড়িয়ে গল্প বলতে বলতে ধীরে ধীরে তারা গল্প বলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। একদিন একটি ছেলের গল্প বলার পালা এলো। সে কিছুতেই গল্প শোনাবে না বলে গোঁ ধরে বসলো। ছেলেটি বললো, 'বলার কিছু নেই।' তত্তচান খুব বিস্মিত হলো—এমন ছেলেও আছে যার বলার কিছু নেই। তবে সত্যিই ছেলেটির বলার কিছু ছিলো না। প্রধান শিক্ষক ছেলেটির শূন্য টিফিন বাক্স রাখা ডেস্কের সামনে গিয়ে বললো, 'তোমার বলার কিছু নেই......?'

'কিছু নেই!' তার মনে কোনো বিকার নেই, কোনো রকম প্রতিবাদও করছে না, মনে হলো সত্যিই তার বলার কিছু নেই।

প্রধান শিক্ষক ফোকলা দাঁতের কথা ভুলে গিয়ে 'হা, হা, হা, হা' করে হেসে উঠে বললো, 'তাহলে একটা গল্প বানিয়ে বলো।'

ছেলেটি বিস্মিত হয়ে বললো, 'গল্প বানাবো?'

তারপর প্রধান শিক্ষক ছেলেটিকে সকলের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে নিজে ছেলেটির সিটে বসে বললো, 'সকালে ঘুম থেকে উঠে স্কুলে আসা পর্যন্ত কী করেছো তা মনে করে দেখো! প্রথম কী করেছো?'

ছেলেটি মাথার চুলে জোরে জোরে আঙুল দিয়ে আঁচড়াতে আচঁড়াতে প্রথম বললো, 'আচ্ছা—' তখন প্রধান শিক্ষক বললো, 'দেখো, তুমি বলেছো, "আচ্ছা—", তার মানে তোমার বলার কথা আছে "আচ্ছা—র" তুমি কী করেছো?'

তখন ছেলেটি আবার মাথার চুল জোরে জোরে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললো, 'আচ্ছা—, সকালে ঘুম থেকে উঠলাম।' তত্তচান ও সবাই একটু মজা পেয়েছিলো, তারা মন দিয়ে শুনলো।

তারপর ছেলেটি 'তারপর...' বলে আবার মাথা জোরে জোরে আঁচড়াতে লাগলো। শিক্ষক দু'হাত ডেস্কের ওপর তাড়াতাড়িভাবে রেখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছিলো। সে বললো, 'বেশ, বলতে থাকো। সবাই বুঝেছে যে তুমি সকালে ঘুম থেকে উঠেছো। যে মজার কথা, হাস্যকর কথা বলতে পারে সেই যে বড় এমন নয়। তুমি বলেছো বলার কিছু নেই, তবে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে তুমি বলার কথা খুঁজে পেয়েছো।'

তখন ছেলেটি ভীষণ জোরে বললো, 'তার পর...'

সবাই এক সঙ্গে শরীরটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিলো, ছেলেটি গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে বললো, 'তার পর...মা...,বললো দাঁত মাজো, তাই মাজলাম।'

প্রধান শিক্ষক হাততালি দিয়ে উঠলো আর সবাইও হাততালি দিলো। তখন ছেলেটি আগের চেয়ে আরো জোরে বললো, 'তার পর......'

সবাই হাততালি থামিয়ে কান খাড়া করে তাদের দেহটা সামনের দিকে এগিয়ে নিলো। ছেলেটি গর্বভরে বললো, 'তার পর—স্কুলে এলাম!'

শরীরটা বেশি করে সামনের দিকে এগুনো ওপরের শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের একজন সামনের দিকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলো—তার মাথা টিফিন বাক্সে ধাক্কা খেলো। তবে সবাই খুব উল্লসিত হয়ে উঠলো ছেলেটি বলার মতো কথা পেয়েছে!

শিক্ষক জোরে হাততালি দিলো। তত্তচানরাও অনেক হাততালি দিলো। মাঝখানে দাঁড়ানো 'তার পর......' বলা ছেলেটিও এক সঙ্গে হাততালি দিলো। মিলনায়তন হাততালিতে ভরে উঠলো।

এই হাততালির কথা ছেলেটি বড় হয়েও কখনো বিস্মৃত হলো না।

শুধু খেলা করছিলাম

আজ তত্তচান এক ভীষণ দুর্ঘটনায় পড়েছে। স্কুল থেকে ফিরে এসে রাতের খাবারের আগে যখন তত্তচান একটু খেলছিলো, তখন দুর্ঘটনাটা ঘটলো। সেটা শুরু হলো খেলতে খেলতে আর সেটা ঘটলো তত্তচান যখন নিজের ঘরে রকির সাথে 'নেকড়ে বাঘ খেলা' খেলছিলো।

'নেকড়ে বাঘ খেলা'-র আগে একটা খেলা ছিলো। সেটা হচ্ছে তারা দুজন ঘরের দু'দিক থেকে গড়িয়ে আসতো এবং ঘরের মাঝখানে এসে তাদের ধাক্কা লাগতো, সেখানে কিছুটা সুমো কুস্তির মতো কিছুক্ষণ হাতা-হাতি, ঠেলাঠেলি করে হঠাৎ তারা আলাদা হয়ে যেতো। এটা তারা কয়েক বার খেললো, এর মাঝে তত্তচান একা একা স্থির করলো ··· একটু 'কঠিন খেলা করা যাক।'

সে এমন খেলা ঠিক করলো—তারা গড়িয়ে এসে ধাক্কা লাগার পর তারা দুজন নেকড়ে বাঘের ভঙ্গি করবে; যাকে বেশি করে নেকড়ে বাঘের মতো দেখাবে তারই জিত হবে। রকি তো সেপার্ড, তাই নেকড়ে বাঘ হওয়া তার পক্ষে তেমন কঠিন কাজ ছিলো না। সে কান সোজা খাড়া করে মুখ হা করে খুললে ভেতর পর্যন্ত অনেক দাঁত দেখা যেতো। তার চোখও ছিলো খুব ভয়ঙ্কর। তবে তত্তচানের পক্ষে নেকড়ে বাঘ হওয়া একটু কঠিন ছিলো, সে তার দু হাত কানের ওপর দাঁড় করিয়ে মুখ যথাসম্ভব বড় করে খুলে চোখও প্রাণপণ বড় করে 'উঁ, উঁ' করে গোঙিয়ে রকিকে কামড় দেয়ার ভান করলো। রকিও প্রথমে নিপুণভাবে ভান করলো। তবে এমনভাবে নেকড়ে বাঘের ভান করতে করতে রকি সত্য ও খেলার পার্থক্য বুঝতে না পেরে হঠাৎ সত্যি সত্যি কামড় দিয়ে বসলো। কুকুর ছানা হলেও রকির দেহটা ছিলো তত্তচানের দিগুণ আর তার দাঁতও ছিলো তীক্ষ্ণ। তাই তত্তচান যখন 'আহ্', বলে ব্যাপারটা বুঝলো, তখন ডান কান ঝুলছিলো আর প্রচুর রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছিলো তত্তচানের। 'আ—আ!!' চিৎকার শুনে মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো তখন। তত্তচান ডান কান দু'হাতে চেপে ধরে রকির সাথে ঘরের কোণার দিকে ছিলো। তার পোশাক ও চার পাশ রক্তে ভরে গেছে। বৈঠকখানায় বাবা বেহালা

অনুশীলন করছিলো। সেও ছুটে এলো। রকি এখন বুঝে গেছে সে ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে ফেলেছে। সে লেজ নামিয়ে চোখের পাতা স্থির করে শুধু চোখ তুলে তত্তচানের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

তখন তত্তচানের মাথার মধ্যে শুধু একটা কথাই ঘুরপাক করছিলো। তা হচ্ছে বাবা-মা যদি ভীষণ রেগে রকিকে বের করে দেয় বা অন্য বাসায় দিয়ে দেয়, তাহলে কী হবে? তত্তচানের জন্য তা ছিলো সবচেয়ে বড়ো ভয় ও বেদনার কথা। তাই তত্তচান রকির গা'য় গা'য় লেগে থেকে উবু হয়ে ডান কান চেপে ধরে জোরে জোরে বার বার বললো, 'রকিকে বকো না। রকিকে বকো না।'

বাবা-মা বকার চেয়ে তত্তচানের কানে কী হলো, তা দেখার জন্য কান থেকে তত্তচানের হাত সরিয়ে নিতে চাইলো।

তত্তচান হাত না সরিয়ে চিৎকার করে বললো, 'ব্যথা করে না। রকির ওপর রাগ করো না। রাগ করো না।'

তখন সত্যিই তত্তচান ব্যথা বোধ করে নি। সে শুধু রকির জন্য উদ্বিগ্ন ছিলো।

তখনও রক্ত ঝরা বন্ধ হয় নি, রক্ত পড়ছিলো। বাবা-মা অবশেষে বুঝলো রকি কামড় দিয়েছে। তারা তত্তচানকে কথা দিলো রকির ওপর রাগ করবে না। তাই সে তার হাত কান থেকে সরালো। কান ঝুলে আছে দেখে মা চিৎকার করে উঠলো আর মায়ের পিছে পিছে বাবা তত্তচানকে কোলে নিয়ে কানের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলো। সময় মতো চিকিৎসা করা হলো এবং ভাগ্য ভাল ছিলো বলে ডাক্তার তার কান আগের মতো ভাল করতে পারলো। বাবা-মা চিন্তামুক্ত হলো। তবে বাবা-মা রকির ওপর 'রাগ করবে না' এমন কথা দিলেও তারা তা পালন করবে কি না, সে কথা ভেবে ভেবে তত্তচান উদ্বিগ্ন ছিলো।

মাথা থেকে কানের ওপর দিয়ে থুৎনি পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শাদা খরগোশের মতো হয়ে তত্তচান বাসায় ফিরে এলো। রাগ করবে না বলে কথা দিলেও বাবার মনে হচ্ছিলো অত্যন্ত একবার রকিকে না বকলে সে স্বস্তি পাবে না। তবে চোখের ইশারায় মা জানিয়ে দিলো 'আমরা কথা দিয়েছি।' বাবা নিজেকে সংবরণ করলো।

'এখন কোনো চিন্তা নেই! কেউ রাগ করবে না' এ-কথা তাড়াতাড়ি রকিকে জানানোর জন্য ব্যস্ততার সাথে তত্তচান বাসায় ঢুকলো। রকিকে কিন্তু কোথাও দেখা গেলো না। তখন প্রথম বারের মতো তত্তচান কাঁদলো। ডাক্তারের কাছে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে নিজেকে সংবরণ করেছে, একটুও কাঁদে নি। তার মনে হয়েছিলো সে যত কাঁদবে রকি তত বকা খাবে। তবে এখন তার চোখের জল থামলো না। কাঁদতে কাঁদতে নাম ধরে ডাকলো, 'রকি! রকি! তুমি কোথায়?'

কয়েক বার ডাকার পর অশ্রুসজল তত্তচানের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। তখন তার পরিচিত বাদামী রঙের পিঠটা সোফার পেছন দিকে একটু একটু করে তার চোখে পড়লো। রকি তত্তচানের কাছে গিয়ে তার যে কানটিতে কামড় লাগে নি আর ব্যাণ্ডেজের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো সেটি আলতোভাবে চাটলো। তত্তচান দু'হাতে রকির গলা জড়িয়ে ধরে তার কানের ভেতরটা শুঁকলো। বাবা-মা বলে কানের ভেতর দুর্গন্ধ, —ওটা তত্তচানের কাছে ছিলো অতি পরিচিত সুগন্ধ।

ক্লান্তিতে রকি এবং তত্তচানের ঘুম এলো।

মনে হয় গ্রীষ্মের শেষের চাঁদ অধিকতর বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা ব্যাণ্ডেজ-পরা এ-মেয়েটি এবং যে আর 'নেকড়ে বাঘ খেলা' খেলবে না বলা সেই কুকুরটিকে বাগানের একটু ওপর থেকে দেখছিলো।

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

তোমোএ স্কুলের ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রতি বছর নভেম্বরের তিন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান শিক্ষক নানা জায়গায় খোঁজ খবর নিয়ে জানলো নভেম্বরের তিন তারিখ শরৎকাল আর এ-দিনে সবচেয়ে কম বৃষ্টি হয়। ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য এ-দিনটি ঠিক করলো।

আগের দিন থেকে ছেলেমেয়েরা স্কুলের খেলার মাঠকে নানাভাবে সাজিয়ে ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য উৎসাহের সাথে অপেক্ষায় রইলো। প্রধান শিক্ষক যথাসম্ভব প্রার্থনা করেছিলো যাতে বৃষ্টি না হয়। আবহাওয়া সম্পর্কে

তার সকল খবর সংগ্রহের জন্যই হোক বা তার প্রার্থনায় বা আকাশের মেঘ ও সূর্য তার ইচ্ছেই হোক, সত্যিই অলৌকিকভাবে এ-দিনে বৃষ্টি হলো না।

নানা দিক দিয়ে তোমোএ স্কুল অন্যান্য সাধারণ স্কুল থেকে একটু ভিন্ন ছিলো। বিশেষ করে খেলাধুলার দিন ছিলো অনন্য সাধারণ। অন্যান্য প্রাইমারি স্কুলের সাথে শুধু মিল ছিলো দড়ি টানাটানি ও তিন পা বাঁধা দৌড় খেলার মতো খেলায়। বাকি সবখেলা উদ্ভাবন করেছিলো প্রধান শিক্ষক। তাতে বিশেষ ধরনের কেনো সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হতো না বা সেগুলো বিশাল আকারের কোনো খেলাও ছিলো না। স্কুলে পাওয়া যায় এমন পরিচিত জিনিসপত্র ওই খেলায় ব্যবহার করা হলো।

যেমন 'রুই মাছ দৌড় প্রতিযোগিতা'—এ-খেলায় 'প্রস্তুত, যাও!' সঙ্কেতের সাথে সাথে দৌড় শুরু হওয়ার জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা দৌড়ে স্কুল মাঠের মাঝখানে যায়। সেখানে রাখা আছে, বলা যায় সেখানে শুয়ে আছে কাপড়ে তৈরি বড় বড় রুই মাছ। তারা রুই মাছের মুখ দিয়ে ঢুকে লেজ দিয়ে বেরিয়ে আবার দৌড় শুরু হওয়ার জায়গায় ফিরে আসে। রুই মাছ তিনটির মধ্যে ছিলো দুটি নীল আর একটি লাল রঙের। তাই 'প্রস্তুত, যাও!' সঙ্কেতের সাথে সাথে তিনটি ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে দৌড় দিলো। এ-দৌড় দেখে মনে হয় সহজ, আসলে বেশ কঠিন, কারণ রুই মাছের কাপড়ের ভেতর নিকষ অন্ধকার আর তার দেহটাও লম্বা। তাই কিছুক্ষণ ধরে তার ভেতরে কিলবিল করে চলতে চলতে তারা কোন দিক থেকে ঢুকেছে সে-বোধও হারিয়ে ফেলে। তত্তচানের মতো কোনো কোনো ছেলে-মেয়ে কয়েকবার মাছের মুখ দিয়ে তার মুখ বের করে বাইরে তাকায় এবং আবার ব্যস্তভাবে ভেতরে ঢুকে যায়। যে ছেলেমেয়েরা খেলা দেখছে, তাদের কাছে ছিলো খুব মজার ব্যাপার। কারণ মাছের ভেতরের ছেলেমেয়েরা আগে পিছে কিলকিল করে চলে, তাই এমন দেখাচ্ছিলো যেন রুই মাছগুলো জীবন্ত।

'মাকে খোঁজা' নামের আরও একটা মজার ইভেন্ট ছিলো। এই খেলায় ছেলেমেয়েরা 'প্রস্তুত, যাও।' সঙ্কেতের সাথে সাথে দৌড়ে মাঠের মাঝে কাত করে শুইয়ে রাখা একটি কাঠের মইয়ের কাছে আসে এবং হামাগুড়ি দিয়ে মইয়ের বিভিন্ন ধাপের মাঝখানের ফাঁকের ভেতর দিয়ে পার হয়ে

যায়। তখন তারা মইয়ের অপর পাশে রাখা ঝুলি থেকে এক একটি খাম তুলে খুলে দেখে। উদাহরণ স্বরূপ কারো কাগজে 'সাঙ্কোচানের মা' কথাটি লেখা থাকে, তাহলে তাকে দর্শকের মাঝে গিয়ে সঙ্কোচানের মা'কে খুঁজে বের করে হাত ধরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে হয়। মইয়ের চার কোণা ফাঁকের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হয়, তাই যদি কেউ বিড়ালের মতো দক্ষতার সাথে পার হতে না পারে, তবে তার নিতম্ব আটকে যায়। তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা 'সাঙ্কোচানের মা'কে চেনে, কিন্তু কাগজে যদি লেখা থাকে 'শিক্ষক ওকু-র বড়ো বোন', 'শিক্ষক ৎসুএ-র মা' বা 'শিক্ষক কুনিনোরির ছেলে', তাহলে তারা মুশকিলে পড়ে। কারণ তারা তো তাদের কখনো দেখে নি। তাই দর্শকের সামনে গিয়ে 'শিক্ষক ওকু-র বড়ো বোন!' বলে জোরে, চিৎকার করতে হয়। আর এতে একটু সাহসও লাগে। ভাগ্যজোরে কেউ যদি নিজের মায়ের নাম লেখা কাগজ পায়, তাহলে খুব খুশি হয়ে, "মা! মা! শিগ্‌গির চলো!!" বলে লাফিয়ে লাফিয়ে চিৎকার করে। এ-খেলায় ছেলেমেয়ে এবং দর্শক উভয়েরই সতর্ক থাকতে হয়। ছেলেমেয়েরা একের পর এক দৌড়ে এসে কারো মাকে ডাকে, তাই যাকে ডাকা হয়, তাকে অলসভাবে বসে না থেকে বেঞ্চ বা মাদুর থেকে তখনই উঠে দাঁড়িয়ে সেখানে বসা অন্যান্য মা-বাবার মধ্য দিয়ে 'একটু যেতে দিন', বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কোনো একটি ছেলে বা মেয়ের হাত ধরে দৌড়োতে হয়। তাই যখন ছেলেমেয়েরা দৌড়ে এসে বয়স্কদের সামনে থামে, তখন মা-বাবারাও এক সঙ্গে নিশ্বাস ডাকছে। তখন বয়স্কদেরও গল্প করার বা কোনো কিছু খাওয়ার সময় ছিলো না। তাই তারা সব সময় অনুভব করতো যে, তারাও যেন ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোয় অংশ নিচ্ছে।

'দড়ি-টানাটানি' খেলায় প্রধান শিক্ষক ছাড়া অন্য সব শিক্ষক দু'দলে ভাগ হয়ে ছেলেমেয়েদের সাথে 'হেইয়া! হেইয়া!!' বলে দড়ি টানলো। দড়ির মাঝখানে রুমাল বাঁধা ছিলো। ইয়াসুআকিচানের মতো প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ে যারা দড়ি টানতে পারে না, তারা সব সময় ওই রুমালের দিকে তাকিয়ে থেকে কোন দলের জিত হলো তা বললো।

সব শেষে 'রিলে রেস', তাতে সব শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা অংশ নেয়। তোমোএ স্কুলে এই ইভেন্ট অন্য ধরনের ছিলো। রিলে হলেও তাদের দৌড়ানোর পথ বেশি দীর্ঘ ছিলো না। তাদের দৌড়ানোর পথটি ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী। স্কুলের মাঝখানে অবস্থিত অর্থাৎ গেটের দিকে মুখ করে মিলনায়তনে ওঠার জন্য হাত-পাখার ধরনে ছড়ানো কংক্রিটের যে সিঁড়িটি রয়েছে, এই খেলায় সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠানামা করতে হয়। প্রথমে দেখলে মনে হয় এ-সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা বেশ সহজ, তবে এ-সিঁড়ির ধাপ-গুলো অন্যান্য সিঁড়ির ধাপের চেয়ে বেশি নিচু, তা ছাড়া এ-রিলে রেসে কয়েক ধাপ একেবারে লাফ দিয়ে ওঠা বা নামা ছিলো নিষিদ্ধ। সযত্নে এক ধাপ করে উঠতে ও নামতে হয়, তাই লম্বা পায়ের দীর্ঘ ছেলেমেয়েদের জন্য এটা বড়ো কঠিন কাজ ছিলো। যে-সিঁড়ি দিয়ে তারা রোজরোজ টিফিনের সময় ছোটাছুটি করে ওঠে, আজ সে-সিঁড়ি যখন 'খেলাধুলোর জন্য' ব্যবহৃত হয়, তখন সেটিকে অন্য জিনিস বলে মনে হয়। তারা মজা পেয়ে নতুন অনুভূতি নিয়ে চিল্লাচিল্লি করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করলো। দূর থেকে সেটা সুন্দর ক্যালাইডস্কোপের মতো মনে হলো। সবচেয়ে ওপরের ধাপটি ধরলে সিঁড়িটিতে মোট ধাপ ছিলো আটটি।

এটা ছিলো তত্তচানদের মতো প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রথম ক্রীড়ানুষ্ঠান। আর ওই দিনটি প্রধান শিক্ষক যেমন আশা করেছিলো তেমনি চমৎকার ছিলো—আকাশও পরিষ্কার ছিলো। আগের দিন থেকে ছেলেমেয়েরা রঙিন কাগজ ভাঁজ করে বানানো রংবেরঙের শিকল এবং সোনালী তারা ইত্যাদি ঝুলিয়ে দিয়ে চারদিক সাজিয়ে ছিলো—তাই উৎসবের মতো মনে হচ্ছিলো। আর গ্রামোফোন রেকর্ডে মার্চের সংগীত বাজিয়ে তাদের মনকে আনন্দে ভরপুর করে রেখেছিলো।

তত্তচান পরেছিলো শাদা জামা ও গাঢ় নীল হাফ প্যান্ট। তবে সে পরতে চেয়েছিলো অনেক ভাঁজ করা ব্লুমা। তত্তচানের বাসনা ছিলো ব্লুমা পরার। কেননা কিছু দিন আগে তত্তচানদের ক্লাস শেষ হওয়ার পর প্রধান শিক্ষক যখন স্কুলের মাঠে কিণ্ডার গার্টেনের শিক্ষিকাদের ইউরিদ্‌মিক্স শেখাচ্ছিলো, তখন কয়েকজন মহিলা ব্লুমা পরে ছিলো আর তত্তচান তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। ব্লুমা কেন তত্তচানের ভাল লেগেছিলো, তার কারণ বলছি। যখন ব্লুমা পরা মহিলারা হালকাভাবে মাটিতে পা রাখছিলো, তখন ব্লুমা-র নিচে তাদের উরু 'তরঙ্গায়িত' হয়ে উঠছিলো।

তাতে সে মুগ্ধ হয়েছিলো। তাই তত্তচান দৌড়ে বাসায় ফিরে এলো আর নিজের হাফ প্যান্ট টেনেটুনে বের করে পরিধান করলো এবং আলতো-ভাবে মেঝেতে পা রাখলো। তবে এখনও সে প্রাইমারি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর মেয়ে। তাই তার সরু উরু তরঙ্গায়িত হলো না। বার বার এমনভাবে মেঝেতে পা রাখার পর তত্তচান বুঝতে পারলো ওই আপারা যা পরেছিলো তা না পরলে "তরঙ্গায়িত" হবে না।

মা'কে সে-মহিলাদের প্যান্ট পরার কথা বললো। বোঝা গেলো তা "ব্লুমা"। তাই তত্তচান ক্রীড়ানুষ্ঠানের দিনে অবশ্যই "ব্লুমা" পরবে বলে মা'কে অনুরোধ করলো। তবে দুঃখের কথা হচ্ছে ছোট ব্লুমা পাওয়া যায় নি, তাই সে আজ পরেছে "তরঙ্গায়িত" না-হওয়া হাফ প্যান্ট।

খেলাধুলা শুরু হওয়ার পর বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। (অধিকাংশ খেলায় স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী এক সঙ্গে অংশ নেয়) স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যার হাত-পা সবচেয়ে খাটো ও যে-বেটে সে-তাকাহাশি প্রত্যেক দৌড়ে প্রথম হয়। সত্যিই সেটা ছিলো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যখন অন্যরা রুই মাছের ভেতরে কিলবিল করছিলো তখন তাকাহাশি শাই শাই করে পার হয়ে গিয়েছিলো আর যখন অন্যরা মইয়ের মধ্য তাদের মাথা ঢুকাচ্ছিলো, তখন হামাগুড়ি দিয়ে মই পেরিয়ে তাকাহাশি দ্রুতবেগে দৌড়ে কয়েক মিটার আগে চলে গিয়েছিলো। আর মিলনায়তনের সিঁড়িতে রিলে রেসের সময় অন্যরা যখন বিশ্রীভাবে এক একটা ধাপ উঠছিলো, তখন তাকাহাশি খাটো পায়ে পিস্টনের মতো দ্রুত এক ঠেলায় উঠে নেমে এলো দ্রুত চলমান চলচ্চিত্রের মতো। শেষে সবাই 'তাকাহাশিকে হারাবো!!' বলে প্রাণপণ দৌড়ালো, তবে সব খেলাতেই তাকাহাশি প্রথম হলো। তত্তচান খুব মনপ্রাণ দিয়ে খেললো, কিন্তু একটা খেলাতেও তাকাহাশিকে পরাজিত করতে পারলো না। স্বাভাবিক দৌড়ানোর পথে তত্তচান জিতে, তবে সে-পথের পরের অংশে নানা কারণে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। তাকাহাশি গর্বের সাথে নাক ফুলিয়ে সারা শরীর দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে করতে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করলো। প্রত্যেক খেলায় সে প্রথম পুরস্কার পেলো। তাই সে অনেক অনেক পুরস্কার পেলো। সবাই ঈর্ষার সাথে তা দেখলো। সবাই মনে মনে ভাবলো, 'আগামী বছর তাকাহাশিকে হারাবে।' (তবে প্রত্যেক বছরই ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রধান ক্রীড়াবিদ হয়ে যায় তাকাহাশি... ...)

এ-ক্রীড়ানুষ্ঠানের উপহার বা পুরস্কারও ছিলো প্রধান শিক্ষকের বিশিষ্ট-ধর্মী। প্রথম পুরস্কার হচ্ছে একখানা মূলো, দ্বিতীয় পুরস্কার দু'খানা বার্ডোকের শিকড়, তৃতীয় পুরস্কার একগুচ্ছ পালঙ শাক, এ-ধরনের কিছু বস্তু। তাই এমনকি অনেক বড় হয়েও তত্তচান মনে করতো ক্রীড়ানুষ্ঠানের পুরস্কার হিসেবে সব স্কুলেই শাকসব্জি দেয়া হয়। সেকালে অন্যান্য স্কুলে সাধারণত খাতা, পেন্সিল ও রবার ইত্যাদি দেয়া হতো। তবে অন্য স্কুলের কথা তারা না জানলেও পুরস্কার হিসেবে শাকসব্জি পাওয়া তাদের পছন্দছিলো না। তত্তচান বার্ডোক ও পেঁয়াজ পাতা পেলো। সেগুলো নিয়ে ট্রেনে চড়তে কেন যেন লজ্জা করতে লাগলো। যারা তৃতীয় স্থানের চেয়েও নিচের স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যেও নানা রকমের পুরস্কার হিসেবে শাকসব্জি বিতরণ করা হলো। তাই ক্রীড়ানুষ্ঠান যখন শেষ হলো, তখন তোমোএ স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীর হাতে ছিলো শাকসব্জি। তারা ঠিক বুঝতে পারলো না কেন শাকসব্জি নিয়ে স্কুল থেকে ফিরতে তাদের লজ্জা লাগছিলো। তবে কেউ কেউ যখন এটাকে 'একটু অদ্ভুত' বলছিলো, তখন কোনো কোনো ছেলেমেয়ের ভাল লাগছিলো না। মায়ের কথায় বাজারের থলি হাতে শাকসব্জির দোকানে যেতে তো তাদের লজ্জা করে না।

একটা মোটাসোটা ছেলে পেয়েছিলো বাঁধা কপি। সে বেশ কষ্টেসিষ্টে একবার একভাবে, আবার অন্যভাবে ধরে দেখলো কীভাবে কপিটা ধরে রাখা সুবিধাজনক, তবে শেষে বললো, 'ভাল লাগে না। এমন জিনিস বাসায় নিয়ে যেতে লজ্জা লাগে। ফেলে দেবো নাকি—'

সবাই অসন্তোষে বিড় বিড় করছিলো, মনে হয় প্রধান শিক্ষক তা শুনতে পেলো। সে গাজর, মূলো হাতে ঝুলিয়ে ধরা সবার কাছে গিয়ে বললো, 'কী হলো? তোমাদের ভাল লাগছে না বুঝি? আজ রাতে তোমাদের মায়েদের এগুলো রাঁধতে বলো। এগুলো তোমাদের নিজেদের পাওয়া শাকসব্জি। এগুলো দিয়ে বাসার সকলের জন্য তরকারি রান্না করা যেতে পারে। কী চমৎকার! খেতেও খুব সুস্বাদু লাগবে।'

তার কথাই আসলে ঠিক। তত্তচানও জীবনে এই প্রথম নিজে আয় করেছে--রাতে সকলে খেতে পারে এমন তরকারি। তাই তত্তচান প্রধান শিক্ষককে বললো, 'মাকে আমি আমার বার্ডোক ভাজতে বলবো। তবে পেঁয়াজ পাতা দিয়ে মা কী বাঁধবে আমি জানি না......'

তখন অন্যরাও সবাই যে যে খাবার বানানোর কথা ভেবেছে তা শিক্ষককে বললো। শিক্ষক খুশি হয়ে হাসতে হাসতে মুখ লাল করে বললো, 'তাই! তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো ?'

প্রধান শিক্ষক হয়তো ভেবেছিলো ছেলেমেয়েরা ও তাদের পরিবারের লোকেরা রাতের খাওয়ার সময় এ-শাকসব্জি খেতে খেতে আজকের ক্রীড়া-নুষ্ঠানের গল্প করবে। বিশেষ করে সে তাকাহাশির কথা ভেবেছিলো যার খাবার টেবিল ভরা ছিলো তার নিজের পাওয়া প্রথম পুরস্কারের শাকসব্জিতে। প্রধান শিক্ষক আশা করছিলো প্রথম পুরস্কার পাওয়ায় তাকাহাশি আনন্দ ও গর্ব বোধ করবে এবং সে ভেবেছিলো সে খাটো ও তার উচ্চতা বাড়বে না এমন শারীরিক হীনতা বোধের আগে তার মনে পড়বে প্রথম স্থান অধিকার করার গর্ব। তাই হয়তো, সম্ভবত প্রধান শিক্ষকের উদ্ভাসিত তোমোএ স্কুলের সবগুলো খেলাই এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিলো যাতে সবগুলোতেই তাকাহাশি প্রথম পুরস্কার পায়......।

কোবাইয়াশি ইস্সা

ছাত্রছাত্রীরা প্রধান শিক্ষকের নাম দিয়েছিলো 'কোবাইয়াশি ইস্সা!' আর মাঝেমাঝে আদর করে বলতো,

কোবাইয়াশি ইস্সা!
ইস্সা বুড়োর
মাথা টেকো!

প্রধান শিক্ষকের আসল নাম 'কোবাইয়াশি সোসাকু' আর প্রধান শিক্ষক প্রায়ই হাইকু নিয়ে কথা বলতো। সব সময় বলতো কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

কবি হচ্ছে 'কোবাইয়াশি ইস্সা'। তাই ছাত্রছাত্রীরা এদুটি কারণেই তাকে এ-নামে ডাকতো। শুধু প্রধান শিক্ষককে নয়, ইস্সাকেও তারা বন্ধুর মতো মনে করতো। ইস্সার কবিতা সহজ সরল আর সেগুলো দৈনন্দিন বিষয় নিয়ে লেখা। তাই শিক্ষক এই কবিতা পছন্দ করতো।

সেকালের অসংখ্য কবিদের মধ্যে ইস্সা সৃষ্টি করেছিলো তার নিজস্ব জগত যা কেউ অনুকরণ করতে পারে নি। সে শিশুসুলভ সরল কবিতা রচনা করতে পারতো, তাই প্রধান শিক্ষক তাকে শ্রদ্ধা করতো এবং হিংসাও করতো। সময় পেলেই সে ছেলেমেয়েদের ইস্সার কবিতা পড়াতো আর ছেলেমেয়েরাও তা মুখস্থ করতো।

কৃশ ব্যাঙ
পরাজিত হোয়ো না
এখানে তোমার পাশে ইস্সা আছে

চড়ুই ছানা
সরো সরো
ঘোড়া যাচ্ছে

মাছিকে মেরো না
সে হাত ছুঁড়ছে
তার পা ছুঁড়ছে—

এ-সব হাইকু মুখস্থ করতো আর

এসো আমার সঙ্গে
খেলা করো
পিতৃমাতৃহীন চড়ুই

কবিতাটি ছেলেমেয়েরা কোবাইয়াশি শিক্ষকের তাৎক্ষণিকভাবে রচিত সুরে কোনো কোনো সময় গাইতো। পাঠক্রমে এ-সব কবিতা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ছিলো না, তবে প্রধান শিক্ষকের হাইকু কবিতার ক্লাস প্রায়ই হতো।

তত্তচানের প্রথম রচিত হাইকু হচ্ছে ;

নেড়া কালো কুকুর
সেনাবাহিনী ছেড়ে
মহাদেশে যায়

প্রধান শিক্ষক বললো, '...... যে-কথা তোমরা ভাবো তা সৎভাবে প্রকাশ করে হাইকু রচনা করে দেখো', তবে তত্তচানের এ-কবিতাকে হাইকু বলা যায় না। তবে...... "তখন কোন বিষয়ে তত্তচানের আকর্ষণ ছিলো" এটা থেকে তা ভালভাবে বোঝা যায়। গুণে দেখলে তত্তচানের হাইকু ৫.৭.৫ দল না হয়ে ৫.৭.৭ হয়েছে, তবে ইস্সার

চড়ুই ছানা
সরো সরো
ঘোড়া যাচ্ছে

হাইকুটি ৫.৮.৭ দলে রচিত, তাই তত্তচান মনে করলো তার হাইকু ঠিক আছে।

তারা যখন কুহোন্‌বুৎসুতে হাঁটাহাঁটি করতে যেতো এবং বৃষ্টি হওয়ার ফলে যখন বাইরে খেলতে না পেরে মিলনায়তনে জড়ো হতো তখন তোমোএ স্কুলের কোবাইয়াশি ইস্সা ছেলেমেয়েদের হাইকু'র কথা বলতো এবং হাইকু'তে মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে-কথা আছে তা বলতো। আর ইস্সার হাইকু গুলো খুব খাপ খেতো তোমোএ স্কুলের সাথে।

তুষার গললো
আর সারা গ্রাম
ছেলেমেয়েতে ভরে গেলো---(ইস্সা)

বড়োই অদ্ভুত !

জীবনে প্রথম তত্তচান রাস্তায় কিছু টাকা কুড়িয়ে পেলো। ওটা পেলো স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার ট্রেনে। সে জিইয়ুগাওকা স্টেশনে ওইমাচি লাইরেন

ট্রেনে উঠলো। ট্রেনটা পরের স্টেশন মিদোরিগাওকা স্টেশনে পৌঁছোনোর আগে ভীষণ বাঁক নেয় এবং সব সময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে কাত হয়ে চলে। তাই গতকালও তত্তচান তার পা দুটি ফাঁক করে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো যাতে সে পড়ে না যায়। তত্তচান নির্দিষ্ট জায়গায়—সব সময় চলন্ত ট্রেনের সবচেয়ে পেছনের কামরার ডান দিকের দরোজার পাশে দাঁড়াতো। কারণ তার স্টেশনে ডান দিকে দরোজা খুলে যায় আর খোলার সাথে সাথে সে নামতে পারে। এ দরোজা ছিলো স্টেশনের বাইরে যাওয়ার সিঁড়ির সবচেয়ে কাছে।

গতকালের কথা। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে যখন ট্রেন বাঁক নিলো, তখন তত্তচান দেখতে পেলো তার পায়ের কাছে টাকার মতো কী যেন পড়ে আছে। কবে অনেক আগে একবার টাকা মনে করে তত্তচান একটা জিনিস তুলে নিয়েছিলো, কিন্তু সেটি ছিলো বোতাম। তাই ট্রেনটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দের পর যখন সোজা হয়ে চলতে লাগলো তখন সে তার কাছে মুখ বাড়িয়ে ভালোভাবে দেখলো। সেটা সত্যিই টাকা ছিলো—ছিলো পাঁচ-সেনের একটা সিকি। তত্তচান ভাবলো তার পাশের কারো পকেট থেকে পড়েছে, ট্রেনটি যখন কাত হয়ে চলছিলো সিকিটি নিশ্চয় তখনই গড়িয়ে তত্তচানের কাছে এসেছে। তখন সেখানে আর কেউ দাঁড়ানো ছিলো না। (কী করবো ?......)

তত্তচানের মনে পড়লো কেউ বলেছিলো রাস্তায় টাকা পেলে পুলিশ বাক্সে জমা দিতে হয়।

(তবে ট্রেনের মধ্যে পুলিশ বাক্স নেই) তখন ট্রেনের সবচেয়ে পেছনে কণ্ডাক্টরের ঘর থেকে দরোজা খুলে কণ্ডাক্টর তত্তচানের কামরায় প্রবেশ করলো। তত্তচান নিজেও ঠিক বুঝতে পারলো না তার মাথায় কী ধরনের ভাবনা ঘুরপাক করছিলো। সে ওই পাঁচ-সেনের সিকির ওপর তার ডান পা রাখলো। পরিচিত কণ্ডাক্টর তত্তচানকে দেখে মৃদু হাসলো, তবে তার ডান পায়ের নিচের কথা ভেবে খোলামেলা ভাবে হাসতে পারলো না। তবুও একটু হাসলো। ট্রেনটা তখন তত্তচান যে স্টেশনে নামে তার আগের স্টেশনে ওওকাইয়ামাতে পৌঁছলো আর তার বিপরীত দিকের দরোজা খুলে গেলো। তবে কী কারণে যেন অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক লোকজন উঠলো এবং তত্তচানকে ধাক্কা দিলো। ডান পা সরানোর ইচ্ছে

তার ছিলো না। সে প্রাণপণে আত্মরক্ষা করলো। আত্মরক্ষা করতে করতে ভাবলো। (ট্রেন থেকে নামার সময় এ-টাকা তুলে নেবো আর পুলিশ বাক্সে জমা দেবো।)

তখন তার অন্য কথা মনে পড়লো। (পায়ের নিচ থেকে টাকা তুলে নেয়ার সময় যদি কেউ দেখে ফেলে, তাহলে হয়তো তাকে চোর মনে করবে!)

সে-সময় পাঁচ-সেন দিয়ে ক্যারামেলের একটা ছোট বাক্স বা একটা চক্লেট বার কেনা যেতো। তাই বয়স্ক লোকের জন্য এটা বেশি কিছু অংক ছিলো না। তবে তত্তচানের কাছে এটা ছিলো অনেক টাকা। তাই তত্তচান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। (পেয়েছি। 'আঃ! আমার টাকা পড়ে গেছে, তাই তোলা দরকার' এ-কথা নিচু স্বরে বলে তুলে নিলে অন্যরা অবশ্যই মনে করবে এ-টাকা আমার!)

আর তৎক্ষণাৎ তার মাথায় এলো অন্য দুশ্চিন্তা। (অমন কথা বললে সবাই আমার দিকে তাকাবে কেউ হয়তো বলবে, 'ওটা আমার' তাহলে আমি ভয় পাবো ......)

অনেক ভাবনাচিন্তা করার পর তার মনে হলো ট্রেনটা যখন তার স্টেশনের কাছে পৌছবে, তখন নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধার ভান করে গোপনে টাকা তুলে নেবে। শেষে সে তাই করলো।

ঘামে জবজব হয়ে যখন তত্তচান পাঁচ-সেন সিকিটি হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামলো, তখন সে অনুভব করলো যে সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখান থেকে পুলিশ বাক্স অনেক দূর। তার মনে হলো সেখানে জমা দিতে হলে দেরি হবে আর মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে, তাই স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে নামতে নামতে অনেক ভেবে কী করবে তা স্থির করলো। (আজ গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখবো, আর কাল স্কুলে যাওয়ার সময় নিয়ে যাবো এবং ক্লাসের সকলের কাছ থেকে পরামর্শ নেবো। তাছাড়া তারা কেউ এখনও রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায় নি, তাই 'এটা রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া টাকা', বলে তাদের দেখাবো।)

তারপর তত্তচান কোথায় টাকা লুকিয়ে রাখবে সে কথা ভাবলো। বাসায় নিয়ে গেলে মা হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'এটা কোথায় পেলে।' তাই বাসায় নয় অন্য কোথাও।

তত্তচান স্টেশনের পাশের বনের ভেতরে ঢুকে দেখলো। ওই জায়গাটা কেউ দেখতে পায় না আর মনে হয় সেখানে কারো ঢোকার সম্ভাবনা নেই। জায়গাটাকে বেশ নিরাপদ মনে হলো। তত্তচান একটা ছোট লাঠি দিয়ে গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে পাঁচ-সেনের সিকিটি রাখলো এবং সেটি অনেক মাটি দিয়ে ঢেকে দিলো। চিহ্ন হিসেবে অদ্ভুত আকারের পাথর খুঁজে এনে তার ওপর রাখলো। তারপর তত্তচান ঝোপ থেকে বেরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাসার দিকে ছুটতে লাগলো।

সাধারণত যতক্ষণ না মা 'এখন শোয়ার সময়!' এ-কথা বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তত্তচান স্কুলের কথা বলে যেতে থাকে। তবে সে রাতে বেশি কথা না বলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো।

আর আজ সকালে। (খুব জরুরি কাজ আছে!)—এমন অনুভূতি নিয়ে তার ঘুম ভেঙে গেলো। যখন তত্তচানের মনে পড়লো তার গুপ্তধনের কথা, তখন সে খুব খুশি হলো।

অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগে বাসা থেকে তত্তচান বেরুলো। আর রকির সঙ্গে দৌড়োতে দৌড়োতে ঝোপের মধ্য ঢুকে গেলো।

'পেয়েছি। পেয়েছি!'

গতকাল তত্তচান চিহ্ন হিসেবে যেখানে পাথরটি রেখেছিলো, আজ সেটা ঠিক সেখানেই ছিলো।

তত্তচান রকিকে বললো, 'তোমাকে একটা চমৎকার জিনিস দেখাবো।' আর পাথর সরিয়ে আস্তে গর্তটা খুঁড়লো। তবে এমন বিস্ময়কর ব্যাপার আর হতে পারে না। সেই পাঁচ-সেন-এর সিকিটি উধাও হয়ে গেছে। তত্তচান আগে এতো অবাক কখনো হয় নি। "কেউ কি লুকোতে দেখেছিলো?" "পাথরটি কি সরে গেছে?" এমন নানা অনুমান করে এখানে সেখানে খুঁড়ে দেখলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঁচ-সেনের সিকিটি কোনখান থেকে বেরুলো না। তোমোএ স্কুলের সবাইকে সেটিকে দেখাতে পারবে না বলে অত্যন্ত হতাশ হলো। তার চেয়েও তার মনে অনেক বেশি বিস্ময়ের অনুভূতি জেগেছিলো।

তার পরও যখন সে ওইখান দিয়ে যেতো, তখনই সে ঝোপের ভেতরে ঢুকতো। তবে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া সেই পাঁচ-সেনের সিকি দ্বিতীয় বার আর পাওয়া গেলো না।

সেটি কি ছুঁচো নিয়ে গেলো? ওটা কি গতকালের স্বপ্ন ছিলো? বা ঈশ্বর দেখেছিলো?—তত্তচান ভাবলো। তবে সে যাই ভাবুক না কেন অনেক দিন ধরে, সেটা ছিলো তার কাছে ভুলে-না-যাওয়া এক বিস্ময়কর ঘটনা।

হাত দিয়ে কথা বলা

আজ বিকেলে জিইয়ুগাওকা স্টেশনের টিকেট গেটের কাছে তত্তচানের চেয়ে বয়সে একটু বড়ো দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে কথা বলছিলো। এক নজরে দেখলে মনে হবে তারা যেন 'পাথর-কাগজ-কাঁচি' খেলার মতো ভঙ্গিতে কথা বলছিলো। তবে ভালো করে দেখলে বোঝা যায় 'পাথর, কাগজ ও কাঁচি'-র চেয়ে তাদের হাত-মুখ নড়ানোর ভঙ্গিই ছিলো অনেক বেশি। তাই তত্তচানের মনে হলো কী মজা! আর সে তাদের পাশে গিয়ে ভালো করে দেখলো। দেখে মনে হয় তারা তিনজন কথা বলছে, তবে কোনো আওয়াজ করছে না। তাদের মধ্য কোনো একজন হাত নেড়ে নানা রকম ভঙ্গি করে তা দেখে অন্য একজন সাথে সাথে হাত দিয়ে নানা রকম ভঙ্গি করে। তৃতীয়জন একবার হাত নাড়ার ভঙ্গি করে হঠাৎ খুব মজা পাওয়ার মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। তাই কিছুক্ষণ দেখার পর তত্তচান বুঝলো তারা হাত দিয়ে কথা বলছে।

তার ইচ্ছে হলো তাদের কাছে গিয়ে কথা বলার। তবে হাত দিয়ে কীভাবে কথা বলতে হয় সেটা তার জানা ছিলো না তাছাড়া তারা তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রী নয়, তাই তাদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়া তাদের কাছে অভদ্রতাও মনে হতে পারে। তাই তারা তিনজন তোও-ইয়েকো-সেন লাইনের প্ল্যাটফর্মে উঠে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তত্তচান তাদের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলো। সে মনে মনে ঠিক করলো এক দিন অবশ্যই 'আমিও সবার সঙ্গে হাত দিয়ে কথা বলতে শিখবো।'

তখন তত্তচান জানতো না যে কেউ কেউ কানে শুনতে পায় না। তত্তচান প্রত্যেক দিন স্কুল যাওয়ার জন্য ওইমাচি লাইনের ট্রেনে ওঠে। যে ছেলে-মেয়েরা কানে শুনতে পায় না তারা ওইমাচি লাইনের শেষ স্টেশন ওইমাচি-চো'তে পৌরসভার বধিরদের স্কুলে পড়ে।

যে-সব উজ্জ্বল-আঁখি ছেলেমেয়ে একে অপরের হাত নাড়া দেখাচ্ছিলো তাদেরকে তত্তচানের কাছে খুব সুন্দর মনে হলো। এবং এক দিন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার কথা ভাবলো।

সেঙ্গাকুজি মন্দির

তোমোএ স্কুলের কোবাইয়াশি স্যারের লেখাপড়া শেখানোর পদ্ধতি অনন্য। তার ওপর ইউরোপ ও বিদেশের নানা দেশের প্রভাব পড়েছিলো। উদাহরণ হিসেবে ইউরিদ্‌মিক্স ছাড়াও নতুন রিদ্‌মিক শিক্ষা, টিফিনের সময় ও হাঁটাহাঁটির সময়ের আচার-আচরণ উল্লেখ করা যায়। টিফিনের সময় 'খাবার জিনিস ভালো করে চিবাও' গান করা হতো ইংল্যাণ্ডের 'রৌউ রৌউ রৌউ ইওর বোট'–এর সুরে। আরো নানা ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েছিলো। তবে প্রধান শিক্ষক কোবাইয়াশি-র দক্ষিণহস্ত ছিলো মারুইয়ামা স্যার। সে অন্যান্য স্কুলে উপ-প্রধান শিক্ষকের মতো ছিলো এবং অনেক ক্ষেত্রে ছিলো কোবাইয়াশি স্যার থেকে একেবারে ভিন্ন। মারুইয়ামার অর্থ হচ্ছে 'গোলাকার পাহাড়'। তার নামের মতো মারুইয়ামা স্যারের মাথাও ঠিক গোলাকার আর তার চূড়োতে একটাও চুল ছিলো না। মাথাটা তেলতেলে, ভালো করে দেখলে কানের পাশ থেকে পেছনের দিকে ঝিকমিক করা ছোট ছোট পাকা চুল চোখে পড়ে। সে একেবারে গোলাকার চশমা পরতো আর তার গাল ছিলো খাঁটি লাল। এ–সব দিক থেকে সে ছিলো কোবাইয়াশি স্যার থেকে একেবারে ভিন্ন। সে মাঝেমাঝে শিগিন্ (চীনা কবিতা) আবৃত্তি করে ক্লাসের সবাইকে শোনাতো। এ-ক্ষেত্রেও সে ছিলো ভিন্ন। সে আবৃত্তি করতো, 'বেন্‌সেই (চাবুকের আওয়াজ) শুকুশুকু (নীরবে নিঃশব্দে) ইয়োরু কাওয়াও ওয়াতারু

(রাতের নদী পার করে)', তবে তত্তচানরা 'বেন্সেই'-কে 'বেন্কেই' আর 'শুকুশুকু'-কে 'শিকুশিকু' শুনতো। এবং তারা মনে করতো এটা হচ্ছে সামুরাই বেন্কেইর করুণভাবে কেঁদে কেঁদে রাতে নদী পার হওয়ার সময়ের গান। মারুইয়ামা স্যারের বেন্কেইর করুণ গান কারো অজানা ছিলো না।

ডিসেম্বরের চোদ্দ তারিখের কথা। সকালে সবাই স্কুলে জড়ো হয়েছে। এমন সময় মারুইয়ামা স্যার বললো, 'আড়াইশো বছর আগে সাতচল্লিশ-জন রোনিন্ (মনিবহীন সামুরাই) যে প্রতিশোধ নিয়েছিলো, আজ সেই দিন। তাই তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সেঙ্গাকুজি মন্দির পর্যন্ত হেঁটে যাবো। তোমাদের বাসায় জানানো হয়েছে।'

কোবাইয়াশি স্যার কখনো মারুইয়ামা স্যারের কাজের বিরোধিতা করতো না। কোবাইয়াশি স্যার মারুইয়ামা স্যারের কাজকে কেমন মনে করতো তা জানা যায় নি, তবে সে তার কাজের বিরোধিতা করতো না। তাতে বোঝা যায় সে মারুইয়ামার কাজকে খারাপ মনে করতো না। তত্তচান ও অন্যদের মায়েদের মনে হলো তোমোএ স্কুল ও সাতচল্লিশজন প্রভুহীন সামুরাই-র সমাধিতে যাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন এক আকর্ষণীয় সম্পর্ক রয়েছে।

যাওয়ার আগে মারুইয়ামা স্যার সাতচল্লিশজন প্রভুহীন সামুরাই-র কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করলো। বিশেষ করে সাতচল্লিশজন প্রভুহীন সামুরাইকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিলো যে ব্যবসায়ী, তার নাম আমানোইয়া রিহেই, তাকে বাকুহুর সরকারী কর্মচারী বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সে 'আমি, আমানোইয়া রিহেই পুরুষ মানুষ' এ-কথা বলে সে সাতচল্লিশজন রোনিনের প্রতিশোধের কথা কিছুতেই ফাঁস করলো না। এ-অংশটা শিক্ষক বার বার সবাইকে শোনালো। সাতচল্লিশজন রোনিনের কাহিনী তারা ভালোভাবে বুঝলো না। তবে ক্লাস না করে কুহোন্বুৎসুর চেয়ে দূর পর্যন্ত টিফিন নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে যেতে পারবে এতে সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষককে 'আমরা যাচ্ছি—' বলে তারা রওনা হলো। স্কুলের পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রীকে পথ দেখিয়ে মারুইয়ামা স্যার আগে আগে হাঁটতে লাগলো। ইতিমধ্যে লাইনের এখানে সেখানে 'আমি, আমানোইয়া

রিহেই পুরুষ মানুষ' এ-কথা বলতে শোনা গেলো। মেয়েরাও উচ্চকণ্ঠে '... ...পুরুষ মানুষ' বলে চিৎকার করলো, তাই পথচারীরা হেসে মুখ ফিরিয়ে তাদের দেখলো। জিইয়ুগাওকা থেকে সেঙ্গাকুজি মন্দির প্রায় বারো কিলোমিটারের মতো পথ। পথে গাড়ি-ঘোড়া খুব কম ছিলো। আকাশ ছিলো নীল, ডিসেম্বরের টোকিও। তারা 'আমানোইয়া রিহেই পুরুষ মানুষ' এ-কথা অবিরাম ছুঁড়তে ছুঁড়তে দল বেঁধে হাঁটতে লাগলো। এতো দীর্ঘ পথ যেতে ছেলেমেয়েদের একটুও কষ্ট মনে হলো না।

যখন তারা সেঙ্গাকুজি মন্দিরে পৌঁছলো, তখন মারুইয়ামা স্যার সবাইকে ধূপকাঠি, পানি ও ফুল দিলো। মন্দিরটি কুহোন্বুৎসু মন্দিরের চেয়ে ছোট, তবে সারি বেঁধে ছিলো বহু সমাধি।

এ-মন্দির সাতচল্লিশজন রোনিন্ সমুরাইর উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত—এমন ভাবনা তত্তচানের মনে পবিত্র অনুভূতি জাগালো আর সে ধূপকাঠি উৎ-সর্গ করে মারুইয়ামা স্যারের মতো নীরবে মাথা নত করলো। ছাত্রছাত্রী-দের মধ্যে নীরবতা ছড়িয়ে পড়লো। তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অসাধারণভাবে নীরব হয়ে উঠলো। প্রত্যেক সমাধির সামনে রাখা ধূপ-কাঠির ধোঁয়া দীর্ঘ রেখায় ছবি এঁকে এঁকে আকাশে উঠছিলো।

সে-দিন থেকে তত্তচানের কাছে ধূপকাঠির গন্ধ ও মারুইয়ামা স্যারের গন্ধ এক হয়ে উঠলো। আরো এক হয়ে উঠলো 'বেন্কেই শিকুশিকু—' গানের ভাবগম্ভীর সুর ও 'আমানোইয়া রিহেই'-র গন্ধ ও 'সমাধির নীরব-তা'-র গন্ধ।

ছেলেমেয়েরা বেন্কেই ও সাতচল্লিশজন রোনিন্ সামুরাইর কথা ভালো-ভাবে বুঝলো না। তবে মারুইয়ামা স্যার যে আগ্রহের সঙ্গে তাদের সাতচল্লিশজন রোনিন-এর গল্প বলেছিলো তাতে তারা তার অনুরাগী হয়ে উঠেছিলো এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হলো। তার প্রতি এ-অনুরাগ ও শ্রদ্ধা কোবাইয়াশি স্যারের প্রতি তাদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা থেকে কিছুটা ভিন্ন। তা ছাড়া তত্তচান খুব পছন্দ করতো মারুইয়ামা স্যারের পুরু লেনসের পেছনের ছোট ছোট চোখ আর তার বিশাল দেহের সাথে বেমানান মৃদু কণ্ঠ।

তখন নববর্ষ একেবারে ঘনিয়ে এসেছে।

তত্তচানের বাসা থেকে স্টেশনে যাওয়া-আসার পথে ব্যারাকের মতো কয়েকটা বাসা ছিলো। সেখানে থাকতো কোরীয়রা। তত্তচান জানতো না তারা কোরিয়ার লোক। সে এতোটুকু মাত্র জানতো যে তাদের মধ্যে একজন মহিলা আছে, যে চুল মাঝখানে সিঁথি করে পেছনের দিকে শক্ত করে বাঁধে। মহিলাটি একটু মোটা আর তার পায়ে থাকতো ধারালো শীষযুক্ত ছোট নৌকোর মতো শাদা রাবারের জুতো। তার পরনে লম্বা স্কার্ট ও বুকে বড়ো ফিতা দিয়ে বাঁধা পোশাক। সে সব সময় উচ্চকণ্ঠে 'মাসাওচা—ন !' বলে তার ছেলেকে ডাকতো। এ-মহিলা সত্যিই সারাক্ষণ মাসাওচানকে ডাকতো। সাধারণত 'মাসাওচান' উচ্চারণে 'সা' ও 'ও'-র উপর শ্বাসাঘাত দেয়া হয়, তবে এ মহিলা শুধু 'সা'-র উপর শ্বাসাঘাত দিয়ে 'চান'কে উচ্চস্বরে টেনে টেনে উচ্চারণ করতো। আর এটা তত্তচানের কাছে খুব বিষণ্ন শোনাতো।

এই ব্যারাকটা ছিলো ওইমাচি লাইনের রেলপথের পাশে একটা ছোট টিলার ওপর।

তত্তচান মাসাওচানকে চিনতো। সে তত্তচানের চেয়ে একটু বড়ো। মনে হয় সে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তত্তচান জানতো না সে কোন স্কুলে পড়ে। তবে তার চুল এলোমেলো আর সে সব সময় কুকুর সঙ্গে নিয়ে হাঁটে।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে তত্তচান যখন এ-ছোট টিলার নিচ দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন মাসাওচান দেবরাজার মতো পা দুখানি ছড়িয়ে দু'হাত কোমরে রেখে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলো। সে হঠাৎ তত্তচানকে উচ্চকণ্ঠে ডাকলো, 'কোরীয় !'

সে তীক্ষ্ণ স্বর ছিলো ভীষণ ঘৃণাবিদ্বেষভরা। তত্তচান ভয় পেলো। যার সঙ্গে সে কখনো কথা বলে নি বা যার সাথে সে কোন দুষ্টুমি করে নি সেই ছেলে ওপর থেকে ঘৃণাবিদ্বেষভরা স্বরে তাকে যে এমন কথা বললো, তাতে তত্তচান ভীষণ অবাক হলো।

বাসায় ফিরে তত্তচান মাকে এ-ঘটনা জানালো। 'মাসাওচান আমাকে কোরীয়! বলেছে।'

তত্তচানের কথা শুনে মা তার হাত মুখের ওপর রাখলো। দেখতে না দেখতে মায়ের চোখ জলে ভরে গেলো। তত্তচান বিস্মিত হলো। তার মনে হলো ওটা খুব খারাপ কথা। কান্নায় মায়ের নাকের ডগা লাল হয়ে গেছে। সে অশ্রু না মুছে বললো, 'বেচারা ... ! আমার মনে হয় লোকেরা মাসাওচানকে "কোরীয়! কোরীয়!" বলে ডাকে। তাই মাসাওচান মনে করে যে "কোরীয়!" শব্দ একটা গালি। মাসাওচান এখন ছোট, তাই সে বোঝে না। গালি দেয়ার জন্য লোকেরা সাধারণত "বোকা!" বা "আহম্মক!" বলে। মাসাওচান কাউকে গালি দিতে চেয়েছিলো, তাই লোকেরা সব সময় তাকে যা বলে সে তোমাকে তাই বলেছে, "কোরীয়।" লোকেরা কেন যে এমন নিষ্ঠুর কথা বলে... ?'

তার পর মা চোখের জল মুছে তত্তচানকে ধীরে ধীরে বললো, 'তত্তচান জাপানী, আর মাসাওচান কোরিয়া নামের দেশের লোক। তবে তুমি ও মাসাওচান একই রকম শিশু। তাই কখনো "ওই লোকটি জাপানী" আর "ওই লোকটি কোরীয়" এমনভাবে পার্থক্য করো না। মাসাওচানের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। তারা শুধু কোরীয় বলে কিছু লোক তাদের গালিগালাজ করে এটা খুব দুঃখের।'

এ-কথা বোঝা তখন তত্তচানের পক্ষে বেশ কঠিন ছিলো তবে সে এতোটুকু বুঝলো যে মাসাওচানকে লোকেরা অকারণে গালি দেয়। তাই তার মা সব সময় উদ্বিগ্ন হয়ে মাসাওচানকে খোঁজে।

পরের দিন সকালে আবার যখন সে ওই টিলার নিচ দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন সে শুনলো মাসাওচানের মা তীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে 'মাসাওচা—ন।' বলে ডাকছে। ওই ডাক শুনতে শুনতে তত্তচান ভাবলো মাসাওচান কোথায় গেলো ? আমি কোরীয় নই, তবে মাসাওচান যদি আবার আমাকে কোরীয় বলে, তবে আমি "আমরা সবাই একই রকম শিশু।" এ-কথা বলে তার বন্ধু হবো—তত্তচান ভাবলো।

তবুও মাসাওচানের মায়ের উত্তেজনা ও উদ্বেগমিশ্রিত গলার স্বরের রেশ অনেকক্ষণ ধরে বাজতে থাকলো। কোনো কোনো সময় তার গলার স্বর

পাশ দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেনের আওয়াজের নিচে চাপা পড়ে যেতো। তবে 'মাসাওচা-ন!'—এ-স্বর এমন বিষণ্ন ও অশ্রুসজল ছিলো যে তা একবার শুনলে কখনো ভোলা যায় না।

চুলের বেণী

সে সময় তত্তচানের "দুটো" উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো। একটি হচ্ছে কয়েকদিন আগের ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্লুমা। আরেকটি হলো তিন-বেনুনির বেণী। ট্রেনে সে যখন একদিন একটি বড় মেয়ের বেণী দেখে, তখন সে ঠিক করে (আমি অমন চুলের মেয়ে হবো!)

ক্লাসের অন্যান্য মেয়ের চুল বব করে ছাঁটা, তবে তত্তচানের চুল লম্বা, এক দিকে সিঁথি কেটে ফিতা দিয়ে বাঁধা। এটা ছিলো মায়ের পছন্দ, তবে তত্তচান ভাবছিলো একদিন সে বেণী বাঁধবে। অবশেষে আজ সে মাকে দিয়ে তার চুলে দুটি বেণী বাঁধালো। রাবারের ফিতা দিয়ে যখন বেণীর প্রান্ত আটকানো হলো এবং সরু ফিতা বাঁধা হলো তখন তত্তচান এতো খুশি হলো যেন সে উপরের শ্রেণীর ছাত্রী হয়ে গেছে। সে আয়নায় দেখলো, বেণীটা কী চমৎকার (সত্য কথা হচ্ছে বড় মেয়েদের তুলনায় তার বেণীতে চুল কম ও ছোট আর তা ছিলো বাচচা শুয়োরের লেজের মতো)। সে রকির কাছে ছুটে গিয়ে অমূল্য রত্ন তুলে দেখানোর মতো রকিকে বেণী দেখালো। রকি দুই তিন বার চোখ পিটপিট করলো। তত্তচান তাকে বললো, 'তুমি যদি বেণী বাঁধো, তাহলে খুব সুন্দর হবে।'

তার পর তত্তচান যাতে তার বেণী খুলে না যায়, সে জন্য মাথা না নেড়ে ট্রেনে উঠলো। সে ভাবছিলো ট্রেনে হয়তো কেউ তাকে বলবে, 'আরে, কী চমৎকার বেণী!!' তবে কেউ এমন কথা বললো না। তবে সে যখন স্কুলে পৌঁছলো, তখন তার সহপাঠী মিইয়োচান, সাক্কোচান ও আওকি কেইকোচান এক সঙ্গে বলে উঠলো, 'বাহ্! বেণী বেঁধেছো!' এতে সে খুব তৃপ্তি পেলো। তাই সে মেয়েদের একটু করে তার তিন-বেনুনির বেণী ছুঁতে দিলো। তবে ছেলেদের মধ্যে কেউ 'বাহ্!' বললো না।

টিফিনের পর তার সহপাঠী ওএ হঠাৎ উঁচু গলায় বলে উঠলো, 'আরে তত্তচানের চুল আজ অন্য রকম!' ছেলের চোখেও পড়েছে! এ-কথা ভেবে তত্তচান খুশি হয়ে সগর্বে বললো, 'হুঁ, বেণী বেঁধেছি।' তখন তত্তচানের কাছে এসে হঠাৎ ওএ তার দু হাত দিয়ে তত্তচানের বেণী তুলে ধরে গান গাওয়ার মতো বললো, 'আহ্! আজ খুব ক্লান্ত, তাই তোমার বেণী ধরে একটু ঝুলতে পারি? ট্রেনে ঝোলার চামড়ার চেয়েও আরামদায়ক!' তত্তচান এতে দুঃখ পেলো, কিন্তু এখানেই তার দুঃখের শেষ হলো না। ওএ ছিলো ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও মোটা। হ্যাংলা-পাতলা ছোট তত্তচানের চেয়ে সে দেখতে দ্বিগুণ ছিলো। সেই ওএ 'আরামদায়ক!' বলে তার বেণী ধরে পেছনের দিকে টান দিলো, তাই তত্তচান টলতে টলতে পেছনের দিকে পড়ে গেলো। 'ঝোলার চামড়া' বলায় সে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছিলো আর এখন সে পেছনের দিকে মাটিতে পড়ে গেলো। তার পর ওএ তত্তচানকে দাঁড় করানোর চেষ্টায় তার বেণী ধরে কৌতুকের সাথে 'হেইয়া! হেইয়া!' চিৎকার করে ক্রীড়ানুষ্ঠানের দড়ি টানাটানি খেলার মতো টান দিলো। তখন তত্তচান 'ওয়া!!' বলে কেঁদে উঠলো।

তত্তচানের কাছে বেণী ছিলো 'বয়স্ক মহিলার' চিহ্ন। তাই সে মনে করেছিলো বেণী বাঁধা তত্তচানকে দেখে লোকেরা বিস্মিত হয়ে তার সাথে ভদ্র আচরণ করবে...। তবে তত্তচান 'ওয়া—!!' বলে কেঁদে উঠে প্রধান শিক্ষকের ঘরে ছুটে গেলো।

সে কাঁদতে কাঁদতে দরোজায় করাঘাত করলো, তখন প্রধান শিক্ষক দরোজা খুলে অভ্যেস মতো তার শরীর নোয়ালো যাতে তাদের দুজনের চোখ সমান উচ্চতায় থাকে। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?'

তত্তচান তার বেণী ঠিক মতো আছে কি না তা পরখ করে বললো, 'ওএ এটা টেনে হেইয়া! হেইয়া! বলেছে।'

প্রধান শিক্ষক তত্তচানের দিকে তাকালো। দেখে মনে হচ্ছিলো একদিকে তার মুখে কান্না আর অন্যদিকে সরু ছোট বেণীটি উৎফুল্ল ও নাচছিলো। স্যার চেয়ারে বসে তত্তচানকে তার সামনে বসিয়ে অন্যান্য

দিনের মতো ফোকলা দাঁতের কথা না ভেবে মৃদু হেসে বললো, 'কেঁদো না। তোমার চুল চমৎকার।'

তত্তচান অশ্রুভেজা মুখ তুলে একটু লজ্জা পেয়ে বললো, 'স্যার, এটা তোমার পছন্দ হয়েছে?'

শিক্ষক বললো, 'ভীষণ সুন্দর!'

এই একটি মাত্র কথায় তত্তচানের চোখের জল বন্ধ হয়ে গেলো। তত্তচান চেয়ার থেকে নেমে বললো, 'এখন ওএ হেইয়া বললেও কাঁদবো না।'

প্রধান শিক্ষক মাথা নেড়ে হাসলো। তত্তচানও হাসলো। তার হাসিমুখ বেণীর সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছিলো।

তত্তচান মাথা নত করে নমস্কার করলো আর খেলার মাঠে ছুটে গিয়ে সবার সাথে খেলতে লাগলো।

তত্তচান যখন তার কান্নার কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলো, তখন ওএ তার চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে তত্তচানের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং একটু নিস্তেজ উচচ কণ্ঠে বললো, 'একটু আগে তোমার বেণী ধরে টেনেছি, আমাকে ক্ষমা করো! প্রধান শিক্ষকের কাছে বকা খেয়েছি। সে বললো মেয়েদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। সে আরো বললো মেয়েদের সম্মান করো।'

তত্তচান একটু অবাক হলো। কেননা 'মেয়েদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো'—এমন কথা সে এখন পর্যন্ত কখনো শোনে নি। ছেলেরাই সব সময় গুরুত্বপূর্ণ। তত্তচান একটি পরিবারকে জানে যে পরিবারে অনেক ছেলে-মেয়ে আছে। সেখানে সব সময় নাশতা এবং খাবার ছেলেদেরকে প্রথম দেয়া হয়। আর মেয়েরা যখন কথা বলে তখন তাদের মা বলে, 'মেয়েরা চুপ করে থাকো।' তবে প্রধান শিক্ষক ওএ-কে বলেছে, 'মেয়েদের সম্মান করো' তত্তচানের কাছে এটা অদ্ভুত মনে হলো আর তার মন খুশি হয়ে উঠলো। সম্মান পেলে সকলেই যে খুশি বোধ করে।

এ দিনের ঘটনা ওএ-র কাছেও ছিলো খুব দু:খজনক। মেয়েদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো আর তাদের সম্মান করো! এটা হয়ে উঠলো তত্তচানের কাছে অনেক দিন না-ভোলার মতো স্মৃতি। কারণ ওএ

তোমোএ স্কুলে যত দিন ছিলো তত দিনের মধ্যে সে এই প্রথম ও শেষ বারের মতো প্রধান শিক্ষকের কাছে বকা খেয়েছিলো।

'থ্যাংক ইউ'

শীতের ছুটি এলো। গরমের ছুটির মতো ছেলেমেয়েরা স্কুলে জড়ো হলো না। তারা তাদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ছুটি কাটালো। মিগিতা সবাইকে বললো, 'কিয়ুশুতে নানা ভাই'র সঙ্গে নববর্ষ কাটাবো।'

তাইচান পছন্দ করতো রসায়ন বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সে বললো, 'বড় ভাইয়ার সঙ্গে কোথাও পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাগার পর্য-বেক্ষণ করতে যাবো।' সে এর জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলো।

অন্য ছেলেমেয়েরা নানা কথা বলতে বলতে 'আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে।' বলে বিদায় নিলো।

তত্তচান বাবা-মা'র সঙ্গে স্কি করতে গেলো। বাবার বন্ধু আর একই অর্কেস্ট্রার চেলো বাদক ও কণ্ডাক্টর সাইতো হিদেও-র অত্যন্ত চমৎকার একটা বাসভবন ছিলো শিগা পার্বত্য অঞ্চলে। প্রতি বছর তারা সেখানে শীতকালে তার সঙ্গে থাকতো, তাই তত্তচান কিণ্ডারগার্টেনের সময়ই স্কি করা শিখতে শুরু করলো।

স্টেশন থেকে ঘোড়ায় টানা স্লেজ-গাড়ি করে শিগা পার্বত্য অঞ্চলে যেতে হয়। সেটা ধবধবে শাদা তুষারের জগত। সেখানে লিফট বা অমন কিছু নেই। ছিলো স্কি দিয়ে পিছলে চলে যাওয়া জায়গায় এখানে সেখানে ছড়ানো কাটা বা পড়ে যাওয়া গাছের গোড়ার অংশ। মা বলতো শিগা পার্বত্য অঞ্চলে সাইতো-র মতো বাসা যাদের নেই, তাদের জন্য আছে শুধু একটা জাপানী ধরনের হোটেল আর একটা ইউরোপীয় ধরনের হোটেল। তবে মজার কথা হচ্ছে সেখানে অনেক বিদেশী লোক ছিলো।

তত্তচানের কাছে আগের ও এ-বছরের পার্থক্য হলো যে তত্তচান এবার প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী, আর সে একটি ইংরেজি শব্দ শিখেছে। শব্দটি সে তার বাবার কাছ থেকে শিখেছে—'থ্যাংক ইউ'।

তুষারের ওপর স্কি পায়ে দিয়ে যখন তত্তচান দাঁড়িয়ে ছিলো, তখন সব সময় তার পাশ দিয়ে যাওয়া বিদেশী লোকেরা তত্তচানকে কিছু একটা বলে। হয়তো তা ছিলো 'সে মিষ্টি' বা ওই ধরনের কথা। তত্তচান তা বুঝতে পারে নি। তাই গত বছর পর্যন্ত সে চুপ থেকেছে। তবে এবছর সে শুধু মাথা একটু নত করে প্রত্যেক বার 'থ্যাংক ইউ' বললো। কোনো কোনো মহিলা তত্তচানের গালে তার গাল লাগালো আর কোনো কোনো পুরুষ শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরলো। তত্তচান ভাবছিলো শুধু 'থ্যাংক ইউ' বললেই সবার সাথে এমন ভাব হতে পারে, এটা কী মজার।

এক দিন কোমল চেহারার এক যুবক তত্তচানের কাছে এসে হাত দিয়ে ইশারা করে বললো, 'আমার স্কি-র সামনে চড়বে?'

তত্তচান বাবাকে জিজ্ঞেস করলো। বাবা বললো, 'বেশ'। তাই তত্তচান ওই যুবককে বললো, 'থ্যাংক ইউ'।

যুবকটি তত্তচানকে তার স্কি-র সামনের দিকে উবু করে বসালো আর সে তার স্কি দুটো পাশাপাশি রেখে শিগা পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘ ঢালু পথে তত্তচানকে নিয়ে হাওয়ার মতো উড়ে চলে গেলো। তত্তচানের কানে বাতাস হিশ্ হিশ্ করে তীক্ষ্ণ শব্দ করলো। তত্তচান তার দু'হাত দিয়ে হাঁটু ধরে সতর্ক হয়ে বললো যাতে সামনের দিকে পড়ে না যায়। একটু ভয় লাগলো বটে, তবে সে খুব আনন্দ পেলো। যখন স্কি করা শেষ হলো, তখন দর্শকেরা হাততালি দিলো। তত্তচান স্কি-র প্রান্তে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে মাথা একটু নত করে বললো, 'থ্যাংক ইউ'।

সকলে আরো হাততালি দিলো। তার নাম স্নাইডার, সে পৃথিবী বিখ্যাত স্কি খেলোয়াড়। সে নিজের কাছে সব সময় রূপোর অদ্ভুত স্কি পোল রাখে—এ-কথা তত্তচান জানতে পারে অনেক বছর পর। সে দিন তত্তচান যে তাকে পছন্দ করেছিলো, তার কারণ স্কি করার পর সবাই তত্তচানকে লক্ষ্য করে হাততালি দিলো। তার পর ওই লোকটি কোমর নিচু করে তত্তচানের হাত ধরে তত্তচানের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন

সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেয়ে, এবং বললো 'থ্যাংক ইউ'। সে তত্তচানের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলো যেন তত্তচান 'শিশু' নয় বরং একজন বয়স্ক মহিলা। আর যখন স্নাইডার তার কোমর নিচু করলো তখন তার নম্রতা তত্তচান নিজের অন্তরের অন্তস্থলে অনুভব করলো। স্নাইডারের পেছনে তখন দূর, বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো ধবধবে শাদা তুষারের জগত।

পাঠাগার

শীতের ছুটি শেষ। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে জমা হলো। আর যখন তারা জানতে পারলো ছুটির মধ্যে একটি চমৎকার ঘটনা ঘটে গেছে, তখন তারা হৈচৈ করে উঠলো।

তাদের লম্বা ট্রেনের ক্লাসঘরগুলোর উল্টো দিক ··· অর্থাৎ মিলনায়তন-টিকে মাঝখানে রেখে তার অন্য ধারে ফুল বাগানের পাশে রাখা ছিলো একটা ট্রেনের কামরা। শীতের ছুটিতে সেটা রূপান্তরিত হয়েছে পাঠাগারে। স্কুলের কাজের লোক রিয়োচান সব রকম কাজ করতে পারে। এ জন্য সবাই তাকে সম্মান করে। সে খুব পরিশ্রম করেছিলো। ট্রেনের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিলো বই রাখার অনেক শেলফ্ আর তাতে সারি সারি সাজিয়ে রাখা ছিলো নানা ধরনের বর্ণমালার রং-বেরঙের বই। আর সেখানে চেয়ার টেবিল সারি সারি রাখা ছিলো যাতে তারা বই পড়তে পারে।

প্রধান শিক্ষক বললো, 'এটা তোমাদের পাঠাগার। এখানকার যে-কোনো বই পড়তে পারো। বিশেষ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বিশেষ বই এমন ভাবার দরকার নেই। যে-কোনো সময় পড়ার ঘরে ঢুকে নিজের পছন্দ মতো বই পড়তে পারো। যদি বাসায় পড়তে চাও, তবে এখান থেকে বই ধার নিতে পারো। পড়া শেষ হলে বই ফেরত দেবে। তোমাদের বাসায় যদি সকলের পড়ার মতো বই থাকে তা যদি এখানে নিয়ে আসো, তাহলে আমি খুশি হবো। যাই হোক, যতো পারো বেশি করে বই পড়ো।'

সব এক বাক্যে শিক্ষককে বললো, 'আচ্ছা, আজ প্রথম ঘণ্টা পড়ার ঘরে পড়বো।'

সবাইকে উত্তেজিত দেখে প্রধান শিক্ষক একটু আনন্দিত হয়ে হেসে বললো, 'তাই নাকি, তাহলে তাই করো।'

তখন তোমোএ স্কুলের পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী সবাই ট্রেনের এক কামরায় উঠলো। সবাই কোলাহল করে নিজ নিজ বই বাছাই করে চেয়ারে বসতে উদ্যত হলো। তবে অর্ধেকের মতো ছাত্রছাত্রী বসতে পারলো। বাকিরা দাঁড়িয়ে রইলো। ওই দৃশ্যটা ছিলো যেন একটা ট্রেন বোঝাই লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই পড়ছে। দৃশ্যটি চোখে পড়লেই মজা লাগে। এতে সবার আনন্দের সীমা ছিলো না।

তত্তচান তখনও বেশি অক্ষর পড়তে পারতো না, তাই ঠিক করলো সে মজার মজার ছবিতে ভরা বই পড়বে।

সবাই বই হাতে নিয়ে পৃষ্ঠা ওলট পালট করতে শুরু করে হঠাৎ একটু নীরব হয়ে গেলো। কিছুক্ষণের জন্য মাত্র। এর মাঝে এখানে সেখানে উচ্চকণ্ঠে উঠতে লাগলো পড়ার আওয়াজ। অক্ষর পড়তে না পেরে অন্য কারো কাছে জিজ্ঞেস করার আওয়াজ, একে অন্যের সাথে বই বদল করার আওয়াজ আর হাসাহাসির আওয়াজ।

একজন পড়তে শুরু করলো, "গান গাইতে গাইতে ছবি আঁকা নামের বই"। তাই সে উঁচু গলায় গান গাইতে গাইতে মারুমাগে খোপা বাঁধা গৃহিণীর ছবি আঁকলো। সে গান গাইলো—

বৃত্তের ভেতরে বিন্দু, বৃত্তের ভেতরে বিন্দু
দুটি সোজা দাগ, আর দুটি খাড়া দাগ
আর বৃত্তের ভেতরে বিন্দু
বেগম বৃত্ত
তিনখানি চুল, তিনখানি চুল, তিনখানি চুল
চোখের পলকে এমন হয়ে গেলো গৃহিণী।

প্রত্যেক দিন নিজের পছন্দসই বিষয় থেকে শুরু করতে পারো বা "অন্যের আওয়াজ বিরক্তিকর, তাই পড়াশোনা অসম্ভব" এটা ঠিক নয়। বা পাশেপাশে গোলমাল হলেও নিজের কাজে মনোযোগ দেয়া সম্ভব!" এমন শিক্ষা পেয়েছিলো তোমোএ স্কুলের ছেলেমেয়েরা। তাই এই 'বৃত্তের ভেতর বিন্দু' গানও বিশেষ বিরক্তি না হয়ে কোনো কোনো ছেলে এক সঙ্গে গান গাইলো, তবে অন্যরা সবাই নিমগ্ন রইলো নিজ নিজ বই-এর পাতায়।

মনে হয় তত্তচান পড়ছিলো একটি লোককাহিনী। সেটা এক ধনীর মেয়ের গল্প, সে সব সময় বায়ু-কর্ম করে। তাই সে বিয়ের জন্য বর পাচ্ছে না। অবশেষে সে বর পেয়ে খুশিতে বিয়ের রাতে অন্যান্য দিনের চেয়ে আরো অনেক জোরে বায়ু ত্যাগ করলো। শুয়ে থাকা বর বায়ুর তোড়ে সাড়ে সাত পাক ঘুরে মুর্ছিত হয়ে পড়ে। ওই বইয়ের কাহিনী ছিলো এমন। আরেকটি বইয়ের নাম 'মজার ছবি'। এ বই-এ ঘরের ভেতর একজন মানুষ উড়ছে। বইটি পড়ার জন্য সবাই আগ্রহী হয়ে ওঠে।

ঠাসাঠাসি হলেও স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী ট্রেনের জানালা দিয়ে ঢোকা সকালের আলোর মধ্যে প্রাণ ভরে বই পড়ছিলো। এ-দৃশ্য দেখে প্রধান শিক্ষক যার পর নাই খুশি হলো।

সে দিন সবাই সারা দিন এভাবে পাঠাগারে কাটালো।

তার পর থেকে বৃষ্টির জন্য যখন বাইরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন বা অন্যান্য সময় ওই পাঠাগার সকলের একত্র হওয়ার জায়গায় পরিণত হয়।

আর এক দিন প্রধান শিক্ষক বললো, 'শিগগির পাঠাগারের কাছে একটা টয়লেট তৈরি করবো।' কারণ সবাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সহ্য করে বই প'ড়ে এক সময় মিলনায়তনের অন্য ধারে অবস্থিত টয়লেটের দিকে দারুণ অদ্ভুত ভঙ্গিতে ছুটে যেতো।

লেজ

বিকেল। স্কুল ছুটির পর তত্তচান যখন বাসায় ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছিলো, তখন ওএ ছুটে এসে নিচু গলায় বললো, 'প্রধান শিক্ষক রেগে গেছে!'

তত্তচান জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায়?' সে তখন পর্যন্ত কখনো শোনে নি যে প্রধান শিক্ষক রাগ করছে, তাই সে ভীষণ অবাক হলো। ওএ তার সরল স্বভাবের চোখ গোল গোল করে একটু নাক ফুলিয়ে বললো, 'প্রধান শিক্ষকের রান্নাঘরে।'

'চলো যাই।' বলে তত্তচান তার হাত ধরলো এবং তারা শিক্ষকের বাসার রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলো। প্রধান শিক্ষকের বাসা মিলনায়তনের পাশে, আর তার রান্নাঘর ছিলো স্কুলের মাঠে ঢোকার পেছনের পথের কাছে। তত্তচান যখন টয়লেটের ময়লার ট্যাংকের ভেতরে পড়ে গিয়েছিলো, তখন শরীর ধোয়ার জন্য স্নানঘরে গিয়েছিলো সে এ-রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে। টিফিনের সময়ের 'সামুদ্রিক জিনিস' ও 'পাহাড়ী জিনিস'-এর তরকারিও তৈরি করা হয় এই রান্নাঘরে।

তারা দু'জন পা টিপেটিপে রান্নাঘরের কাছে এলো। বন্ধ দরোজার ওই পাশে প্রধান শিক্ষকের সত্যিই রাগান্বিত কণ্ঠ শোনা গেলো।

প্রধান শিক্ষক বলছিলো, 'কেন তুমি অবিবেচকের মতো তাকাহাশিকে বলেছো তার "লেজ আছে"।'

সে রাগান্বিত কণ্ঠের উত্তরে তত্তচানদের ক্লাসের শিক্ষিকাকে বলতে শোনা গেলো, 'আমি অত গভীরভাবে ভেবে বলি নি, সে মুহূর্তে তাকাহাশিকে আমার চোখে পড়লো আর তাকে খুব মিষ্টি লাগলো, তাই আমি এমনই তাকে এ-কথা বলেছি।'

প্রধান শিক্ষক বললো, 'তবে তোমার কথার তাৎপর্য তুমি বুঝতে পারছো না? আমি তাকাহাশির কতো যত্ন নিচ্ছি তা তোমাকে কেমন করে বোঝাবো!'

সকালের ক্লাসের কথা তত্তচানের মনে পড়লো। 'অনেক অনেক দিন আগে মানুষের লেজ ছিলো'—এমন কাহিনী ক্লাসের শিক্ষিকা আজ সকালে

তাদের বলেছিলো। এটা ছিলো খুব মজার গল্প আর সবাই তা পছন্দ করেছিলো। বয়স্কদের ভাষায় ওটা বিবর্তনতত্ত্বের প্রারম্ভিক কাহিনী। যাই হোক এটা তাদের কাছে ভীষণ অদ্ভুত কাহিনী। বিশেষ করে শিক্ষিকা যখন বললো, 'এখনও সবার কোসিক্স (coccyx) নামের লেজের চিহ্ন অবশিষ্ট আছে।'

তখন তত্তচানরা সবাই নিজ নিজ কোসিক্স কোথায় আছে, তা জানার জন্য সারা ঘর হৈচৈ-এ ভরে তুললো। কাহিনীর শেষে শিক্ষিকা ঠাট্টা করে বললো, 'কারো এখনও লেজ অবশিষ্ট আছে? তাকাহাশি, তোমার আছে কি না?'

তাকাহাশি তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়ালো আর ছোট হাত দুলিয়ে গম্ভীরভাবে বললো, 'নেই।' তত্তচান বুঝলো সেই সময়ের কথা নিয়ে প্রধান শিক্ষক রেগে উঠেছে।

প্রধান শিক্ষকের কণ্ঠস্বরে রাগের চেয়ে বেদনা ছিলো বেশি। প্রধান শিক্ষক বললো, 'তুমি কি ভেবে দেখেছো, তাকাহাশির লেজ আছে এ-কথা বললে তার কেমন লাগবে?'

শিক্ষিকার কোনো উত্তর শোনা গেলো না। তত্তচান বুঝতে পারলো না কেন প্রধান শিক্ষক লেজ নিয়ে এতো রেগেছে। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় 'তোমার লেজ আছে?' তাহলে আমি অবশ্যই খুশি হবো।

সত্যিই তাই। তত্তচানের দেহগঠনে কোনো ত্রুটি ছিলো না, তাই 'তোমার লেজ আছে?' জিজ্ঞেস করা হলেও সে কিছু মনে করলো না। তবে তাকাহাশির দৈহিক ত্রুটি ছিলো। সে যে আর বাড়বে না এ-কথা সে নিজেও জানতো। তাই প্রধান শিক্ষক ক্রীড়ানুষ্ঠানেও এমন সব খেলা উদ্ভাবন করেছিলো যাতে তাকাহাশি জিততে পারে আর দৈহিক ত্রুটির জন্য সে যাতে লজ্জাবোধ না করে, সে জন্য সে ছাত্রছাত্রীদের পোশাক ছাড়াই দিঘিতে সাঁতার কাটার কথা ভেবেছিলো। যাই হোক, প্রধান শিক্ষক যথাসম্ভব চেষ্টা করছিলো তাকাহাশি, ইয়াসুআকিচান ও অন্যান্য দৈহিক প্রতিবন্ধী শিশুদের মন থেকে হীনতা বোধ ও তারা যে 'অন্যান্য শিশুর চেয়ে নিকৃষ্ট' এমন ধারণা যাতে কেটে যায়। সত্যিই তাদের হীনতা বোধ কেটে গিয়েছিলো। তবে তাকে যতই মিষ্টি দেখাক না

কেন সব ছাত্রছাত্রীর মধ্য থেকে বিশেষ করে তাকাহাশিকে 'তোমার লেজ আছে?'—এমন বিবেচনাহীন প্রশ্ন করা প্রধান শিক্ষকের চিন্তার বাইরে ছিলো। বোঝা গেলো যে প্রধান শিক্ষক সকালের ক্লাস দেখতে গিয়ে ক্লাসঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে আকস্মিকভাবে এ-উক্তি শুনেছিলো।

তত্তচানের কানে এলো শিক্ষিকা অশ্রুভরা কণ্ঠে বলছে, 'সত্যিই আমার ভুল হয়েছে। কী ভাবে আমি তাকাহাশির কাছে ক্ষমা চাইবো...?'

প্রধান শিক্ষক চুপ করে রইলো। কাঁচের দরোজার জন্য তত্তচান প্রধান শিক্ষককে দেখতে পারছিলো না, কিন্তু তখন প্রধান শিক্ষককে দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো তার। সে জানে না কেন, তবে অন্যান্য দিনের চেয়ে আর আরো বেশি করে তার মনে হলো যে প্রধান শিক্ষক সত্যিই তাদের আপনজন। তত্তচানের মতো ওএ-রও একই রকম মনে হলো।

তত্তচান ভোলে নি যে, অন্য শিক্ষকদের সামনে শিক্ষকদের ঘরে না বকে প্রধান শিক্ষক তাদের ক্লাসের শিক্ষিকাকে বকাঝকা করছিলো রান্নাঘরে। (এতে সে কোবাইয়াশি স্যার যে একজন খাঁটি শিক্ষাবিদ, তার রূপ দেখতে পেলো ...) এটা সে তখন বোঝে নি। তবে কেন যেন সুদীর্ঘকাল ধরে প্রধান শিক্ষকের কণ্ঠস্বর তার মনে ছিলো।

বসন্ত... তোমোএ স্কুলে তত্তচানের দ্বিতীয় বসন্ত একেবারে কাছে এসে পড়েছিলো।

দ্বিতীয় বসন্ত

স্কুলের মাঠের গাছে একের পর এক গজিয়ে উঠেছিলো নরম নরম সবুজ পাতা। ফুল বাগানের কেয়ারিতেও ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফুটছিলো ফুলের পর ফুল। ক্রোকাস, ট্রাম্পেট ডেফোডিল ও পেন্সি ইত্যাদি একটার পর একটা ফুটে তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলো, 'তোমরা ভালো আছো তো?'

টিউলিপ যেন নিজের গলা বাড়ানোর জন্য লম্বা করে চলছিলো নিজেকে। চেরি ফুলের কুঁড়ি যেন "প্রস্তুত, যাও!!" সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা করার মতো ভঙ্গিতে দুলছিলো স্নিগ্ধ সমীরণে।

সাঁতার দিঘির পাশে ছোট চার কোণা কংক্রিটের পা ধোয়ার জায়গায় ভেলার মতো বড় বড় চোখওলা কালো গোল্ডফিসগুলো ছাড়া আর সব গোল্ডফিস শীতভর স্থির হয়ে চুপচাপ ছিলো। এখন তারা দেহ মেলে আনন্দে নড়াচড়া করছে।

এ ঋতুতে সব কিছুকেই ঝকমকে নতুন ও সজীব দেখায়, তাই মুখে বলা দরকার নেই এখন বসন্ত। দেখলেই বোঝা যায়।

তত্তচান যে সকালবেলা মায়ের সঙ্গে প্রথম বারের মতো তোমোএ স্কুলে এসেছিলো আর অবাক হয়েছিলো মাটির নিচ থেকে গজিয়ে ওঠা স্কুলের গেট দিয়ে ট্রেনের ক্লাসঘর দেখে খুশিতে লাফিয়ে উঠেছিলো আর প্রধান শিক্ষক কোবাইয়াশি সোসাকুকে তার বন্ধু বলে ঠিক করেছিলো, তার পর থেকে ঠিক এক বছর কেটে গেলো। তত্তচানদের কাছে এটা অত্যন্ত সুখের ব্যাপার যে তারা ঝকমকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলো। আর এবার যারা প্রথম শ্রেণীতে নতুন ভর্তি হয়েছে, তারা গত বছরের তত্তচান-দের মতো চঞ্চলভাবে চারদিকে তাকাতে তাকাতে স্কুলে এসেছে।

এক বছর তত্তচান সত্যিই একটি পরিপূর্ণ জীবন যাপন করেছে, প্রত্যেক দিন আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করেছে সকাল বেলার জন্য। সে তখনও চিন্দোন্‌ইয়া পছন্দ করতো, তবে সে জানতে পারলো তার চারদিকে পছন্দ করার মতো অনেক অনেক জিনিস আছে। আগের স্কুল থেকে তত্তচানকে 'আপদ' বলে বহিষ্কার করা হয়েছিলো, সে তত্তচান এখন তোমোএ স্কুলের সবচেয়ে যোগ্য ছাত্রী হয়ে উঠেছে।

তবে 'তোমোএ স্কুলের যোগ্য ছাত্র...' কোনো না কোনো মা-বাবার কাছে ছিলো কিছুটা উদ্বেগের ব্যাপার। তত্তচানের মা-বাবা প্রধান শিক্ষকের ওপর অর্পণ করেছিলো তাদের মেয়ের সব ভার। তারা প্রধান শিক্ষকের ওপর আস্থাশীল ছিলো, তবুও তারাও কখনো কখনো সব কিছু ঠিক আছে কি না এ-কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হতো। মা-বাবার মধ্যে কেউ কেউ কোবাইয়াশি স্যারের শিক্ষা-নীতিকে আধা বিশ্বাস ও আধা অবিশ্বাসের

নজরে দেখতো। তারা ওপরে ওপরে যা দেখেছে, তা দিয়েই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তাদের ছেলেমেয়েদের তোমোএ স্কুলে রাখা ভয়াবহ। এ-কথা ভেবে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের অন্য স্কুলে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করলো। তবে ছেলেমেয়েরা তোমোএ স্কুল থেকে বিদায় নিতে চায় না বলে কাঁদলো। সৌভাগ্যবশত তত্তচানের ক্লাসের কেউ স্কুল ছাড়লো না। মাটিতে আছাড় খেয়ে হাঁটু ছিলে যাওয়া একটি ছেলে তার হাঁটুর মামড়ি পত পত করে দুলিয়ে চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা ফেলে নিঃশব্দে প্রধান শিক্ষকের পিঠে ঘুষি মারছিলো। প্রধান শিক্ষকের চোখও কান্নাকাটিতে লাল হয়ে উঠেছিলো। শেষ পর্যন্ত ছেলেটির মা-বাবা ছেলেটিকে স্কুল থেকে নিয়ে গেলো। সে বার বার পিছন ফিরে হাত নেড়ে নেড়ে চলে গেলো...।

তবে এটার মতো বেদনাদায়ক ঘটনা বড় একটা ছিলো না। আবার প্রতি দিন বিস্ময় ও আনন্দ বয়ে নিয়ে আসবে এ-প্রত্যাশায় তত্তচান দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলো।

এরই মাঝে তত্তচানের স্কুল-ব্যাগও পুরোপুরিভাবে তার পিঠের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিলো।

রাজহাঁসের হ্রদ

হিবিইয়া পাবলিক হলে তত্তচান দেখতে গিয়েছিলো "রাজহাঁসের হ্রদ" নামের ব্যালেটি। তার বাবা "রাজহাঁসের হ্রদ"-এ এককভাবে বেহালা বাজাবে আর একটি খুব ভালো ব্যালে দল নাচবে। এটাই তত্তচানের প্রথম ব্যালে দেখা। রাজহাঁসদের রাজকুমারী মাথায় ঝকমকে ছোট মুকুট পরে আসল রাজহাঁসের মতো আলুতোভাবে শূন্যের ওপর লাফালাফি করছিলো। —তত্তচানের মনে হলো। রাজপুত্র ভালোবাসলো রাজহাঁসদের রাজকুমারীকে। তাই অন্য কোনো মেয়ে এসে তাকে যাই বলুক না কেন, সে এমন ভঙ্গিতে নাচলো যে তার যেন 'কাউকে দরকার নেই!' অবশেষে তারা দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো নাচলো। অর্কেস্ট্রাও খুব ভালো লাগলো তত্তচানের। বাসায় ফেরার পরও তত্তচান তন্ময় হয়ে ব্যালের কথাই ভাবছিলো। তাই পরের দিন যখন তার ঘুম ভাঙলো, তখন সে এলোমেলো চুলে রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে বললো, 'আমি গুপ্তচর, চিন্‌দোন্‌ইয়া ও স্টেশনের টিকেট বিক্রেতা, এ-সব কিছুই হবো না। আমি রাজহাঁস ব্যালে নৃত্যের নর্তকী হবো।'

মা বিস্মিত না হয়ে বললো, 'তাই নাকি?'

তত্তচান এই প্রথম ব্যালে দেখেছে, তবে প্রধান শিক্ষকের মুখে সে ইসাডোরা ডানকান নামের অপূর্ব এক নর্তকীর কথা মাঝে মাঝে শুনেছে। কোবাইয়াশি স্যারের মতো ডানকানের ওপর ডালক্রোজের প্রভাব পড়েছিলো। কোবাইয়াশি স্যারকে তত্তচান শ্রদ্ধা করতো আর ওই স্যার খুব পছন্দ করতো ইসাডোরা ডানকানকে। তাই তত্তচানেরও তাকে খুব ভালো লাগতো। তত্তচান তাকে কখনো দেখে নি তবে তাকে চেনা মানুষের মতো মনে করতো। তত্তচানের মনে হলো তার পক্ষে নর্তকী হওয়া খুব একটা অসাধারণ ব্যাপার নয়।

ভাগ্যিস ঠিক সে সময় কোবাইয়াশি স্যারের এক বন্ধু তোমোএ স্কুলে ইউরিদ্‌মিক্স শেখাতে আসতো। স্কুলের খুব কাছেই ছিলো তার নাচের স্টুডিও। তত্তচানের মা সেই শিক্ষককে অনুরোধ করে স্কুল ছুটির পর তার স্টুডিওতে তত্তচানের নাচ শেখার ব্যবস্থা করলো। মা কখনো তত্তচানকে বলে নি 'এটা করো বা সেটা করো।' তবে তত্তচান যখন বলতো, 'এটা করতে চাই।' তখনই সে বলতো, 'ঠিক আছে।' আর তাকে এ-সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না করে যাতে তত্তচান তা করতে পারে তার মা সে ব্যবস্থা করতো।

'রাজহাঁসের হ্রদ'-এ যাতে সে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নাচতে পারে এ-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দুরু দুরু বুকে সে স্টুডিওতে যেতো। তবে সে শিক্ষকের শেখানোর পদ্ধতি ছিলো অন্য রকম। তোমোএ স্কুলে করা ইউরিদ্‌মিক্স ছাড়াও এখানে পিয়ানো ও রেকর্ডের সুরের তালে তালে 'পাহাড়ের আকাশ পরিষ্কার' এ-কথা বলে যখন তারা পায়চারী করে এগুতো,

তখন শিক্ষক হঠাৎ বলে উঠতো, 'ভঙ্গি!' তখন ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ পছন্দসই ভঙ্গি করে নিশ্চলভাবে থেমে যেতো। শিক্ষকও 'ভঙ্গি' বলার পরে 'আহা!' বলে চিৎকার করে 'আকাশের দিকে তাকানোর ভঙ্গি'-তে বা কখনো কখনো 'যন্ত্রণাকাতর লোকের' মতো দুই হাতে মাথা ধরে উবু হয়ে বসতো।

তবে তত্তচানের মনে ছিলো চকচকে মুকুট ও শাদা ফিনফিনে পোশাক পরা রাজহাঁসের ছবি। তার মনে 'পাহাড়ের আকাশ পরিষ্কার' বা 'আহা!'-র কোনো স্থান ছিলো না।

সাহস করে একদিন তত্তচান শিক্ষকের কাছে গেলো। সে শিক্ষক পুরুষ। তবে তার মাথার সামনের চুল বব করে ছাঁটা আর একটু কোঁকড়ানো ছিলো। তত্তচান তার হাত দুটি ছড়িয়ে রাজহাঁসের মতো ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বললো, 'এ-রকম শেখাবে না?'

উঁচু নাক, ডাগর চোখ ও সুন্দর চেহারার শিক্ষক বললো, 'এখানে এ রকম শেখাবো না।'

...তার পর থেকে ওই শিক্ষকের স্টুডিওতে তত্তচানের যাওয়া দিনদিন কমতে লাগলো। ব্যালে জুতো না পরে খালি পায়ে লাফিয়ে ঘুরে ফিরে নিজের মনের মতো ভঙ্গি করতে তত্তচানের সত্যিই ভালো লাগতো। তবে যে-কোনো উপায়ে চকচকে ছোট মুকুট পরার তার খুব শখ ছিলো।

বিদায় নেয়ার সময় শিক্ষক বললো, 'রাজহাঁসের হ্রদ নাচও খুব ভালো, তবে নিজেনিজে নাচ বানিয়ে নাচতে তোমার ভালো লাগে না?'

এ শিক্ষকের নাম ইশিই বাকু। সে জাপানে মুক্ত ব্যালের প্রতিষ্ঠাতা। এই ক্ষুদ্র এলাকার তোও-ইয়োকো-সেন লাইনের ট্রেন যে-স্টেশনে থামে, তার নাম জিইয়ূগাওকা (স্বাধীনতা পাহাড়) এ শিক্ষকই দিয়েছে। এ-সব কথা তত্তচান বড় হওয়ার পর জানতে পারে। তখন পঞ্চাশ বছরের ইশিই বাকু ছোট তত্তচানকে মনেপ্রাণে স্বাধীনভাবে নৃত্যের আনন্দ তালিম দেয়ার চেষ্টা করছিলো।

ক্ষেতের শিক্ষক

'শোনো। এ তোমাদের আজকের শিক্ষক। তোমাদের সব কিছু শেখাবে।'

এ-কথা বলে প্রধান শিক্ষক একজন শিক্ষকের সঙ্গে সবাইকে পরিচিত করিয়ে দিলো। তত্তচান তাকে ভালো করে দেখলো। প্রথমে তার চোখে পড়লো ওই শিক্ষকের পোশাক অন্য রকম। সে পরে ছিলো ডোরাকাটা হান্‌তেন্‌ কিমোনো। ফলে বুকের ভেতর থেকে অন্তর্বাস দেখা যাচ্ছিলো। টাইয়ের বদলে তার গলায় ঝুলছিলো তোয়ালে। সে আঁটসাঁট পাচিচ-প্যান্টের মতো গাঢ় নীল রঙের চোস্ত পাজামা পরেছে। সে পায়ে জুতো না পরে শ্রমিকের মতো মোটা কাপড়ের পাদুকা পরেছে। তার মাথায় ছিলো একটা ছেঁড়াফাটা খড়খুটোর হ্যাট।

তত্তচানরা তখন কুহোন্‌বুৎসু পুকুরের পাড়ে ছিলো।

কিছুক্ষণ ভালোভাবে শিক্ষককে দেখার পর তত্তচান বুঝতে পারলো সে তাকে আগে কোথাও দেখেছে। (কোথায়? কোথায়? ...)

তার মুখের রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। মুখে রেখা পড়লেও তাকে কোমল স্বভাবের বলে মনে হচ্ছিলো। কোমরে বেল্টের মতো বাঁধা কালো দড়িতে ঝোলানো তামাক খাওয়ার সরু পাইপও কেন যেন চেনা মনে হয় ...।

'পেয়েছি!'—তত্তচানের মনে পড়লো। তত্তচান অত্যন্ত খুশি হয়ে বললো, 'আচ্ছা, নদীর ধারের ক্ষেতে যে সব সময় কাজ করে তুমি সেই চাষী নও?'

মোটা কাপড়ের জুতো পরা সেই শিক্ষক শাদা দাঁত বের করে সারা মুখ রেখায় ভরে হাসতে হাসতে বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো। তোমরা সবাই কুহোন্‌বুৎসু মন্দিরে হাঁটাহাঁটি করতে যাওয়ার সময় আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাও। ওখানে যে শর্ষে ফুলের ক্ষেত দেখা যায় ওটা আমার ক্ষেত।'

'বাহ্‌! তুমি আজ আমাদের শিক্ষক?!' তত্তচানরা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

দেখতে বিনয়ী স্বভাবের লোকটি হাত দুলিয়ে বললো, 'না, না, আমি শিক্ষক নই, চাষী। প্রধান শিক্ষক আজ আমাকে অনুরোধ করেছে।'

প্রধান শিক্ষক চাষীর পাশে দাঁড়িয়ে বললো, 'না, এখন জমিচাষের কৌশল সবাই তোমার কাছ থেকে শিখবে, তাই তুমি জমিচাষ শেখানোর শিক্ষক। রুটি তৈরির কৌশল শেখানোর সময় রুটিঅলাকে যেমন শিক্ষক হতে বলবো, একই কথা। এখন ছেলেমেয়েদের কী করতে হবে বলে শুরু করো।'

মনে হয় অন্যান্য স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের কোনো কিছু শেখানোর জন্য 'শিক্ষকের যোগ্যতা' সম্পর্কে নানা রকম নিয়ম আছে, তবে কোবাইয়াশি স্যার সে-সব পাত্তা দিতো না। তার কাছে বড় কথা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের 'খাঁটি জিনিস' শেখানো।

ক্ষেতের শিক্ষক বললো, 'তাহলে শুরু করা যাক।'

তারা সবাই যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেটা ছিলো কুহোন্‌বুৎস পুকুরের ধারের বেশ একটা নীরব অংশ। পুকুরের ওপর গাছের ছায়া পড়ে খুব মনোরম হয়ে উঠেছিলো জায়গাটি। প্রধান শিক্ষক একখানা ট্রেন কামরার অর্ধেক সেখানে আগে নিয়ে রেখেছিলো, তার ভেতরে ছিলো বেলচা, কোদাল ও ক্ষেতের কাজের জন্য অন্যান্য দরকারী যন্ত্রপাতি। যে জায়গাটি চাষ করা হয় তার ঠিক মাঝখানে ছিমছামভাবে রাখা ছিলো ট্রেনের আধা-কামরাটি।

ক্ষেতের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের ট্রেন কামরা থেকে বেলচা ও কোদাল বের করতে বললো আর সে প্রথমে আগাছা তুলে ফেলতে শুরু করলো। আগাছা সম্পর্কে শিক্ষক বললো, 'আগাছা সহজে মরে না।' আর 'কোনো কোনো আগাছা শস্যের চেয়ে তাড়াতাড়ি বড় হয়, সেই জন্য শস্যের ওপর রোদ পড়ে না।' আর 'আগাছা ক্ষতিকর পোকা মাকড়ের জন্য উত্তম আশ্রয়স্থল।' আর 'আগাছা মাটির পুষ্টি শুষে নেয়, শস্যের ক্ষতি হয়।' সে একের পর এক এমন কথা বললো। কথা বলতে বলতে হাত না থামিয়ে সে আগাছা তুলে নিচ্ছিলো। সবাই তার মতো আগাছা তুলতে লাগলো। তারা কী ভাবে হাল দিতে হয়, কী ভাবে বীজতলা তৈরি করতে হয়, মুলো ও অন্যান্য বীজ কী ভাবে ছড়াতে হয়, কী ভাবে সার দিতে হয়

ইত্যাদি দরকারী কাজ করে দেখাতে দেখাতে সে ব্যাখ্যা করলো। এর মাঝে একটা ছোট সাপ মাথা তুলে ওপরের শ্রেণীর তাআচানের হাতে প্রায় কামড় বসিয়ে দিচ্ছিলো। তবে ক্ষেতের শিক্ষক তাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, 'এখানকার সাপ বিষাক্ত নয়, আর আমরা তাদের কিছু না করলে তারাও কিছু করবে না।'

যাই হোক, ক্ষেতের শিক্ষক শুধু জমিচাষের কৌশল শেখালো না, সাথে সাথে সে পোকামাকড়, প্রজাপতি, আবহাওয়া সম্পর্কে নানা রকম মজার গল্প বললো। তার বলিষ্ঠ গিঁট-ভরা হাত দুটি প্রমাণ দিচ্ছিলো যে, সে ছেলেমেয়েদের যা-কিছু বললো তার সবই সে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন করেছিলো। অবশেষে যখন শিক্ষকের সাহায্যে ক্ষেতে চাষ শেষ হলো, তখন সবাই ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে। যে-কোনো স্থান থেকে দেখলেও ...একটু আঁকাবাঁকা ভাবে চাষ করা হয়েছিলো... তবে ক্ষেতে চাষ দেয়া বেশ নিখুঁত হয়েছিলো।

সে দিন থেকে যখনই ওই লোকটির সাথে তোমোএ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা হতো, এমন কি সে দূরে থাকলেও তারা তাকে ক্ষেতের শিক্ষক বলে শ্রদ্ধার সাথে ডাকতো। কোনো কোনো সময় ক্ষেতের শিক্ষক নিজের ক্ষেতে ছড়ানোর পর যে-সার বেচে যেতো, সেটুকু স্কুলের ক্ষেতে ছড়িয়ে দিতো। ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেতের ফসল ঠিক মতো বাড়লো। প্রত্যেক দিন কোনো একসময় ক্ষেত দেখতে যেতো, ক্ষেতের অবস্থা প্রধান শিক্ষক ও সবাইকে জানাতো। 'নিজের হাতে ছড়ানো বীজ থেকে চারা গজিয়ে উঠেছে'—এ-কথাটা কতো রহস্যময়, বিস্ময়কর ও আনন্দের, এটা তারা সবাই অনুভব করলো। যখনই তারা কয়েকজন একত্র হতো, তখনই ক্ষেতের ফসলের উন্নতি নিয়ে আলাপ করতো।

তখন পৃথিবীর নানা জায়গায় একটু একটু করে নানা রকম ভয়ানক ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। তবে পরম সুখের বিষয় হলো এ ছোট ক্ষেত সম্পর্কে ছেলেমেয়েরা গুরুত্বের সঙ্গে আলাপ করছিলো, এবং তারা ছিলো শান্তির ঠিক কেন্দ্রস্থলে।

মাঠের রান্না

ছুটির পর তত্তচান স্কুলের গেট দিয়ে বের হলো। কাউকে কোনো কথা না বলে, 'বিদায়' না বলে মুখে কিছু কথা আওড়াতে আওড়াতে দ্রুত বেগে জিইয়ুগাওকা স্টেশন পর্যন্ত এলো। তখন সে যেন কৌতুক কাহিনীর মতো 'তোদোরোকিকেইকোকুহান্‌গোস্থইসান্‌' (তোদোরোকি উপত্যকায় মাঠের রন্ধন) এমন কঠিন শব্দগুলো আওড়াচ্ছিলো। কেউ যদি তার কাছে এসে বলে, 'জুগেমু জুগেমু গোকোনো স্থরিকিরে', তাহলে নিশ্চয়ই হঠাৎ 'তোদোরোকিকেইকোকুহানগোস্থইসান' ভুলে যাবে। কিংবা রাস্তার জল-কাদা জমে যাওয়া স্থানের ওপর দিয়ে 'এই পার হলাম।' বলে যদি লাফ দেয়, তাহলেই সব গোলমাল হয়ে যাবে। তাই সে ভাবলো কথাটা বার বার আওড়ানো ভালো। কৃতজ্ঞতার কথা, ট্রেনে তার সঙ্গে কেউ কথা বললো না, আর সে যথাসাধ্য চেষ্টা করলো যাতে সে মজাদার কিছু দেখতে না পায়। তাই এমন কোনো ঘটনা ঘটলো না যাতে সে বিস্মিত হতে পারে এবং এ ভাবে সে বাসায় ফেরার স্টেশনে নামলো। তবে সে যখন বের হলো, তখন স্টেশনের একজন চেনা লোক তাকে বললো, 'তুমি ফিরে এসেছো।' তত্তচান ভাবলো সে বলবে, 'এই এলাম।' তবে সে 'এই এলাম মাঠের রন্ধন' এমন জট পাকানো কথা প্রায় বলে ফেলেছিলো। তাই ডান হাতে 'বাই বাই' করে বাঁ হাতে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ চেপে ধরে এক দৌড়ে বাসায় ফিরে এলো।

বাসায় পৌঁছার সাথে সাথে তত্তচান দরোজার কাছ থেকেই মাকে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বললো, 'তোদোরোকিকেইকোকুহান্‌গো-স্থইসান্‌!'

মুহূর্তের জন্য মায়ের মনে হলো তত্তচান যেন সাত চল্লিশজন প্রভুহীন সামুরাইয়ের আক্রমণ করার হুঙ্কার বা জুডো হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করতে যাওয়ার হুঙ্কার নকল করছে। তবে মা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলো 'তোদো-রোকি-কেইকোক্‌ হান্‌গো-স্থইসান্‌।'

তোদোরোকি স্টেশন তত্তচানের প্রাইমারি স্কুলের জিইয়ুগাওকা স্টেশন থেকে তিন স্টেশনের পরের স্টেশন। টোকিও-র সুন্দর স্থানগুলোর

অন্যতম "তোদোরোকি উপত্যকা" সেখানে। সেখানে আছে জলপ্রপাত, ছোট নদী এবং সুন্দর বন। মা বুঝলো সেখানে ছেলেমেয়েরা রান্নাবান্না করে খাবে।

(তবুও) মা ভাবলো। (এতো কঠিন শব্দ সে মনে রেখেছে! আগ্রহ থাকলেই শুধু ছেলেমেয়েরা ঠিক মতো মনে রাখে।)

অবশেষে তত্তচান এতো কঠিন শব্দ মুখস্থ রাখা থেকে মুক্তি পেলো। সে তার মাকে সব কিছু একের পর এক বলতে লাগলো। সামনের শুক্রবার সকালে সবাই স্কুলে জড়ো হবে। সাথে নিয়ে যেতে হবে ভাতের বাটি, চপস্টিক, স্যুপের বাটি ও এক-গো চাল। শিক্ষক যে-কথা বলেছিলো তত্তচান তা তার মাকে বলতে ভুললো না—'শিক্ষক বলেছে—এক-গো চাল হচ্ছে এক বাটি চাল। আর তা সিদ্ধ করলে দু'বাটি ভাত হবে।' তা ছাড়া শুয়োরের মাংসের স্যুপ তৈরি করা হবে, তাই শুয়োরের মাংস ও শাকসব্জি আর নাশতাও একটু নেয়া যেতে পারে।

সেই দিন থেকে রান্নাঘরে মা'র সাথে লেগে থেকে কীভাবে ছুরি দিয়ে সব্জি কাটতে হয়, কড়াই ধরতে হয় ও ভাত বাড়তে হয় ইত্যাদি সে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলো। মাকে কাজ করতে দেখতে খুব ভালো লাগলো। তবে তার সবচেয়ে পছন্দ হলো মা যখন কড়াইর ঢাকনা হাতে ধরে 'ইস্‌, কী গরম! ...' বলে সে হাত দিয়ে তাড়াহুড়ো করে কানের লতি ধরলো।

মা বললো, 'কানের লতি ঠাণ্ডা, তাই ধরলাম।'

তত্তচানের মনে হলো এ-ভঙ্গি মহিলাসুলভ ও রান্নায় দক্ষ মানুষের ভঙ্গি। তাই সে ঠিক করলো আমিও তোদোরোকি উপত্যকার মাঠে রান্নার সময় অমন করবো।

অবশেষে সেদিনটি এলো। সবাই ট্রেন থেকে নেমে তোদোরোকি উপত্যকায় পৌঁছুলো। প্রধান শিক্ষক দেখলো বনের মধ্য ছাত্রছাত্রীরা খেলছে। উঁচু গাছের ফাঁক দিয়ে এসে পড়া সূর্যের আলোর মধ্যে তাদের মুখ চকচক করছিলো ও মিষ্টি দেখাচ্ছিলো। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে পিঠের ওপর ভরা ব্যাগ নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কথা শোনার অপেক্ষা করছিলো। ছাত্ররা যেখানে অপেক্ষা করছিলো ঠিক তার পেছনেই

প্রচণ্ড বেগে বিখ্যাত একটা জলপ্রপাতের পানি ঝরছিলো আর তাতে সৃষ্টি হয়েছিলো মধুর মূর্ছনা।

শিক্ষক বললো, 'এসো, আমরা কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে শিক্ষকেরা যে ইঁট নিয়ে এসেছে সেগুলো দিয়ে প্রথমে চুলো বানাই। তারপর সব কাজ ভাগাভাগি করে করি। কয়েকজন নদীর পানিতে চাল ধুয়ে এনে রান্না চড়াও। তার পর শুয়োরের মাংসের স্যুপ তৈরি করবো। এসো, শুরু করি!'

পাথর-কাগজ-কাঁচি খেলার এবং অন্যান্য উপায়ে ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটা দলে ভাগ করা হলো। সারা স্কুলের ছাত্রছাত্রী পঞ্চাশজনেরও কম, তাই

তাড়াতাড়ি তাদের ছয়টি দলে ভাগ করা হলো। মাটি খুঁড়ে গোল করে ইঁট বসিয়ে চুলো তৈরি করা হলো। তার ওপর লোহার সরু শিকের মতো জিনিস বসিয়ে স্যুপ ও ভাতের কড়াই বসানোর ব্যবস্থা করা হলো। এর মাঝে কয়েকজন বনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জ্বালানি কাঠ নিয়ে এলো আর কয়েক-জন গেলো নদীতে চাল ধুতে। ভাগাভাগি করে তারা নানা কাজ করলো। তত্তচান নিজের আগ্রহে শাকসব্জি কুটলো আর শুয়োরের মাংসের স্যুপ তৈরি করারও ভার নিলো। তত্তচানের চেয়ে দু'শ্রেণী ওপরের একটি ছেলেও শাকসব্জি কোটার ভার নিলো। তবে তার কোটা টুকরোগুলোর কোনোটা বেশি বড় আর কোনোটা ছোট—এবড়োখেবড়ো আকারের। তবে ছেলেটি নাকের ডগা ঘামিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলছিলো। তত্তচান তার মায়ের মতো নিপুণভাবে কুটলো সকলের নিয়ে আসা বেগুন, আলু, পেঁয়াজ পাতা ও বার্ডোক ইত্যাদি; টুকরোগুলো এমন সাইজের হলো যাতে সহজে মুখে দেয়া যায়। তার পর হঠাৎ মনে পড়ায় সে শসা ও বেগুন পাতলা করে কেটে নুন দিয়ে মেখে এমনকি আচারও তৈরি করলো। আর মাঝে মাঝে রান্না নিয়ে বিপদগ্রস্ত ওপরের শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 'এমনভাবে করে দেখো' বলে পরামর্শ দিচ্ছিলো। এমনকি তার মনে হচ্ছিলো যেন সে একজন মা। তত্তচানের আচার খেয়ে সবাই মুগ্ধ হলো। তত্তচান কোমরে দু'হাত রেখে বিনীত ভাবে বললো, 'আচার বানানোর একটু চেষ্টা করেছি মাত্র।'

স্যুপ বানানোর সময় সকলকে জিজ্ঞেস করা হলো তার স্বাদ কেমন হবে। প্রত্যেক দল থেকে 'আহ্!' 'বাহ্!' ও 'না, না—' ইত্যাদি ধরনের হাসির আওয়াজ উঠছিলো। সঙ্গে বনের নানা রকমের পাখিও তাদের সঙ্গে হৈচৈ করার মতো কিচিরমিচির করছিলো। প্রত্যেক কড়াই থেকে সুগন্ধ উঠছিলো। তখন পর্যন্ত অধিকাংশ ছেলেমেয়ে নিজেদের বাসায় কড়াইর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কখনো তাকায় নি আর কখনো চুলোর আগুন নিজ হাতে বাড়ায় কমায় নি। তারা সাধারণত অভ্যস্ত ছিলো টেবিলে পরিবেশন করা খাবার খেতে। তাই তারা জানতে পারলো এমনভাবে নিজ হাতে রান্না করার আনন্দ ও বিপদ, আর রান্না শেষ হওয়া পর্যন্ত নানা ধরনের জিনিস কী ভাবে বদলে যায়। এ ছিলো তাদের কাছে বড় আবিষ্কার। শেষে প্রত্যেক চুলোর রান্না শেষ হলো। প্রধান শিক্ষক

ছেলেমেয়েদের ঘাসের ওপর গোল হয়ে বসতে বললো। প্রত্যেক দল নিজেদের সামনে স্যুপ ও ভাতের কড়াই নিয়ে গেলো। তবে তত্তচানের আগে থেকে ঠিক করা সেই ভঙ্গি—কড়াইর ঢাকনা খুলে 'ইস্, কী গরম!...' বলে হাত দিয়ে নিজের কানের লতি ধরার ভঙ্গি করা পর্যন্ত তার দলকে অপেক্ষা করতে হলো।

তত্তচান যখন একটু বাড়িয়ে 'ইস্, কী গরম!' বলে ভঙ্গি করার পর বললো, 'এখন ঠিক আছে।' তার দলের ছেলেমেয়েরা ব্যাপারটা না বুঝলেও ভাত ও স্যুপের কড়াই নিজেদের জায়গায় নিয়ে গেলো। কানের লতি ধরার ভঙ্গি দেখে কেউ বললো না, 'চমৎকার!' তবে তত্তচান তৃপ্তি পেলো।

তারা সবাই নিজের সামনে ধোঁয়া ওঠা ভাত ও স্যুপের বাটির দিকে তাকালো। তাদের খুব খিদে পেয়েছিলো। তা ছাড়া সেগুলো তারা নিজ হাতে রেঁধেছিলো—সেটাই বড়ো কথা।

'ভালো করে চিবাও খাবারের জিনিস...' এ গানের পর তারা সবাই বললো, 'শুরু করছি।' তার পর বনের ভেতর হঠাৎ নীরবতা নেমে এলো। তখন শুধু শোনা যাচ্ছিলো জলপ্রপাতের শব্দ।

'আসলে তুমি ভালো মেয়ে!'

প্রধান শিক্ষক যখনই তত্তচানকে দেখতো, তখনই বলতো, 'তুমি আসলে ভালো মেয়ে!' তত্তচান সব সময় মৃদু হাসি হেসে একটু লাফ দিতে দিতে উত্তর দিতো 'হুঁ, তাই। আমি ভালো মেয়ে!' আর সে নিজেও নিজেকে ভালো মেয়ে বলে মনে করতো।

তত্তচান অবশ্যই নানা দিক দিয়ে ভালো মেয়ে ছিলো। সে ছিলো সকলের প্রতি দয়ালু। বিশেষ করে অন্য স্কুলের ছেলেরা কখনো তার দৈহিক প্রতিবন্ধী বন্ধুদের বিরক্ত করতো, তখন সে তাদের জড়িয়ে ধরতো। এতে যদি ব্যথাও পেয়ে তাকে কাঁদতেও হতো তবুও সে বন্ধুদের সাহায্য করার চেষ্টা করতো। কোনো আহত প্রাণী তার চোখে পড়লে সে মনপ্রাণ দিয়ে তার শুশ্রূষা করতো। আবার যখন সে কোনো অদ্ভুত জিনিস দেখতো ও মজাদার কথা শুনতো তখনই সে নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য এমন অনেক ঘটনা ঘটাতো যাতে শিক্ষকেরা বিস্মিত হতো। যেমন, সকালে স্কুল মাঠে জড়ো হওয়ার পর প্যারেড করার সময় তত্তচান চুলের বেণীর দুটি প্রান্ত পেছনের দিক থেকে দুই বগলের নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে সামনের দিকে বের করে সবাইকে দেখাতে দেখাতে হাঁটতো। তত্তচানের যখন ঝাড়ু দেয়ার পালা আসে, তখন সে ট্রেন ক্লাসঘরের মেঝের ঢাকনাটি খুলে ওপরে তোলে... ওটা যখন আসল ট্রেন ছিলো তখন ওই ঢাকনাটি খুলে মোটর পরীক্ষা করা হতো। তত্তচানের তীক্ষ্ণ চোখ ঢাকনাটির ওপর পড়লো আর সেটি খুলে সে ঝাড়ু দেয়া ময়লা ফেললো। কিন্তু বন্ধ করার চেষ্টা করলেও সেটা বন্ধ হলো না। তাই হৈচৈ পড়ে গেলো। আরেক দিন তত্তচান কারো কাছে শোনে যে, গরুর মাংসের বড় বড় খণ্ড হুক দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তখন সে ব্যায়াম করার সবচেয়ে উঁচু লোহার দণ্ড এক হাত দিয়ে ধরে সকাল থেকে ঝুলতে থাকে এবং অনেকক্ষণ ধরে ওই অবস্থায় থাকে। একজন শিক্ষিকা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে?' তখন তত্তচান চিৎকার করে বলে, 'আজ আমি গরুর মাংস।' বলার সাথে সাথে সে নিচে পড়ে যায়। 'উহ্' বলে আর্তনাদ করার পর সারা দিনের জন্য তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। একদিন দুপুরের বিরতির সময় সে স্কুলের পেছনে পায়চারী করছিলো। রাস্তায় পড়েছিলো একটা খবরের কাগজ। সেটা দেখে খুব খুশি হয়ে লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ড বেগে ছুটে গিয়ে সে খবরের কাগজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কাগজটার নিচে ছিলো টয়লেটের আবর্জনা ট্যাঙ্কের মুখ। গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে বলে কংক্রিটের ঢাকনাটি সরিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করার লোকটি খবরের কাগজ দিয়ে ট্যাঙ্কের মুখ ঢেকে রেখেছিলো। তাই তত্তচান ট্যাঙ্কের ভেতরে 'ঝপ!' করে বুক পর্যন্ত ডুবে গেলো। এভাবে সে প্রায়ই আহত হতো। তবে যখন এমন ঘটনা ঘটতো, প্রধান শিক্ষক কখনো তত্তচানের মা-বাবাকে স্কুলে ডেকে পাঠাতো না। অন্যান্য ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রেও তাই। সব সময়

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা বসে তার মিটমাট করতো। তত্তচানের স্কুলে প্রথম আসার দিন যেমন প্রধান শিক্ষক চার ঘণ্টা ধরে তত্তচানের কথা শুনেছিলো, তেমনভাবে ছাত্রছাত্রীরা কোনো ঘটনা ঘটালে তাদের প্রত্যেকের কথা শুনতো। এমন কি তারা যে সমস্ত অজুহাত দেখাতো, তাও সে শুনতো। আর যখন কোনো ছেলে সত্যিই কোনো খারাপ কাজ করতো, এবং নিজের দোষ স্বীকার করতো, তখন প্রধান শিক্ষক বলতো, 'মাফ চাও।' তবে ছাত্রছাত্রীদের মা-বাবা ও শিক্ষকদের কাছ থেকে তত্তচান সম্পর্কে অভিযোগ ও উদ্বেগের কথা প্রধান শিক্ষকের কানে অব্যশই পেঁছিতো। তাই প্রধান শিক্ষক সুযোগ পেলেই তত্তচানকে বলতো, 'তুমি আসলে ভালো মেয়ে।' ওই কথা যদি কোনো বয়স্ক লোক মনোযোগ দিয়ে শুনতো, তাহলে সে বুঝতো যে 'আসলে' শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'কেউ কেউ মনে করে অনেক ব্যাপারে আমি ভালো মেয়ে নই, তবে তোমার আসল স্বভাব খারাপ নয়, বরং বেশ ভালো, তা আমি ভালো করে জানি।'—প্রধান শিক্ষক কোবাইয়াশি স্যার এ-কথা বলতে চেয়েছিলো। দুঃখের কথা হচ্ছে তত্তচান যখন আসল অর্থটি বুঝতে পারলো, তখন কয়েক দশক কেটে গেছে। তবে এ-কথা সত্য যে তত্তচান আসল অর্থ না বুঝলেও প্রধান শিক্ষক তত্তচানের মনের গভীর তলে সে ভালো মেয়ে বলে আত্মবিশ্বাস জন্মিয়েছিলো। কারণ যখনই সে কোনো কিছু করতো তখনই শিক্ষকের এই কথা তার মনে পড়তো। তবে কোনো কিছু করার পর মাঝে মাঝে তত্তচান বলে উঠতো, 'আরে?'

তোমোএ স্কুলে পড়ার সময় প্রধান শিক্ষকের সব সময় গুরুত্বপূর্ণ এ কথাটি সম্ভবত স্থির করে দিয়েছিলো তত্তচানের সারাটি জীবনকে—'তত্তচান, তুমি আসলে ভালো মেয়ে।'

বউ

আজ তত্তচানের খুব দুঃখ হলো।

তত্তচান এখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। সহপাঠী তাইচানকে তার খুব ভালো লাগতো। সে মেধাবী আর পদার্থবিদ্যায় খুব ভালো। সে বাসায় ইংরেজি শিখতো আর সেই প্রথম তত্তচানকে শিখিয়েছিলো 'খেঁকশিয়াল'-এর ইংরেজি।

'তত্তচান, খেঁকশিয়ালের ইংরেজি ফক্স।'

(ফক্স ... !)

সেই দিন সারা দিন তত্তচান "ফক্স" শব্দটির ধ্বনির মধ্য ডুবে গেলো। তাই সে প্রত্যেক দিন সকালে ট্রেন ক্লাসঘরে পেঁীছে, প্রথমেই তাইচানের পেন্সিল-বাক্সের সব পেন্সিল ছোরা দিয়ে সুন্দর করে কেটে দিতো। তত্তচান নিজের পেন্সিলের দিকে খেয়াল ছিলো না, নিজের পেন্সিল সে দাঁত দিয়ে কেটে ব্যবহার করতো।

আজ সেই তাইচান তত্তচানকে ডাকলো। তখন দুপুরের বিরতির সময়। তত্তচান মিলনায়তনের পেছনে ওই টয়লেটের ট্যাঙ্কের মুখের কাছে পায়চারী করছিলো।

তাইচান ডাকলো, 'তত্তচান!' তাইচানের কণ্ঠস্বর রাগী মনে হলো, তাই অবাক হয়ে তত্তচান থেমে গেলো। তাইচান একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'বড় হওয়ার পর তুমি বার বার অনুরোধ করলেও আমি তোমাকে আমার বউ করবো না।'

এতোটুকু বলে তাইচান নিচের দিকে তাকাতে তাকাতে হেঁটে চলে গেলো। তত্তচান তাইচানের মাথা ...মগজ ভরা, যাকে সে শ্রদ্ধা করে, 'অপ্রকৃত ভগ্নাংশ' ডাক নামের মাথা ...সে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত তার দিকে অবাক হয়ে তত্তচান তাকিয়ে রইলো।

তত্তচান তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাবছিলো। তার মনে হলো তার সঙ্গে রাগ করার মতো কিছু সে করে নি। অসহায় হয়ে তত্তচান সহপাঠী মিইয়োচানের সঙ্গে এ-নিয়ে আলাপ করলো। মিইয়োচান তত্তচানের কথা শুনে বয়স্ক মহিলার ভঙ্গিতে বললো, 'তাইচান ঠিকই করেছে। কারণ তুমি আজ সুমো কুস্তির ঘণ্টায় তাইচানকে রিঙের বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছিলে। তাইচানের মাথা ভারী, তাই সে রিঙের বাইরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। তাই তার রাগ করার কথা।'

তত্তচান মনের গভীর থেকে অনুতপ্ত হলো। সে ভাবলো তাই তো! এতো ভালোবেসে প্রত্যেক দিন যার পেন্সিল কেটে দিই, এ-কথা ভুলে কেন তাকে সুমো কুস্তির ঘণ্টায় ছুঁড়ে দিলাম ...? তবে এখন দেরি হয়ে গেছে। স্থির হয়ে গেলো তত্তচান আর তাইচানের বউ হতে পারবে না।

তত্তচান স্থির করলো তবে আগামীকাল থেকে আবার তার পেন্সিল কেটে দেবো।

কেননা আমি তাকে ভালোবাসি।

ভাঙাচোরা স্কুল

তত্তচানের আগের স্কুলে যেমন ছিলো তেমনভাবে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক সাথে গলা মিলিয়ে 'ছড়া গান' গাওয়া জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তত্তচান যে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলো, সেই আগের স্কুলে ছুটির পর গেট দিয়ে বেরিয়ে ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্কুল ভবনের দিকে তাকাতে তাকাতে এ-গান গাইতো;

'আকামাৎসু স্কুল, ভাঙাচোরা!
ভেতরে গিয়ে দেখলে কী চমৎকার স্কুল!'

ওই সময় আকস্মিকভাবে যদি অন্য স্কুলের ছেলেমেয়েরা সেখান দিয়ে যেতো, তবে তারা আকামাৎসু প্রাথমিক স্কুলের দিকে আঙুল দিয়ে সংকেত করতে করতে উচ্চকণ্ঠে এমনভাবে নিন্দা করতো;

'আকামাৎসু স্কুল চমৎকার!
ভেতরে গিয়ে দেখলে কী ভাঙাচোরা স্কুল। বা-হ্!!'

দালানটি নতুন না পুরোনো তা দেখে সম্ভবত ঠিক করা হতো ওটা 'ভাঙাচোরা' কি না। তবে এ-গানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে 'ভেতরে গিয়ে দেখলে ...'। এ-গান ছেলেমেয়েরা গাইতো। স্কুলের দালানটি ভাঙাচোরা হলেও 'ভেতরে গিয়ে দেখলে কী চমৎকার স্কুল!'—এ-কথাটিই ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। এ 'ছড়া' একা গাওয়া হতো না। যখন পাঁচ ছয় জনের মতো অনেকে একত্র থাকতো, তখন গাওয়া হতো।

আজ বিকেলের কথা। তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সবাই স্কুল ছুটির পর নিজ নিজ পছন্দ মতো খেলা করছিলো। স্কুলের শেষ ঘণ্টাকে তারা সবাই বলতো, "তাড়িয়ে দেয়ার ঘণ্টা"। এ-ঘণ্টা পর্যন্ত তারা নিজ নিজ পছন্দ মতো যা-কিছু করতে পারতো। প্রধান শিক্ষকের ধারণা ছিলো এমন একটা মুক্ত ঘণ্টা রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে-সময় ছেলেমেয়েরা পছন্দ মতো যা-কিছু করতে পারে। তাই স্কুল ছুটির পর এ ঘণ্টার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিলো অন্যান্য প্রাথমিক স্কুলের চেয়ে একটু বেশি সময়।

কোনো কোনো ছেলে স্কুল-মাঠে বল খেলছিলো, কেউ কেউ ব্যায়াম করা লোহার দণ্ডের ওপর উঠছিলো বা বালি ছড়ানো জায়গায় কর্দমাক্ত

হচ্ছিলো। কেউ কেউ পরিচর্যা করতো ফুল বাগান। ওপরের শ্রেণীর কোনো কোনো মেয়ে ছোট ধাপের ওপর বসে কথা বলছিলো। তা ছাড়া কোনো কোনো ছেলে গাছে চড়ছিলো তারা সবাই যার-যা-ইচ্ছে তাই করছিলো। তার মধ্যে কয়েকজন তাইচানের মতো ক্লাসঘর থেকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার পরীক্ষা করছিলো—কাঁচের পাত্রে তাপ দিয়ে বুদবুদ বানাচ্ছিলো ও টেস্টটিউবে এটাসেটা করার চেষ্টা করছিলো। পাঠাগারে কয়েকজন ছেলেমেয়ে বই পড়ছিলো। আর আমাদেরা যে জীবজন্তু পছন্দ করতো, সে রাস্তা থেকে একটা বেড়াল কুড়িয়ে এনে ওলট পালট করে তার কানের ভেতরটা দেখছিলো। যাই হোক, সবাই আনন্দ পাচ্ছিলো।

এমন সময় হঠাৎ স্কুলের বাইরে উঁচু গলায় 'ছড়া' শোনা গেলো ;

'তোমোএ স্কুল ভাঙাচোরা !
ভেতরে গিয়ে দেখলেও ভাঙাচোরা !'

আশ্চর্য !—তত্তচানের মনে হলো। সে সময় তত্তচান স্কুল গেটের (ওটা আসল গেট নয়, ওটা শেকড়অলা পাতাভরা গাছ) পাশে ছিলো, তাই ভালো করে সে ওই গান শুনতে পেলো।

আশ্চর্য। তারা বললো বাইরে ও ভেতরে সব জায়গায় 'ভাঙাচোরা !'

অন্যান্য ছেলেমেয়ের মনেও এমন অনুভূতি হলো, তাই তারা গেটের দিকে ছুটে এলো। তখন অন্য স্কুলের ছেলেরা 'ভাঙাচোরা স্কুল। বা-হ্ !!' বলে চিৎকার করতে করতে পালাতে লাগলো। তত্তচানের মনে জেগে উঠলো ঘৃণা মেশানো ক্রোধ। তাই ওই অনুভূতি শান্ত করার জন্য তত্তচান সেই ছেলেদের পেছনে ছুটে গেলো। একেবারে একা। তবে তারা খুব দ্রুত চলে গেলো আর চোখের পলকের মধ্যে তার পাশের গলিতে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তত্তচান দুঃখ পেয়ে পায়চারী করতে করতে স্কুলের দিকে ফিরতে লাগলো।

তখন কেন যেন তার মুখ থেকে গান বের হলো। সেটা এ-রকম ছিলো ;

'তোমোএ স্কুল চমৎকার !'

তার পর দু'পা এগিয়ে গিয়ে গাইলো,

'ভেতরে গিয়ে দেখলেও চমৎকার !'

তত্তচান এ-গানে তৃপ্তি পেলো। তাই যখন স্কুলে ফিরলো, তখন সে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য স্কুলের মেয়ের মতো বাইরে থেকে বেড়ার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে উঁচু কণ্ঠে গানটি গাইলো যাতে সবাই শুনতে পায় ;

'তোমোএ স্কুল চমৎকার !
ভেতরে গিয়ে দেখলেও চমৎকার !'

স্কুল মাঠের ছাত্রছাত্রীরা সবাই প্রথমে বুঝতে পারলো না কে গাইছে, তাই চুপ রইলো। তবে যখন বুঝলো ওটা তত্তচান, তখন সবাই মজা পেয়ে স্কুলের বাইরে এসে এক সঙ্গে ছড়া গাইতে শুরু করলো। অবশেষে তারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবং হাতে হাত ধরে সারি বেঁধে স্কুলের চারদিকে ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে সবাই এক স্বরে গাইলো। সত্যি কথা বলতে কী তাদের সুর যতটা এক তালে বাঁধা ছিলো তার চেয়ে বেশি এক তালে বাঁধা ছিলো তাদের মন। তবে তারা তা বুঝতে পারে নি, শুধু মজা পেয়ে আনন্দ পেয়ে সবাই বার বার ঘুরে ঘুরে স্কুলের চারদিক মার্চ করতে করতে তারা গাইলো ;

'তোমোএ স্কুল চমৎকার !
ভেতরে গিয়ে দেখলেও চমৎকার !'

ছাত্রছাত্রীরা মোটেও জানলো না যে প্রধান শিক্ষকের ঘরে প্রধান শিক্ষক কতো আনন্দ পেয়ে ওই গান শোনার জন্য কান পেতে আছে।

প্রত্যেক শিক্ষাবিদ বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করে এমন শিক্ষাবিদের কাছে প্রতিটি দিনই হচ্ছে একের পর এক উদ্বেগ আর তোমোএ স্কুল ছিলো সব দিকেই অদ্ভুত স্কুল। তাই যারা ভিন্ন শিক্ষানীতি পালন করতো তাদের নিন্দা থেকে এ-স্কুল রেহাই পেতো না। এমন পরিস্থিতিতে এ-ছাত্রছাত্রীদের কোরাস ছিলো প্রধান শিক্ষকের জন্য উত্তম উপহার।

ছেলেমেয়েরা ক্লান্ত না হয়ে অনেকক্ষণ ধরে বার বার গানটি গাইলো। সেই দিন "তাড়িয়ে দেয়ার ঘণ্টা" অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক দেরিতে বাজলো।

চুলের ফিতে

টিফিনের পর এক দিন দুপুরের বিরতির সময় এলো। তত্তচান যখন লাফালাফি করে মিলনায়তনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হলো। দেখা হলো বলা হলেও কিছুক্ষণ আগে সে তার সঙ্গে টিফিন খেয়েছে। যাই হোক, তত্তচানের উল্টো দিক থেকে স্যার আসছিলো, তাই তাঁর সাথে তত্তচানের দেখা হলো। প্রধান শিক্ষক তত্তচানকে দেখে বললো, 'ও, তুমি এখানে। একটা জিনিস তোমার কাছ থেকে জানতে চাই।'

সে কোনো কিছু স্যারকে জানাতে পারে এতে খুশি হয়ে তত্তচান জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা কী?'

স্যার তত্তচানের মাথার ফিতে দেখে বললো, 'তোমার এই ফিতে তুমি কোথায় পেয়েছো?'

এ-কথা শোনার সময় তত্তচানের মুখে আনন্দের সীমা ছিলো না। কারণ ওটা ছিলো তার নিজের খুঁজে পাওয়া চমৎকার জিনিস। গতকাল থেকে সে ওটা মাথায় পরে ছিলো। তত্তচান প্রধান শিক্ষকের আরো কাছে গেলো যাতে ফিতেটা আরো ভালো করে দেখতে পায়, সে গর্বের সুরে জানালো, 'এটা ফুফুর অনেক দিন আগের হাকামা (কিমোনো স্কার্ট)-তে লাগানো ছিলো। ফুফু যখন ওটা আলমারিতে রাখছিলো, তখন এটা আমার চোখে পড়ে। ফুফু বললো, "তত্তচানের চোখ খুব তীক্ষ্ণ।"

প্রধান শিক্ষক তত্তচানের কথা শুনে চিন্তা করার মতো বললো, 'তাই না কি। বুঝেছি।'

কিছু দিন আগে তার বাবার ছোট বোনের বাসায় যখন তত্তচান গিয়েছিলো, তখন সে গর্ব করার ফিতেটা পায়। ভাগ্যিস দেখতে পেলো তার নানা ধরনের কিমোনো বাইরে বাতাসে শুকোতে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটি ছিলো নীলচে বেগুনী রঙের হাকামা স্কার্ট। ওটি সে ছাত্রী থাকার সময় পরতো। ফুফু যখন সেটি ঘরে আনলো, তখন পলকের জন্য তত্তচানের চোখে পড়লো একটি সুন্দর জিনিস। 'আরে—ওটা কী?'

তত্তচানের এ-কথা শুনে ফুফু তার হাত থামালো। এ-ফিতেটা হচ্ছে সেই সুন্দর জিনিস; হাকামা স্কার্টের পেছনে কোমরের দিকে পাগাড়ের ডিজাইন করা শক্ত কাপড়টির সাথে ওটা লাগানো ছিলো। ফুফু তত্তচানকে বললো, 'এটা পেছনের দিক সুন্দর দেখানোর জন্য। কোমরের পেছন দিকে হাতে বোনা লেস্ লাগানো বা চওড়া ফিতে সুতো দিয়ে এঁটে বড় প্রজাপতির মতো গিঁট বাঁধা সেকালের ফ্যাশন ছিলো।'

তার কথা শুনতে শুনতে তত্তচান অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অনেকক্ষণ ফিতেটার ওপর হাত বুলোলো। ফিতেটাকে ছুঁয়ে দেখলো।

তা দেখে ফুফু বললো, 'তোমাকে দেবো। আমি এটা আর পরবো না।' এঁটে রাখা সুতোটি কাঁচি দিয়ে কেটে ফিতেটা তত্তচানকে দিলো। এভাবে ফিতেটা পেলো তত্তচান। ফিতেটা সত্যিই সুন্দর ছিলো। সেটি খুব ভালো রেশমী কাপড়ে তৈরি, গোলাপ ও নানা ধরনের নকশায় বোনা একটি ছবির মতো। কাপড়টা ছিলো চওড়া ও শক্ত। তাই গিঁট বাঁধলে তত্তচানের মাথার প্রায় সমান হয়ে যায়। ফুফু বলেছে ফিতেটা 'বিদেশী কাপড়ে তৈরি।'

কথা বলতে বলতে তত্তচান মাঝেমাঝে মাথা দুলিয়ে ফিতের ঘষা লাগার খস খস আওয়াজও শিক্ষককে শোনালো।

তার কথা শুনে শিক্ষক একটু অসুবিধায় পড়ার মতো মুখ-ভঙ্গি করে বললো, 'তাই না কি? গতকাল মিইয়ো বললো তত্তচানের মতো ফিতে চাই। তাই অনেকক্ষণ ধরে জিইয়ুগাওকার সব ফিতের দোকানে খোঁজ করলাম, কিন্তু পেলাম না। এটা বিদেশী জিনিস, তাই...'

তখন তার চেহারা প্রধান শিক্ষকের চেহারার মতো দেখাচ্ছিলো না, বরং মেয়ের মিনতিতে অসুবিধায় পড়া বাবার চেহারার মতো দেখাচ্ছিলো।

শিক্ষক তত্তচানকে বললো, 'তত্তচান, মিইয়ো আমাকে খুব বিরক্ত করছে, তুমি যদি এ-ফিতে না পরে স্কুলে আসো, তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো। তোমাকে এমন অনুরোধ করায় তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

তত্তচান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার হাত দুটি বুকের ওপর ক্রসের মতো করে বেশ তাড়াতাড়ি বললো, 'ঠিক আছে। আগামীকাল থেকে আর এটি পরে আসবো না।'

শিক্ষক বললো, 'তাই? তোমাকে ধন্যবাদ।'

তত্তচান একটু দুঃখ পেলো বটে, কিন্তু প্রধান শিক্ষক বিপদে পড়েছে, বিবেচনা করে সে রাজি হয়ে গেলো। আরেকটা কারণ হচ্ছে সে বয়স্ক পুরুষ মানুষ...তা ছাড়া আমার অনেক প্রিয় প্রধান শিক্ষক...সে ফিতের দোকানে প্রাণপণে ফিতে খুঁজেছে—এ-দৃশ্য কল্পনা করে তত্তচানের মনে ভীষণ দুঃখ হলো। সত্যিই তোমোএ স্কুলে সব বয়সের মানুষের মতো একে অন্যের অসুবিধা বুঝে সাহায্য করা নিজেদের অজ্ঞাতে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিলো।

পরদিন সকালে তত্তচানের স্কুল যাওয়ার পর যখন তার মা ঝাড়ু দেয়ার জন্য তত্তচানের ঘরে ঢুকলো তখন সে দেখলো তার প্রিয় বড়-সড়ো খেলনা ভালুকের গলায় ফিতেটা বাঁধা। যে ফিতে পরতে তত্তচান এতো আনন্দ পেতো সেটি পরা হঠাৎ ছেড়ে দেয়ায় মা বিস্মিত হলো। মা'র মনে হলো ধূসর রঙের ভালুকটি হঠাৎ ফিতে পরে সাজগোজ করে বলে লজ্জা পাচ্ছে।

আহতদের দেখতে যাওয়া

তত্তচান জীবনে আজ প্রথম হাসপাতালে গেলো, সেখানে বহু আহত সৈনিক থাকে। তারা প্রাথমিক স্কুলের জন ত্রিশেক ছাত্রছাত্রী এক সঙ্গে গেলো। তারা বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী একে অন্যকে চেনে না। মনে হয় সরকারী নির্দেশে এ-ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। সাধারণত প্রত্যেক স্কুল থেকে দুই তিন জন ছেলেমেয়ে পাঠানো হতো, তবে তোমোএ স্কুলের মতো যে-সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম সেগুলো থেকে একজন করে ছাত্রকে আহতদের দেখানোর জন্য হাসপাতালে নেয়া হতো। ত্রিশ জনের মতো একটি দল তৈরি করে কোনো স্কুলের একজন শিক্ষক হাসপাতালে নিয়ে যেতো। আজ তত্তচান তোমোএ স্কুলের প্রতিনিধি। আজ যে-শিক্ষিকা তাদের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পেয়েছে সে একজন চশমা পরা হালকা-পাতলা মহিলা। সেই শিক্ষিকা তাদের নিয়ে গেলো হাসপাতালের একটা কক্ষে। সেখানে রাতের শাদা পোশাক পরা জন পনেরো সৈন্য ছিলো। কয়েকজন বিছানায় শুয়ে আছে, কয়েকজন বিছানায় বসে আছে। তারা তত্তচানদের অভ্যর্থনা জানালো। আহত সৈনিকদের ক্ষতস্থানের কথা ভেবে তত্তচান উদ্বিগ্ন ছিলো, তবে তারা সবাই মৃদু হেসে হাত দোলাচ্ছিলো এবং কিছুটা সুস্থ বলে তত্তচানের উদ্বেগ কেটে গেলো। তবে কয়েকজন সৈনিকের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিলো। শিক্ষিকা ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ছেলেমেয়েদের জড়ো করে 'আমরা আপনাদের দেখতে এসেছি' বলে প্রথমে সৈন্যদের অভিনন্দন জানালো। ছেলেমেয়েরাও সবাই মাথা নত করলো।

শিক্ষিকা বলতে লাগলো, 'আজ পাঁচই মে, শিশু দিবস, তাই আমরা "রুই মাছ স্ট্রিমারের গান" গাইবো।' এ-কথা বলে তখনই সে কণ্ডাক্টরের মতো তার হাত উপরে তুলে ছেলেমেয়েদের বললো, 'আচ্ছা, তোমরা তৈরি? তিন! চার! শুরু করো।' বলে উৎসাহের সঙ্গে হাত দুলিয়ে নামালো। একে অন্যের কাছে অপরিচিত ছেলেমেয়েরা সবাই উঁচু গলায় এক সঙ্গে গাইতে শুরু করলো। 'ছাদের টালির ঢেউ, মেঘের ঢেউ...'

তবে তত্তচান এ-গান জানতো না। কারণ তোমোএ স্কুলে এ-ধরনের গান শেখানো হতো না। তত্তচান তখন বিছানায় বসা কোমল চেহারার একজন সৈনিকের বিছানার এক পাশে অমায়িকভাবে বসে হতবুদ্ধি হয়ে সবার গান শুনছিলো।

গান শেষ হলে শিক্ষিকা স্পষ্ট গলায় বললো, 'আচ্ছা, এবারে "পুতুল উৎসবের" গান।'

তত্তচান ছাড়া সবাই সুন্দরভাবে গানটি গাইলো। 'আলো জ্বালাবো লণ্ঠনে...'

চুপ করে থাকা ছাড়া তত্তচানের আর কোনো উপায় ছিলো না।

যখন তাদের গান গাওয়া শেষ হলো, তখন সৈন্যরা হাততালি দিলো।

শিক্ষিকা মৃদু হাসি হেসে বললো, 'সবাই শুনুন। এবার "ঘোড়া ও টাট্টু"-র গান। উৎসাহের সঙ্গে, তিন! চার! শুরু করো!' এ বলে সে গান পরিচালনা করতে লাগলো।

এ-গানও ছিলো তত্তচানের অজানা। যখন সবার এ-গান গাওয়া শেষ হলো, তখন তত্তচান যে সৈনিকের বিছানায় বসে ছিলো, সে তত্তচানের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো, 'তুমি গাইলে না।'

তত্তচানের নিজেকে অপরাধী মনে হলো। সে সৈনিকদের দেখতে এসেছে, তবে একটা গানও গাইতে পারলো না। তাই তত্তচান বিছানা থেকে উঠে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সাহস করে বললো, 'আচ্ছা, আমার জানা একটা গান গাইবো।'

আদেশ বহির্ভূত কাজ শুরু হওয়ায় শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কী করতে চাও?' তবে তত্তচান তখন গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে গান গাইতে উদ্যত, তাই মনে হয় শিক্ষিকা চুপ করে তার গান শোনার চেষ্টা করলো।

তত্তচান ভাবলো তোমোএ স্কুলের প্রতিনিধি হিসেবে তোমোএ-র সব-চেয়ে জনপ্রিয় গান সে গাইবে। তাই শ্বাস নিয়ে জোরে গাইতে লাগলো, 'ভালো করে চিবাও, খাবার জিনিস...'

পাশের কয়েকজন ছেলেমেয়ে হেসে উঠলো। কোনো কোনো ছেলে-মেয়ে পাশের ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করলো, 'কী গান? কী গান?'

শিক্ষিকা বুঝতে পারলো না সে কীভাবে গান পরিচালনা করবে, তাই সে তার হাত ওপরে তোলা অবস্থায় স্থির করে রাখলো।

তত্তচান লজ্জা পেলো, তবে প্রাণপণে গাইলো, 'চিবাও চিবাও চিবাও চিবাও খাবার জিনিস...'

গাওয়ার পর তত্তচান মাথা নুইয়ে নমস্কার করলো। যখন সে মাথা ওপরে তুললো ওই সৈনিকের চোখ থেকে অশ্রু পড়তে দেখে সে অবাক হলো। তত্তচানের বাবার চেয়ে একটু বেশি বয়স্ক সৈনিকটি আবার তত্তচানের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো, 'ধন্যবাদ', 'ধন্যবাদ।'

সে তত্তচানের মাথায় হাত বুলোতে থাকলো। তার চোখের জল বন্ধ হলো না।

তখন শিক্ষিকা হাসি মুখে সকলকে বললো, 'আচ্ছা, এখন সৈনিকদের উপহার হিসেবে যার যার লেখা পড়বো।'

ছেলেমেয়েরা একের পর এক নিজ নিজ লেখা পড়তে শুরু করলো। তত্তচান সৈনিকটির দিকে তাকালো। সৈনিকটি তার চোখ নাক লাল

করে হাসলো। তত্তচানও হাসলো। আর সে ভাবলো বেশ, সৈনিকটি হেসেছে।

কী কারণে সৈনিকটির চোখে অশ্রু এসেছিলো তা সে ছাড়া কেউ জানতো না। হয়তো সে বাড়িতে তত্তচানের মতো মেয়ে রেখে এসেছিলো বা তত্তচান এতো মনপ্রাণ দিয়ে গেয়েছিলো যে তার কাছে তত্তচানকে হয়তো অমায়িক ও মিষ্টি মনে হয়েছিলো। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে সে জানতো যে অল্প-দিনের মধ্যে তারা খাদ্যের অভাবে পড়বে, তবুও 'ভালো করে চিবাও' এ-গান গাইছে এ-কথা ভেবে হয়তো সে দুঃখ পেলো। হয়তো সৈনিকটি জানতো এই ছেলেমেয়েরা শিগ্‌গির জড়িয়ে পড়বে সত্যিকার ভয়াবহ ঘটনায়।

উপহার রচনা পড়ছিলো যে ছেলেমেয়েরা, তারা বুঝতে না পারলেও প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ তখন সকলের অজ্ঞাতে শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

স্বাস্থ্যের ছালবাকল

জিইয়ুগাওকা স্টেশনের টিকেট গেটের লোকটি তত্তচানের এখন খুব পরিচিত। তত্তচান তার গলায় রশি দিয়ে ঝোলানো পাসটি দেখিয়ে স্টেশন থেকে বেরুলো।

সেখানে এক মজার ঘটনা ঘটলো। একজন যুবক মাদুর পেতে আড়া-আড়িভাবে পা রেখে বসছিলো। তার সামনে পাহাড়ের মতো স্তূপ করে রাখা ছিলো গাছের ছালবাকলের মতো জিনিস। পাঁচ ছয় জন দর্শক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার কসরত উপভোগ করছিলো। তত্তচান সেখানে দাঁড়িয়ে গেলো। কারণ সে যুবক বললো, 'ভালো করে দেখো, ভালো করে দেখো।'

তত্তচান যখন সেখানে দাঁড়ালো, তখন যুবকটি বললো, 'মানুষের স্বাস্থ্যই সবচেয়ে মূল্যবান। সকালে উঠে শরীর ভালো আছে কি না তা পরীক্ষা করার

জন্য এ-গাছের ছাল। সকালে এ-ছালে কামড় দিলে যদি তেতো লাগে..., তাহলে তা প্রমাণ করে যে তুমি অসুস্থ। আর যদি কামড় দিলে তেতো না লাগে, তাহলে বুঝবে তুমি ভালো আছো, অসুস্থ নও। মাত্র ২০ সেনে এ-ছাল তোমার স্বাস্থ্য বলে দেবে। ম্যাডামরা শুনুন, একটু কামড় দিয়ে দেখুন।'

এক কৃশ লোক তার হাতে দেয়া গাছের ছালে ভয়ে ভয়ে সামনের দাঁত দিয়ে কামড় দিলো। একটু পর মাথা এক দিকে সামান্য কাত করে বললো, 'একটু তেতো...মনে হয়...।'

শুনে যুবকটি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো, 'তোমার অসুখ হয়েছে। সাবধান থেকো। তবে এখনও বেশি খারাপ নয়, তোমার তেতো স্বাদের "মনে হয়"। আচ্ছা, এই যে ম্যাডাম, তার মতো এতে একটু কামড় দিয়ে দেখুন।'

বাজারের থলে হাতে এক মহিলা বেশ চাওড়া একটা ছালে "খচ!" করে সজোরে কামড় দিলো। আর হাসি মুখে বললো, 'না! একটুও তেতো নয়।'

যুবকটি বললো, 'বেশ, ম্যাডাম, তুমি স্বাস্থ্যবতী!'

সে আরো উঁচু গলায় বললো, '২০ সেন, ২০ সেন। এটা দিয়ে প্রত্যেক সকালে অসুখ হয়েছে কি না বোঝা যায়। কতো সস্তা!'

তত্তচানও সেই ধূসর রঙের ছালে কামড় দিয়ে পরখ করতে চেয়েছিলো। তবে 'আমাকেও কামড় দিয়ে দেখতে দাও' এ-কথা বলার সাহস ছিলো না। তার বদলে তত্তচান যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'স্কুল শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে?'

যুবকটি পলকের জন্য তত্তচানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'হুঁ, থাকবো।'

তত্তচান তার পিঠে স্কুল-ব্যাগের কট্ কট্ শব্দ তুলে দৌড়োতে লাগলো। কেননা ইতিমধ্যেই একটু দেরি হয়ে গেছে, আর ক্লাস শুরু হওয়ার আগে একটা কাজ তাকে করতে হবে। কাজটা হলো ক্লাসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই সব ছেলেমেয়েকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কেউ আমাকে ২০ সেন ধার দিতে পারো?'

কারও কাছে ২০ সেন ছিলো না। লম্বা এক বাক্স ক্যারামেল পাওয়া যেতো ১০ সেনে। তাই ২০ সেন মোটা অংক না হলেও, তা কারো কাছেই ছিলো না।

তখন মিইয়োচান বললো, 'আমার বাবা বা মাকে জিজ্ঞেস করে দেখবো?'

মিইয়োচান ছিলো প্রধান শিক্ষকের মেয়ে। তাই সুবিধার কথা। মিইয়োচানদের বাসা স্কুলের মিলনায়তনের পাশে, তাই তার মা সব সময় স্কুলে থাকার মতোই।

দুপুরের বিরতির সময় মিইয়োচান তত্তচানকে দেখে বললো, 'বাবা বললো সে তোমাকে ধার দিতে পারে, তবে সে জানতে চায় তা তুমি কিসে খরচ করবে!'

তত্তচান প্রধান শিক্ষকের ঘরের দিকে রওনা হলো। প্রধান শিক্ষক তত্তচানকে দেখে তার চশমা খুলে বললো, 'তুমি বলেছো, তোমার না কি ২০ সেন দরকার? তুমি তা কিসে খরচ করবে?'

তত্তচান তাড়াহুড়ো করে বললো, 'গাছের ছাল কিনতে চাই, যাতে কামড় দিলে বোঝা যাবে ভালো আছি না অসুখ হয়েছে।'

প্রধান শিক্ষক কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় বিক্রি হচ্ছে?'

তত্তচান আবার তাড়াহুড়ো করে উত্তর দিলো, 'স্টেশনের সামনে।'

'তাই না কি? তুমি চাইছো যখন ঠিক আছে। তবে আমাকেও একটু কামড় দিয়ে দেখতে দিও।' এ-কথা বলে প্রধান শিক্ষক জ্যাকেটের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে তত্তচানের হাতে ২০ সেন তুলে দিলো।

'বাহ্—, ধন্যবাদ। মা'র কাছ থেকে নিয়ে তোমাকে ফেরত দেবো। বই হলে মা সব সময় কিনে দেয়, অন্য জিনিস হলে কেন কিনতে হবে তার কারণ জানতে চায়। তবে স্বাস্থ্যের ছালবাকল সকলের দরকার, তাই মনে হয় মা কেনার টাকা দেবে।'

স্কুল ছুটির পর মুঠোতে ২০ সেন শক্ত করে ধরে তত্তচান স্টেশনের সামনের দিকে ছুটে গেলো। যুবকটি আগের মতোই চিৎকার করছিলো।

তত্তচান যখন তার ২০ সেন দেখালো, তখন সে মৃদু হেসে বললো, 'লক্ষ্মী মেয়ে! তোমার মা-বাবা খুশি হবে।'

তত্তচান বললো, 'রকিও!'

তত্তচানকে দেয়ার জন্য ছাল বাছাই করতে করতে যুবকটি জিজ্ঞেস করলো, 'রকি, কে?'

তত্তচান বললো, 'আমাদের কুকুর! শেপার্ড!'

যুবকটি তার ছাল বাছাইয়ের কাজ থামিয়ে বললো, 'কুকুর? ঠিক আছে। কুকুরের যদি তেতো লাগে, তাহলে সে ছাল পছন্দ করবে না, তার মানে সে অসুস্থ...'

৩ সেন্টি মিটারের মতো চওড়া ও ১৫ সেন্টি মিটারের মতো লম্বা একটা ছাল যুবকটি তার হাতে তুলে নিয়ে বললো, 'ঠিক আছে? প্রত্যেক দিন সকালে এটা কামড় দিয়ে দেখো যদি তেতো লাগে তাহলে বুঝবে অসুখ। কোনো স্বাদ না লাগলে সুস্থ।'

যুবকটি খবরের কাগজে গাছের ছালটি মুড়ে দিলো। তত্তচান যত্নের সঙ্গে শক্ত করে হাতে নিয়ে বাসায় ফিরলো।

তার পর তত্তচান নিজে প্রথমে কামড় দিয়ে দেখলো। ছালটি তত্তচানের মুখের মধ্যে ঝিরঝির আওয়াজ করলো, কিন্তু তার তেতো বা কোনো রকম স্বাদ লাগলো না।

'বা-হ্, আমি সুস্থ!!'

মা হাসতে হাসতে বললো, 'তুমি তো সুস্থ। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?'

তত্তচান ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলো।

মাও তার মতো ছালে কামড় দিয়ে দেখলো আর বললো, 'তেতো তো লাগছে না।'

'তাহলে মাও সুস্থ।'

তার পর তত্তচান রকির কাছে গিয়ে তার মুখের সামনে ছালটি তুলে ধরলো। রকি প্রথমে সেটা শুঁকলো আর জিভ দিয়ে চাটলো।

তত্তচান বললো, 'কামড় দাও। কামড় দিলে বোঝা যাবে তোমার অসুখ হয়েছে কি না!'

রকি কামড় দেয়ার চেষ্টা করলো না, বরং নিজের কানের পেছন দিক পা দিয়ে আঁচড়ালো। তত্তচান গাছের ছালটি রকির মুখের আরো কাছে তুলে ধরে বললো, 'শোনো, কামড় দিয়ে দেখো, তোমার অসুখ হলে মুশকিল হবে!'

অনিচ্ছুক রকি ছালটির এক ধারে কামড় দিলো। তার পর যেন আবার শুঁকলো। সে ছালটিকে বিশেষ অপছন্দ করার ভঙ্গি না করে একটা বড় হাই তুললো।

'বা—হ্! রকিও সুস্থ!!'

পরের সকালে মা তত্তচানকে ২০ সেন দিলো। স্কুলে গিয়ে তত্তচান প্রথম প্রধান শিক্ষকের ঘরে গেলো আর গাছের ছালটি তার সামনে রাখলো।

প্রধান শিক্ষক মুহূর্তের জন্য 'এটা কী?' বলার মতো ভঙ্গি করে ছালটির দিকে তাকালো। তারপর তত্তচান যখন তার মুঠোতে মূল্যবান জিনিসের মতো শক্ত করে ধরে রাখা ২০ সেন হাত খুলে স্যারকে দিতে গেলো, তখন স্যারের মনে পড়লো।

তত্তচান বললো, 'কামড় দাও। তেতো লাগলে তুমি অসুস্থ।'

প্রধান শিক্ষক কামড় দিয়ে দেখলো। তারপর সে ছালটিকে উল্টে-পাল্টে ভালো করে পরীক্ষা করলো।

তত্তচান উদ্বিগ্ন হয়ে প্রধান শিক্ষকের মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তেতো লাগে?'

'না, কোনো স্বাদ নেই।'

তারপর প্রধান শিক্ষক গাছের ছাল তত্তচানকে ফেরত দিয়ে বললো, 'আমি সুস্থ। ধন্যবাদ।'

তত্তচান বললো, 'বাহ্, প্রধান শিক্ষকও সুস্থ! বেশ!'

সে দিন তত্তচান সারা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সেই ছালটি একের পর এক কামড় দিতে বললো। কারোই তেতো লাগলো না। তার মানে সবাই সুস্থ। তোমোএ স্কুলের সবাই সুস্থ। তত্তচান খুব খুশি হলো।

সবাই প্রধান শিক্ষকের কাছে একের পর এক জানাতে গেলো, 'আমি সুস্থ।' প্রত্যেক সময় স্যার বললো, 'তাই নাকি? ভালো কথা।'

তবে গুন্মা প্রদেশের প্রকৃতির মধ্যে যার জন্ম ও নদীর ধারে যে বড় হয়েছে, যেখান থেকে হারুনাসান্ পর্বত দেখা যায়, তার কোলে লালিত প্রধান শিক্ষক নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝেছিলো (এ ছালটিতে যে-কোনো লোক কামড় দিলেও কখনো তেতো লাগবে না।)

সবাই সুস্থ আছে জেনে তত্তচান খুশি হলো আর খুশি হলো প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক আরো বিশেষভাবে খুশি হয়েছিলো এজন্য যে যদি কেউ 'তেতো!' বলে তাহলে তার জন্য তত্তচান খুব উদ্বিগ্ন হবে। এমন কোমল হৃদয়ের মেয়ে হয়ে সে বড় হচ্ছে বলে প্রধান শিক্ষক খুশি।

সে সময় তত্তচানের স্কুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো একটা নেড়ি কুকুর। তত্তচান তার মুখে ছালটি ঢোকানোর চেষ্টা করলো। তখন কুকুরটা তত্তচানকে প্রায় কামড় দিচ্ছিলো। তবে তত্তচান হার না মেনে চিৎকার করছিলো, 'তোমার অসুখ কি না এখনই বোঝা যাবে। একটু কামড় দিয়ে দেখো। তুমি সুস্থ থাকলেই যে ভালো!'

অচেনা কুকুরটিকে ছালটি কামড় দেয়াতে তত্তচান সফল হলো। কুকুরটিকে ঘিরে লাফাতে লাফাতে তত্তচান বললো, 'বেশ, তুমিও সুস্থ!!'

কুকুরটি লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নত করে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

প্রধান শিক্ষক যেমন অনুমান করেছিলো ওই যুবকটিকে তেমনটি দ্বিতীয় বারের মতো আর জিইয়ুগাওকাতে দেখা যায় নি।

বীবর বারবার কামড়ালে যেমন হতে পারে ছালটি তেমন ছেঁড়া-ফাড়া হয়ে গিয়েছিলো। প্রত্যেক সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে ওই ছালটিকে ডেস্কের দেরাজ থেকে মূল্যবান জিনিসের মতো বের করে তত্তচান কামড় দিতো আর 'আমি সুস্থ!!' বলে বাসা থেকে বের হতো।

সুখের কথা তত্তচান সত্যিই সুস্থ ছিলো।

ইংরেজী বলা ছেলে

এক নতুন ছাত্র এলো তোমোএ স্কুলে। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র হিসেবে সে একটু বেশি লম্বা। সব কিছু মিলিয়ে তার শরীর ছিলো মস্ত বড়ো। তত্তচানের মনে হলো তাকে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রের মতো দেখায় না, বরং মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রের মতো দেখায়। তার পোশাক-আশাকও সবার থেকে ভিন্ন, বড়দের পোশাকের মতো।

সকালে স্কুলের মাঠে প্রধান শিক্ষক এ-নতুন ছাত্রটিকে সকলের সাথে এ-কথা বলে পরিচয় করিয়ে দিলো, 'এ হচ্ছে মিইয়াজাকি। আমেরিকাতে

তার জন্ম হয় আর সেখানে বড় হয়। তাই সে জাপানী ভাষা ভালো করে বলতে পারে না। এজন্য তোমোএ স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এখানে সে অবশ্য অন্যান্য স্কুলের চেয়ে অনেক সহজে বন্ধুত্ব পাতাতে পারবে আর ধীরে সুস্থে পড়াশুনা করতে পারবে। আজ থেকে তোমাদের সবার সাথে এক সঙ্গে থাকবে। তাকে কোন শ্রেণীতে দেবো? তত্তচানদের সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণীতে দিলে কেমন হয়?'

ছবি আঁকায় পটু পঞ্চম শ্রেণীর তাআচান অন্যান্য দিনের ন্যায় বড় ভাইয়ের মতো বললো, 'বেশ।'

প্রধান শিক্ষক মৃদু হেসে বললো, 'সে ভালো করে জাপানী বলতে পারে না, তবে সে ইংরেজী খুব ভালো জানে। তাই তোমরা যদি তার কাছে ইংরেজী শেখো, তাহলে বেশ হয়। তবে সে জাপানী ধরনের জীবনযাপনে অভ্যস্ত নয়, তাই তাকে সবকিছু শিখিয়ে দিও। আমেরিকান জীবন খুব মজার, তাই সে-সম্পর্কেও তার কাছ থেকে শোনো। একে দেখে শুনে রেখো।'

মিইয়াজাকি তার চেয়ে অনেক ছোট সহপাঠীদের উদ্দেশে মাথা নত করলো। শুধু তাআচানদের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা নয়, অন্যান্য ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা সবাই তার উদ্দেশে মাথা নত করলো আর হাত দোলালো।

মধ্যাহ্ন বিরতির সময় মিইয়াজাকি প্রধান শিক্ষকের বাসার দিকে হাঁটতে লাগলো। আর ছেলেমেয়েরা সবাই তার পেছনে দল বেঁধে হাঁটতে লাগলো। মিইয়াজাকি যখন জুতো না খুলে বাসার মাদুরের ওপর উঠছিলো, তখন সবাই হৈচৈ করে তাকে বললো, 'তোমার জুতো খুলে নাও!'

মিইয়াজাকি চমকে উঠে জুতো খুলে বললো, 'মাফ করো।'

সবাই বলে উঠলো, 'মাদুর পাতা ঘরে জুতো খুলে ঢুকতে হয়, তবে ট্রেন-ক্লাসঘরে ও পাঠাগারে খোলার দরকার নেই।' 'কুহোন্বুৎসু মন্দিরের বাগানে জুতো খোলার দরকার নেই; মন্দিরের ভেতরে ঢোকার সময় জুতো খুলতে হয়।' একথা সবাই বুঝতে পারলো যে জাপানী হলেও অনেক বছর বিদেশে থাকলে নানা বিষয়ে অনেক পার্থক্য ঘটে। এতে তারা খুব মজা পেলো।

পরের দিন মিইয়াজাকি একটা বড় ইংরেজী ছবির বই স্কুলে নিয়ে গেলো। দুপুরের বিরতির সময় সবাই মিইয়াজাকিকে ঘিরে কয়েক সারিতে বসলো এবং ছবির বইটির দিকে উঁকি দিলো। তারা খুব অবাক হলো। প্রথম কারণ এতো সুন্দর ছবির বই তারা কখনো দেখে নি। তাদের সবার চেনা ছবির বই সাধারণত টকটকে লাল বা সবুজ ও খাঁটি হলুদ রঙের, তবে এই ছবির বইয়ের রঙ গায়ের হালকা রঙের মতো পাটল রঙ এবং নীল রঙও সাদা-ধূসর মেশানো স্নিগ্ধ। মোমের বড় পেন্সিলে এ-রঙগুলো পাওয়া যায় না। এগুলো ক্রেইয়নের চব্বিশ রঙের বাক্সে পাওয়া যেতো না। তাআচানের ছিলো আটচল্লিশ রকম রঙের ক্রেইয়নের বাক্স। অনেক রঙ সে বাক্সেও পাওয়া যেতো না। তাই সবাই রঙ দেখে খুব মুগ্ধ হলো। তারপর ছবির কথা। বইটির শুরুতে আছে একটা ছবি, তাতে একটা কুকুর একটা শিশুর ডাইআপার (diaper) কামড় দিয়ে টানছে। সবার মুগ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই শিশু দেখতে আঁকা ছবির মতো নয় বরং প্যাণ্টের ভেতরে তার পাটল রঙের নরম চামড়া দেখা যাচ্ছিলো। মনো হলো তাদের সামনে একটি আসল শিশু। তৃতীয় কথা হচ্ছে এতো বড় আর মোটা তুলতুলে কাগজের ছবির বই—এই তারা প্রথম দেখলো। তত্তচান অবশ্যই অন্যান্য দিনের মতো বুদ্ধি করে ছবির বইয়ের সবচেয়ে কাছে মিইয়াজাকির গা ঘেঁষে অমায়িকভাবে বসলো।

মিইয়াজাকি প্রথম ইংরেজীতে বাক্য পড়লো। সেই কোমল ভাষা তারা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলো। তার পর মিইয়াজাকি জাপানী ভাষা শেখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো।

যাই হোক, মিইয়াজাকি তোমোএ স্কুলে নিয়ে এসেছে এক নতুন, ভিন্ন জিনিস।

মিইয়াজাকি বললো, 'আকাচান হচ্ছে বেবি।'

মিইয়াজাকিকে অনুসরণ করে তারা বললো, 'আকাচান হচ্ছে বেবি।'

তারপর মিইয়াজাকি বললো, 'উৎস্কুশি হচ্ছে বিউটিফুল।'

সবাই বললো, 'উৎস্কুশিই হচ্ছে বিউটিফুল।'

তৎক্ষণাৎ মিইয়াজাকি নিজের জাপানী শব্দ সংশোধন করে বললো, 'মাফ করো, উৎস্কুশি ভুল, ওটা হবে উৎস্কুশিই?'

এভাবে অল্প দিনের মধ্যে তোমোএ স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী ও মিইয়াজাকির মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। মিইয়াজাকিও প্রত্যেক দিন নানা বই স্কুলে নিয়ে এসে দুপুরের বিরতির সময় পড়ে শোনাতো। তাই মিইয়াজাকি হয়ে উঠলো ইংরেজী গৃহশিক্ষকের মতো। অপরদিকে মিইয়াজাকির জাপানী ভাষাও খুব তাড়াতাড়ি উন্নত হতে লাগলো। আগে সে ভুল করে তোকোনোমা (পুষ্পসজ্জা ও শিল্পবস্তু রাখার জন্য ঘরের কোণের পবিত্র বেদি)-তে বসে পড়তো, এখন তা হয় না।

তত্তচানরাও নানা কিছু জানলো আমেরিকা সম্পর্কে।

তোমোএ স্কুলে জাপান ও আমেরিকা হয়ে উঠতে লাগলো পরস্পরের বন্ধু।

তবে তোমোএ স্কুলের বাইরে আমেরিকা ছিলো শত্রু আর ইংরেজী ওই শত্রু দেশের ভাষা বলে সব স্কুলের পাঠক্রম থেকে বাদ দেয়া হলো।

সরকার ঘোষণা করলো, 'আমেরিকান পিশাচ!' তখন তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সবাই এক সঙ্গে চিৎকার করছিলো, 'উৎসুকুশিই হচ্ছে বিউটিফুল।'

এ-সময় তোমোএ স্কুলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস ছিলো উষ্ণ আর ছেলেমেয়েরা ছিলো সুন্দর।

বিচিত্রানুষ্ঠান

'নাটক। নাটক। বিচিত্রানুষ্ঠান।'

এই প্রথম তোমোএ স্কুলে বিচিত্রানুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। আগে প্রত্যেক দিন টিফিনের সময় সবার সামনে দাঁড়িয়ে কারো না কারো গল্প বলতে হতো। সেই নিয়ম এখনো পর্যন্ত চলে আসছে। মিলনায়তনের ছোট মঞ্চের ওপর সব সময় ছিলো গ্র্যাণ্ড পিয়ানোটি। সেটি বাজানো হতো প্রধান শিক্ষকের ইউরিদ্‌মিক্সের ক্লাসের সময়। সেখানে নাটক হবে আর দর্শকেরা দেখতে আসবে তা ছিলো অকল্পনীয়। যাই হোক, ছেলেমেয়েরা

কেউ কখনো নাটক দেখে নি। একবার 'রাজহাঁসের হ্রদ' ব্যালে ছাড়া তত্তচানও নাটক দেখে নি। তা সত্ত্বেও তারা তাদের ক্লাসের প্রোগ্রাম নিয়ে সবাই আলাপ করলো। তারা স্থির করলো 'কান্‌জিন্‌চো' (চাঁদাদাতার তালিকা) নাটকটি অভিনয় করবে। এই কাবুকি নাটকটি তোমোএ স্কুলে অভিনীত হবে এমন আশা করা যায় না। নাটকটি একটি পাঠ্য বইতে ছিলো।

ঠিক হলো তাদের শিক্ষক মারুইয়ামা নাটকটি পরিচালনা করবে। বেন্‌কেই-র ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সাইশো আইকো-কে নির্বাচন করা হলো, কারণ সে বড় ও লম্বা। তোগাশি-র ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য স্থির করা হলো আমাদেরাকে। সে দেখতে গম্ভীর ও তার কণ্ঠস্বর উঁচু। সবাই আলোচনা করে ঠিক করলো তত্তচান অভিনয় করবে ইয়োশিৎ-সুনে-র ভূমিকায়। অন্য সবাই অভিনয় করবে ভ্রমণকারী ভিক্ষুদের ভূমিকায়।

মহড়ার আগে সবাইকে প্রথমে সংলাপ মুখস্থ করতে হলো। তবে তত্তচান ও ভ্রমণকারী ভিক্ষুদের কোনো সংলাপ ছিলো না। তাই বেশ সুবিধা হলো। কারণ নাটকের আগাগোড়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাই ভ্রমণকারী ভিক্ষুদের কাজ। আর ইয়োশিৎসুনের ভূমিকায় তত্তচানের কাজ হচ্ছে উবু হয়ে বসে থাকা। তোগাশি পাহারা দিচ্ছিলো 'আতাকা নো সেকি (আতাকা চৌকি)'। সেখান দিয়ে কৌশলে পার হওয়ার জন্য বেন্‌কেই 'এ এক সামান্য ভ্রমণকারী ভিক্ষু' বলে তার মনিব ইয়োশিৎসুনেকে আঘাত করে। বেন্‌কেই-র ভূমিকায় সাইশো-র কাজ ছিলো অনেক। তাকে চৌকির পাহারাদার তোগাশি-র সঙ্গে অনেক বাক্য বিনিময় করতে হয়। বেনকেই-র কাছে একটি স্ক্রল ছিলো। যখন তোগাশি বললো, 'স্ক্রলটি পড়ো।', তখন সে লেখাহীন স্ক্রলটি বের করে পড়তে লাগলো—'প্রথমে তোদাইজি মন্দির নির্মাণের জন্য...' স্ক্রলটিতে কিছু লেখা ছিলো না বলে সে তখন বানিয়ে বানিয়ে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলো। দৃশ্যটি ছিলো খুব কঠিন। কারণ স্ক্রলটি পড়ে শত্রু তোগাশিকে মুগ্ধ করতে হবে, তাই প্রত্যেকদিন ক্লাসের সময় সে এর সংলাপ আওড়াচ্ছিলো।

বেনকেইকে পরাজিত করার জন্য তোগাশি-র ভূমিকায় আমাদেরা-র রয়েছে অনেক সংলাপ। তাই সে কষ্ট করে সংলাপ মুখস্থ করছিলো।

অবশেষে মহড়া শুরু হলো। তোগাশি ও বেন্‌কেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলো আর বেন্‌কেই-র পেছনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো ভ্রমণকারী ভিক্ষুরা। ভ্রমণকারী ভিক্ষুদের সারির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো ইয়োশি-ৎসুনের ভূমিকায় তত্তচান। তবে তত্তচান এ-কাহিনী বোঝে নি। তাই যখন বেন্‌কেই ইয়োশিৎসুনের ভূমিকায় তত্তচানকে জোরে ধাক্কা দেয় এবং লাঠি দিয়ে মারে, তখন তত্তচান তীব্র প্রতিবাদ করে। সে সাইশো-র পায়ে লাথি মারে ও তাকে আঁচড়ে দেয়। তাই সাইশো কেঁদে ফেলে আর ভ্রমণভিক্ষুরা হেসে ওঠে।

আসলে কাহিনীতে বেন্‌কেই বার বার ইয়োশিৎসুনেকে আঘাত করলেও ইয়োশিৎসুনে তা করতে দেয়। তাই চৌকিদার তোগাশি বেনকেই-র মনের দুঃখে বিচলিত হয়ে অবশেষে এই 'আতাকা নো সেকী' (আতাকা চৌকি) অতিক্রম করতে দেয়। তাই ইয়োশিৎসুনে যদি প্রতিবাদ করে, তবে নাটকটি নষ্ট হয়ে যায়। মারুইয়ামা স্যার তত্তচানকে ব্যাপারটি বোঝালো। তবে তত্তচান জোর দিয়ে বলতে থাকলো, 'সাইশো যদি আমাকে মারে, আমিও তাকে মারবো!' তাই অভিনয় এগুচ্ছিলো না।

বহুবার সেই দৃশ্য অভিনয় করা হলেও তত্তচান উবু হয়ে বসে বসে প্রতিরোধ করলো। শেষে মারুইয়ামা স্যার তত্তচানকে বললো, 'আমি দুঃখিত। ইয়োশিৎসুনে-র ভূমিকায় তাইচানকে অভিনয় করতে বলবো।'

তত্তচানের জন্য সেটা সুখের কথা। কারণ শুধু তত্তচানকে আঘাত করা হবে, ধাক্কা দেয়া হবে এটা তার পছন্দ ছিলো না। তার পর মারুইয়ামা স্যার বললো, 'তার বদলে তত্তচান, তুমি ভ্রমণকারী ভিক্ষু হও।'

তত্তচান ভ্রমণকারী ভিক্ষুদের সবচেয়ে পেছনে দাঁড়ালো।

সবাই ভাবলো, 'এতে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে!'

তবে ওই ভাবনা ভুল ছিলো। ভ্রমণকারী ভিক্ষুরা যে লাঠিতে ভর দিয়ে পাহাড়ে ওঠানামা করে সে লম্বা লাঠি তত্তচানকে দেয়া স্যারের ঠিক হয় নি। তত্তচান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হতে থাকে, তখন তত্তচান

লাঠি দিয়ে তার পাশের ভ্রমণকারী ভিক্ষুর পায়ে খোঁচা দেয়া এবং তার সামনের একজন ভ্রমণকারী ভিক্ষুর বগলে সুড়সুড়ি দেয়। তা ছাড়া সে সেই লম্বা লাঠি দিয়ে সংগীত পরিচালকের অভিনয় শুরু করে। তাই তার আশেপাশের সবাই ভয় পেতে লাগলো। এর জন্য তোগাশি ও বেন্‌কেই-র অভিনয় দৃশ্যটি নষ্ট হয়ে যায়।

এ জন্য শেষে তাকে ভ্রমণকারী ভিক্ষুর ভূমিকা থেকেও বাদ দেয়া হয়।

ইয়োশিৎসুনের ভূমিকায় তাইচান দাঁতে দাঁত কামড় দেয়ার মতো করে লাথি ও মার খেলো। তাই দর্শকেরা তার জন্য নিশ্চয় দুঃখ পেলো। তত্তচানকে বাদ দিয়ে মহড়া ঠিক মতো এগুচ্ছিলো।

তত্তচান একাকী স্কুলের মাঠে বের হলো। আর জুতো খুলে নিজের ভঙ্গিতে ব্যালে নাচতে লাগলো। নিজের ভঙ্গিতে তার নাচতে খুব ভালো লাগলো। তত্তচান রাজহাঁস হলো, আবার সে বাতাস হলো, অদ্ভুত মেয়ে হলো, গাছ হলো। নির্জন স্কুল মাঠে সে একা অনেকক্ষণ নাচলো।

তবে তার মনের গভীরে ইয়োশিৎসুনের ভূমিকায় অভিনয় করার একটু বাসনা ছিলো। তবে সে যদি অভিনয় করতো তাহলে অবশ্যই সাইশো-কে আঁচড়ে দিতো বা মারতো।

দুঃখের কথা হচ্ছে তোমোএ স্কুলের প্রথম ও শেষবারের মতো অভিনীত নাটকে তত্তচান এভাবে অংশ নিতে পারলো না।

চক

তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কখনো কোনো বাসার দেয়ালে বা রাস্তায় হিজিবিজি দাগাদাগি করে নি। কারণ স্কুলে তারা এমন কাজ যথেষ্ট করেছে। তা কেমন বলছি।

সংগীতের ঘণ্টায় যখন ছাত্রছাত্রীরা মিলনায়তনে জড়ো হতো, তখন প্রধান শিক্ষক সবাইকে শাদা চক দিতো। ছাত্রছাত্রীরা যখন মিলনায়তনের

মেঝের ওপর নিজ পছন্দ মতো জায়গা নিয়ে শুয়ে বা উবু হয়ে বসে বা ঠিক মতো সোজা হয়ে বসে বা মুক্ত ভঙ্গিতে শাদা চক হাতে নিয়ে সবাই প্রস্তুত হয়, তখন প্রধান শিক্ষক পিয়ানো বাজাতে শুরু করে। তারা সবাই মিলনায়তনের মেঝের ওপর স্যারের বাজানো সংগীতের তালের স্বরলিপি লেখে। হালকা বাদামী রঙের তেলতেলে কাঠের মেঝেতে চক দিয়ে তত্তচানের লিখতে খুব ভালো লাগতো। বিশাল মিলনায়তনে ছড়িয়ে থাকতো তত্তচানদের ক্লাসের জন দশেক ছেলেমেয়ে। তাই যথেচ্ছ স্বরলিপি লিখলেও অন্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ হতো না। স্বরলিপি হলেও রীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশ লেখার দরকার ছিলো না। শুধু তাল (রিদ্‌ম) লিখলেই চলতো। তা ছাড়া ওই স্বরলিপি ছিলো তোমোএ স্কুলের বিশেষ এক ধরনের স্বরলিপি যা প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা আলাপ-আলোচনা করে স্থির করেছিলো। যেমন ;

- ♫ লাফ (লাফালাফির জন্য উপযুক্ত তাল)
- ♪ পতাকা (দেখতে পতাকার মতো)
- ♫ পতাকা-পতাকা
- 𝅘𝅥𝅯 দু'খানি পতাকা
- ♩ কালো
- 𝅗𝅥 শাদা
- 𝅗𝅥. তিলযুক্ত শাদা (বা বিন্দুযুক্ত শাদা)
- 𝅝 বৃত্ত (সেমিব্রীভ-দীর্ঘতম স্বর)

... এমনভাবে চলতো। স্বরলিপির সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছিলো খুব ভালোভাবে আর এটা তাদের কাছে ছিলো মজার জিনিস। তাই এ ঘণ্টার জন্য সবাই অপেক্ষা করতো।

মেঝেতে শাদা চক দিয়ে লেখা ছিলো প্রধান শিক্ষকের উদ্ভাবন। কাগজে ওগুলো ধরার মতো যথেষ্ট জায়গা ছিলো না। সকলের পরে লেখার জন্য ব্ল্যাকবোর্ডও সংখ্যায় কম ছিলো। তাই মিলনায়তনের মেঝেকে একটা বড় ব্ল্যাকবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে। চক দিয়ে লেখার সময় ছেলে-মেয়েরা তাদের দেহ স্বাধীনভাবে নাড়াতে পারতো। তালের বেগ খুব দ্রুত হলেও তারা একটার পর একটা লিখতে পারতো এবং বড় বড় অক্ষর লেখারও কোনো সমস্যা ছিলো না। তা ছাড়া তারা স্বাধীনভাবে সংগীত উপভোগ করতে পারতো। আর কিছুটা সময় হাতে থাকলে ওই সময় তারা উড়োজাহাজ, পুতুল ও এ-ধরনের ছবি আঁকতে পারতো। তাই কখনো কখনো ছেলেমেয়েরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাশের ছেলেমেয়েদের ছবি, নিজেদের ছবি আঁকতো এবং সবটা মিলে মিলনায়তনের পুরো মেঝেতে একটা বিশাল ছবি আঁকা হতো।

সংগীতের সময় এক একটা সংগীত শেষ হওয়ার পর প্রধান শিক্ষক মঞ্চ থেকে নেমে এসে ঘুরে ঘুরে এক একজনের স্বরলিপি দেখতো। ছেলে-মেয়েদের বলতো, 'বেশ', বা 'এখানে পতাকা-পতাকা নয়। লাফ।' সবাই তা সংশোধন করার পর আরেক বার পিয়ানো বাজাতো এবং সবাই নিজেদের স্বরলিপি ঠিক মতো মিলিয়ে নিয়ে ভালো করে স্বরলিপি বুঝতে পারতো। প্রধান শিক্ষক যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন অন্য কাউকে এ-ক্লাস নিতে দিতো না। ছাত্রছাত্রীরাও কোবাইয়াশি স্যার ছাড়া মোটেই আনন্দ পেতো না।

স্বরলিপি লেখার পর তা মুছে ফেলা একটা দারুণ কাজ। প্রথমে ডাস্টার দিয়ে মুছে তার পর এক সঙ্গে মোছার কাপড় ও ঝাড়ন দিয়ে ভালো-ভাবে পরিষ্কার করতো। তবে পুরো মিলনায়তন ঝাড়ু দেয়া কঠিন কাজ। তোমোএ স্কুলে সবাই জানতো 'এমনভাবে হিজিবিজি লিখলে বা দুষ্টুমি করে আঁকাআঁকি করে পরে তা পরিষ্কার করা কঠিন।' তাই তারা মিলনায়তনের মেঝে ছাড়া অন্য জায়গায় লেখালেখি করতো না। তা ছাড়া এক সপ্তায় এ-ক্লাস দু'বার হতো বলে আঁকাআঁকির মজা তারা যথেষ্ট ভাবেই পেতো।

তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ভালো করে জানতো 'চক ছুঁতে কেমন লাগে', 'কী ভাবে ধরে লিখলে লেখা ভালো হয় আর চকটা

ভাঙে না'। অর্থাৎ প্রতিটি ছেলেমেয়ে হয়ে উঠতে পারতো এক একজন "চক সমালোচক"।

ইয়াসূআকিচান মারা গেলো

বসন্তের ছুটি শেষ হওয়ার পর প্রথম দিন স্কুলে সবাই জড়ো হলো। সে দিন সকালের কথা। স্কুলের মাঠে সবার সামনে দাঁড়িয়ে কোবাইয়াশি স্যার দু'হাত জ্যাকেটের পকেটে রাখলো। অন্যান্য দিনের মতো স্থির-ভাবে দাঁড়ালো। তার পর পকেট থেকে হাত বের করে সকলের দিকে তাকালো। মনে হলো স্যার কাঁদছে। স্যার আস্তে আস্তে বললো, 'ইয়াসু-আকিচান মারা গেছে। আজ আমরা সবাই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাবো। ইয়াসুআকিচান সবার বন্ধু ছিলো। তার মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি খুব দুঃখ বোধ করছি ...।' এইটুকু বলতেই স্যারের চোখ লাল হয়ে উঠলো। তার চোখ থেকে জল পড়তে লাগলো।

ছাত্রছাত্রীরা সবাই অবাক হলো। কেউ কথা বললো না। প্রতিটি ছেলেমেয়ের বুক ভরে গেছে ইয়াসুআকিচানের জন্য বেদনায়। এর আগে এমন বেদনাদায়ক নীরবতা তোমোএ স্কুলের বাগানের ওপর দিয়ে আর বয়ে যায় নি।

তত্তচান ভাবলো—এতো তাড়াতাড়ি মরে গেলো। বসন্তের আগে ইয়াসুআকিচান "পড়ে দেখো?" বলে তাকে ধার দিয়েছিলো "টম কাকার কুটির" বইটি। এখনও সে বইটি শেষ করতে পারে নি।

তত্তচানের মনে পড়ে ইয়াসুআকিচানের কথা। তার মনে পড়ছিলো বসন্তের ছুটির আগে বিদায় নেয়ার সময় সে যখন তাকে বইটি দিচ্ছিলো, তখন দেখা ইয়াসুআকিচানের বাঁকা আঙুলের কথা। প্রথম যে-দিন তার সাথে তত্তচানের দেখা হয়, তত্তচান জিজ্ঞেস করেছিলো, 'কেন এ ভাবে হাঁটো?'

সে বলেছিলো, 'আমার পোলিও হয়েছে।' তত্তচানের মনে পড়ছে তার সেই কোমল শান্ত সুর ও একটু হাসি মুখ। মনে পড়ছে সেই গ্রীষ্মে

শুধু তাদের দু'জনের সাহসী অভিযানের কথা, গোপনে গাছে ওঠার কথা। তত্তচানের চেয়ে সে বয়সে ও উচ্চতায় বড় ছিলো, তত্তচানকে বিশ্বাস করে নিজের সব ভার সে তুলে দিয়েছিলো তত্তচানের হাতে। তার সে সময়ের ওজনও এখন অতীতের মধুর স্মৃতি হয়ে গেলো। ইয়াসুআকিচান তত্তচানকে জানিয়েছিলো, 'আমেরিকায় টেলিভিশন নামক জিনিস আছে।'

তত্তচান ইয়াসুআকিচানকে পছন্দ করতো। বিরতির সময়, টিফিনের সময়, স্কুল ছুটির পর স্টেশন পর্যন্ত ফেরার সময় তারা সব সময় এক সঙ্গে থাকতো। সব কিছুকে অতীতের কথা বলে মনে হলো তত্তচানের। তবে তত্তচান জানতো আর কখনো ইয়াসুআকিচান স্কুলে আসবে না। মরে যাওয়ার এই অর্থ। সেই যত্নে পোষা তার মোরগ ছানাটিও মরে গিয়েছিলো, বার বার ডাকলেও সে নড়াচড়া করে নি।

দেন্এন্-চোহু-তে অবস্থিত ইয়াসুআকিচানের বাসার উল্টো দিকে টেনিস কোর্টের কাছে যে গির্জাটি ছিলো সেখানে ইয়াসুআকিচানের অন্ত্যে-ষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলো। ছাত্রছাত্রীরা সবাই নীরবে জিইয়ুগাওকা থেকে সারি বেঁধে গির্জা পর্যন্ত হেঁটে গেলো। তত্তচান সাধারণত চঞ্চলভাবে চারদিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটতো, তবে আজ সে নিচের দিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটলো। তত্তচান অনুভব করলো যে একটু আগে প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে শোনার সময় তার যে অনুভূতি হয়েছিলো তার থেকে এখন-কার অনুভূতি একটু ভিন্ন। বিশ্বাস হয় না ও পুরোনো আদরের জিনিসের মতো—এই অনুভূতি ছিলো কিছুক্ষণ আগেও আর এখনকার অনুভূতি হচ্ছে—আরেকবার জীবন্ত ইয়াসুআকিচানকে দেখতে চাই, দেখে কথা বলতে চাই—এমন অনুভূতিতে ভরা ছিলো তার বুক।

গির্জাঘরে শাদা লিলি ফুল অনেক ছিলো। ইয়াসুআকিচানের সুন্দর বড় বোন, তার মা ও পরিবারের লোকেরা কালো পোশাক পরে প্রবেশ-দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারা সবাই তত্তচানদের দেখে আগের চেয়ে জোরে কেঁদে উঠলো। তাদের সবার হাতে শক্ত করে ধরা ছিলো শাদা রুমাল। তত্তচান তার জীবনে প্রথম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখলো। পরে বুঝতে পারলো তা কতো বেদনাদায়ক। কেউ কথা বলছিলো না। অর্গানে শান্ত-

ভাবে স্তোত্রের সুর বাজছিলো। গির্জার ভেতরটি সূর্যের আলোতে আলোকিত ছিলো, তবে মনে হলো সেখানে আনন্দের অনুভূতি সারাক্ষণ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। বাহুতে কালো ফিতে বাঁধা একটি লোক তোমোএ স্কুলের সবাইকে একটি করে শাদা ফুল দিলো। ওই ফুল নিয়ে সারি বেঁধে গির্জার ভেতরে ঢুকে শুয়ে থাকা ইয়াসুআকিচানের কফিনের ভেতরে আস্তে করে ফুলটি রাখতে বললো।

ইয়াসুআকিচান কফিনের ভেতরে শুয়েছিলো। তার চারদিকে ঘিরে ফুলগুলো। তার চোখ বন্ধ ছিলো। সে মৃত হলেও তাকে অন্যান্য দিনের মতো কোমল ও তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছিলো। তত্তচান নতজানু হয়ে বসে ফুলটি ইয়াসুআকিচানের হাতের পাশে রাখলো আর আস্তে করে তার হাত স্পর্শ করলো। এটা তত্তচান বার বার টেনে নেয়া পুরোনো প্রিয় হাত। তত্তচানের নোংরা ছোট হাতের তুলনায় ইয়াসুআকিচানের হাত ধবধবে শাদা। তার আঙুল লম্বা আর বড়দের মতো দেখাচ্ছিলো।

তত্তচান নিচু গলায় বললো, 'এখন আসি।'

(আমরা এক দিন যখন বড় হবো, তখন আবার কোথাও আমাদের দেখা হবে। আশা করি তার আগে তোমার পোলিও রোগ সেরে উঠবে।)

তার পর তত্তচান উঠে দাঁড়িয়ে আরেকবার ইয়াসুআকিচানের দিকে তাকালো। 'ওহ ! একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে ভুলেগেছি।—"টম কাকার কুটির" বইটি এখন আর তোমাকে ফেরত দিতে পারবো না, তাই না? তোমার সঙ্গে যত দিন পর্যন্ত আবার দেখা না হয়, তত দিন আমি তোমার জন্য বইটি রেখে দেবো!'

তত্তচান হাঁটতে লাগলো। তখন তত্তচানের মনে হলো সে যেন পেছন থেকে ইয়াসুআকিচানের গলার আওয়াজ শুনতে পেলো। 'তত্তচান! আমরা এক সঙ্গে অনেক মজা করেছি। আমি তোমাকে ভুলবো না।'

'তাই!'—তত্তচান গির্জার বাইরে যাওয়ার দরোজার কাছে পৌঁছলো, তখন সে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'আমিও তোমাকে ভুলবো না।'

ইয়াসুআকিচানের সঙ্গে যে দিন প্রথম ট্রেনের ক্লাসঘরে দেখা হয়েছিলো, সে দিন ছিলো বসন্তের উজ্জ্বল সূর্যের আলো ভরা দিন। সে দিনের মতো বসন্তের সূর্যের আলো আজও তত্তচানের চার দিকে ছড়িয়ে আছে। আজ

তত্তচানের গাল বেয়ে নামছে অশ্রুধারা। প্রথম দিনের থেকে আজ একেবারে ভিন্ন।

গুপ্তচর

ইয়াসুআকিচানের কথা ভেবে তোমোএ স্কুলের ছেলেমেয়েরা অনেক দিন ধরে ব্যথিত ছিলো। বিশেষ করে তত্তচানদের যখন ক্লাসের ঘণ্টা বাজতো, এবং ইয়াসুআকিচান আসতো না। তাদের পক্ষে এতে অভ্যস্ত হতে বেশ সময় লাগলো যে সে দেরি করে নয়, সে আর কখনোই আসবে না। এক ক্লাসে মাত্র দশজন ছাত্রছাত্রী, এটা বেশ সুবিধাজনক। তবে সবার মনে হলো এ অবস্থায় কম ছাত্রছাত্রী খুব অসুবিধাজনক। কারণ চোখে পড়তো ইয়াসুআকিচান ক্লাসে নেই। তাদের জন্য এটাই স্বস্তিকর ছিলো যে ছাত্রছাত্রীদের বসার সিট নির্দিষ্ট ছিলো না। যদি ইয়াসুআকিচানের সিট নির্দিষ্ট থাকতো আর সে জায়গা অনেক দিন ধরে খালি পড়ে থাকতো, তাহলে তা অবশ্যই খুব বেদনাদায়ক হতো। তোমোএ স্কুলের নিয়ম ছিলো প্রত্যেক দিন যে কেউ নিজের ইচ্ছে মতো জায়গায় বসতে পারে। এ নিয়মটা ছিলো ভালো।

আজকাল তত্তচান ভাবতে লাগলো সে বড় হলে কী হবে? যখন তার বয়স কম ছিলো, তখন সে ভাবতো সে চিন্দোন্ইয়া বা ব্যালে নর্তকী হবে। প্রথম যে দিন সে তোমোএ স্কুলে এসেছিলো সেদিন তার মনে হয়েছিলো স্টেশনের টিকিট বিক্রেতা হওয়া ভালো। এখন ভাবছে সে অসাধারণ কোনো মেয়েলী কাজ করবে।

নার্স হওয়াও মন্দ নয়—তত্তচানের মনে হলো।

তবে... তখনই তত্তচানের মনে পড়লো কিছু দিন আগে হাসপাতালে আহত সৈনিকদের দেখতে গিয়েছিলো, তখন নার্স টিকা দিচ্ছিলো বা এই ধরনের কি যেন করছিলো, কাজটি তার একটু কঠিন মনে হলো ...।

'তাহলে কী হলে ভালো...' এ-কথা বলতে গিয়ে আনন্দে তত্তচানের মন ভরে গেলো।

'কেন? আমি কী হবো তা আগেই তো ঠিক করেছিলাম!'

তার পর তত্তচান তাইচানের কাছে গেলো। ঠিক সেই সময় সে ক্লাসঘরে তার অ্যাল্‌কোহল্‌ বাতিতে আগুন ধরিয়েছে।

তত্তচান গর্বের সঙ্গে বললো, 'ভাবছি আমি গুপ্তচর হবো!'

তাইচান অ্যাল্‌কোহল্‌ বাতির শিখা থেকে চোখ ফিরিয়ে তত্তচানের দিকে তাকালো। স্থির দৃষ্টিতে তত্তচানের মুখ দেখলো। তার পর চিন্তিত হয়ে জানালার বাইরে তাকালো। আবার তত্তচানের দিকে চোখ ফিরিয়ে

বুদ্ধিদীপ্ত গম্ভীর স্বরে, যাতে তত্তচান বুঝতে পারে, ধীরে ধীরে বললো, 'গুপ্তচর হতে হলে বুদ্ধিমতী হতে হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ হতে হয়...।'

এতটুকু বলে তাইচান একটু দম নিলো। আর তত্তচানের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে স্পষ্ট করে বললো, 'প্রথমে মহিলা গুপ্তচরকে রূপসী হতে হয়।'

তত্তচান ধীরে ধীরে তার চোখ তাইচানের থেকে সরিয়ে মেঝের দিকে তাকালো। আর তার মুখও একটু অবনত হওয়ার মতো ছিলো। তার পর একটু থেমে তত্তচানের থেকে চোখ সরিয়ে ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে বললো, 'তা ছাড়া মনে হয় বাচাল মেয়ের পক্ষে গুপ্তচর হওয়া সম্ভব নয়।...'

তত্তচান চমকে উঠলো। তাইচান তার গুপ্তচর হওয়ার বিপক্ষ বলাতে সে চমকে উঠেছে এমন নয়, বরং সে চমকে উঠেছে তাইচানের কথা সবই ঠিক বলে। তাইচান যা-কিছু বললো, তা ঠিকই, তত্তচানও আগে তা ভেবেছে।

সে নিজেও ভালো করে বুঝলো যে গুপ্তচর হওয়ার কোনো রকম যোগ্যতা তার নেই। তাইচান অবশ্যই বিদ্বেষবশত এ-কথাগুলো বলে নি। গুপ্তচর হওয়ার ভাবনা বাদ দেয়া ছাড়া তার কোনো উপায় ছিলো না। তার সঙ্গে এ-সম্পর্কে কথা বলে ভালো হলো।

তবুও!—তত্তাচান মনে মনে ভাবলো।

'আশ্চর্য!' তাইচান ও আমার বয়স একই। তবুও এতো কিছু সে জানে....।

যদি তাইচান তত্তচানকে বলে 'আমি পদার্থবিজ্ঞানী হতে চাই!'

তাহলে কী ধরনের উত্তর সে দিতে পারতো। হয়তো বলতো, 'তুমি অ্যাল্‌কোহল্‌ বাতিতে দিয়াশলাই দিয়ে ভালো করে আগুন ধরতে পারো, তাই মনে হয় তুমি পদার্থবিজ্ঞানী হতে পারবে...!'

এটা কি একটু ছেলেমানুষি হতো?

'তুমি জানো খেঁকশিয়ালের ইংরেজী ফক্স আর জুতোর ইংরেজী শুজ, তাই মনে হয় বিজ্ঞানী হতে পারবে।'

না, এটাও বেশি ভালো নয়।

তত্তচানের মনে হলো তাইচান যে-কোনো রকম মেধাবী কাজের উপযুক্ত। চুপ করে ফ্লাস্কের বুদবুদ স্থির দৃষ্টিতে দেখায় মগ্ন তাইচানকে সে মৃদু স্বরে বললো, 'তোমাকে ধন্যবাদ। গুপ্তচর হওয়ার ভাবনা ছাড়বো। তবে তুমি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ হবে।'

তাইচান বিড়বিড় করতে করতে মাথা চুলকাতে চুলকাতে খোলা বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলো।

তত্তচান তাইচানের পাশে দাঁড়িয়ে অ্যালকোহল বাতির শিখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলো—গুপ্তচর হতে না পারলে আমি কী হবো?

বেহালা

যুদ্ধ সকলের অজান্তে তত্তচান ও তার পরিবারের জীবনে ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা দিতে শুরু করেছিলো।

প্রতিদিন প্রতিবেশী বয়স্ক ও যুবকেরা গোলাকার সূর্যের পতাকা হাতে 'জিন্দাবা—দ !! জিন্দাবা—দ !!' চিৎকার করতে করতে যুদ্ধে যাচ্ছিলো। খাবার জিনিস একের পর এক দোকান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তোমোএ স্কুলের নিয়ম অনুসারে টিফিনের জন্য "সামুদ্রিক ও পাহাড়ী জিনিস" নিয়ে আসা বাস্তবিকভাবে কঠিন হয়ে উঠলো। তবে মায়েরা কষ্ট করে সামুদ্রিক গুল্ম ও প্লামের আচার দিয়ে তার ব্যবস্থা করতো, আস্তে আস্তে তাও কঠিন হয়ে উঠলো। সব কিছু শুধু রেশনে পাওয়া যেতো। কিন্তু মিষ্টি বা ওই ধরনের জিনিস তখন খোঁজ করেও কোথাও পাওয়া যেতো না।

তত্তচানের স্টেশনের আগের স্টেশনের নাম ও-ওকাইয়ামা। তত্তচান জানতো ওই স্টেশনের সিঁড়ির নিচে একটি ভেন্ডিং মেশিন আছে। ওই মেশিনে পয়সা দিলে ক্যারামেল বেরিয়ে আসে। সে যন্ত্রের ওপর আঁকা ছিলো সুস্বাদু ক্যারামেলের ছবি। পাঁচ সেন দিয়ে ছোট ও দশ সেন দিয়ে বড় বাক্সের ক্যারামেল পাওয়া যেতো। তবে সে যন্ত্রের ভেতরে অনেক দিন আগে থেকেই ক্যারামেল উধাও হয়ে গেছে। তাই

বার বার টাকা ঢুকিয়ে আঘাত করলেও কিছু বেরিয়ে আসতো না। কিন্তু তত্তচানের লেগে থাকার ধৈর্য অন্যদের থেকে বেশি।

'হয়তো একটা বাক্স আছে যা বেরিয়ে আসতে পারে।'

'হয়তো ভেতরে কোথাও আটকে আছে !'

তার এসব মনে হতো। তাই সে প্রত্যেক দিন ফেরার পথে কষ্ট করে ট্রেন থেকে নেমে পাঁচ সেন ও দশ সেন ঢুকিয়ে দেখতো। আর সব সময় 'চিরিং !' করে শুধু পয়সাটা বেরিয়ে আসতো।

এমন সময় এক লোক তত্তচানের বাবার কাছে একটা খবর নিয়ে এলো। সাধারণ লোকের জন্য ওটা ছিলো সুখবর। যদি যুদ্ধের অস্ত্র তৈরির কারখানায় গিয়ে সে বেহালায় সেনাসংগীত বাজায়, তাহলে তাকে চিনি, চাল ও ইয়োকান (মটরশুঁটি দিয়ে তৈরি মিষ্টি জেলি) দেয়া হবে। বিশেষ করে ওই সময় সে বেহালা বাদক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলো এবং "বিশিষ্ট বাদক" হিসেবে পদক পেয়েছিলো। তাই খবর নিয়ে যে লোকটি এসেছিলো, সে তত্তচানের বাবাকে বললো যে উপহার হিসেবে সে আরো অনেক জিনিস পাবে।

তত্তচানের মা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কী করবে? সেখানে যাবে?'

তখন তার কনসার্টের সংখ্যা কমে আসছিলো। প্রথম কথা হচ্ছে মানুষ দলে দলে যুদ্ধে যাচ্ছিলো আর অর্কেস্ট্রার সব সদস্যও ছিলো না। এন. এইচ. কে. (জাপান সম্প্রচার সংস্থা) অধিকাংশ অনুষ্ঠান প্রচার করছিলো যুদ্ধ সম্পর্কে। তাই বাবা ও তার সঙ্গীদের অনুষ্ঠান ছিলো খুবই কম। সুতরাং এ অবস্থায় কারখানায় বাজাতে পারাও ছিলো আনন্দের কথা।

মায়ের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে বাবা কিছুক্ষণ ভাবলো। তার পর বললো, 'আমার বেহালা দিয়ে যুদ্ধের সুর বাজাতে চাই না।'

মা বললো, 'না গেলে কেমন হয়। খাওয়ার একটা ব্যবস্থা হবেই।'

বাবা জানতো তত্তচান ভালো খাবার খেতে পাচ্ছে না। আর তত্তচান প্রত্যেক দিন ক্যারামেল বিক্রি মেশিনে নিষ্ফল চেষ্টা করে। বাবা এটাও জানতো যে যদি সে গিয়ে কয়েক মিনিট গান বাজায়, তাহলে যে পরিমাণে খাবার জিনিস উপহার হিসেবে পাবে, তাতে তার ঘর আনন্দে ভরে উঠবে, তত্তচানকেও পেট ভরে খাওয়াতে পারবে।

তবে তার চেয়ে সে বেশি গুরুত্ব দিতো তার সঙ্গীতকে। মা তাও ভালো করে জানতো, তাই 'গেলে ভালো হতো'—এ কথা সে বললো না।

বাবা তত্তচানকে দুঃখের সঙ্গে বললো, 'তত্তসুকে, আমি দুঃখিত !'

তত্তচান তখন ছোট। সে শিল্পকলা, মতবাদ ও কাজের কথা ভালো করে বুঝতো না। তবে সে জানতো তার বাবা সত্যিই বেহালা ভালো-বাসে। তাই তার পরিবার তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলো এবং তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন তাকে একঘরে করে রেখেছিলো। তা ছাড়া সে নানা দুঃসহ সমস্যায় পড়েছিলো, তবুও সে কখনো বেহালা ছাড়ে নি। তত্তচানের মনে হলো বাবা যা পছন্দ করে না, তা না করাই ভালো। তাই তত্তচান বাবার চারদিকে লাফাতে লাফাতে খুশির সঙ্গে বললো, 'কোনো চিন্তা নেই! আমিও বাবার বেহালা ভালোবাসি!'

পরের দিনও তত্তচান আবার ও-ওকাইয়ামা স্টেশনে নেমে ক্যারামেল ভেণ্ডিং যন্ত্রের যে ছিদ্র দিয়ে জিনিস বেরোয় তাতে উঁকি দিলো।

কিন্তু ওই ছিদ্র দিয়ে কিছু বেরিয়ে আসার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না।

প্রতিজ্ঞা

টিফিন শেষ হওয়ার পর গোল কারে সাজানো চেয়ার-ডেস্ক সরিয়ে নিলে মিলনায়তনটি বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

তত্তচান ঠিক করেছিলো আজ সে অন্য সকলের আগে প্রধান শিক্ষকের কাঁধে পড়বে। সে সব সময় ভাবতো, কিন্তু একটু দেরি হলেই দেখতে পেতো মিলনায়তনের মাঝখানে পায়ের ওপর পা গুটিয়ে বসা স্যারের কোলে অন্য ছেলেমেয়ে চড়ে বসেছে। দু একজন তার পিঠে চড়ে হৈচৈ করছে। প্রধান শিক্ষক লাল লাল মুখ করে হেসে বলতো 'থামো, থামো!'

তবে ছেলেমেয়েরা প্রাণপণ চেষ্টা করতো স্যারের গা থেকে না নামতে। তাই একটু দেরি হলে ছোটখাটো প্রধান শিক্ষকের পিঠের

ওপর ভিড় জমে যেতো। আজ তত্তচান মনস্থির করেছিলো, তাই স্যার আসার আগে থেকে তত্তচান মিলনায়তনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা

করছিলো। যখন স্যার এলো, তখন তত্তচান চিৎকার করে বললো, 'স্যার, কথা আছে, কথা আছে!!'

স্যার পায়ের ওপর পা আড়াআড়িভাবে রেখে বসতে বসতে উল্লাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, 'কী কথা ? কী কথা ?'

তত্তচান কয়েক দিন ধরে যে-কথা ভাবছে তাই সে স্পষ্ট করে শিক্ষককে বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু যখন স্যার পা আড়াআড়ি রেখে বসলো, তখনই তত্তচান ভাবলো আজ তার পিঠে চড়বো না। তার মনে হলো সে এমন কথা বলতে চায় যা ঠিক মতো মুখোমুখি বসে বলাই ভালো। তত্তচান স্যারের মুখোমুখি গা ঘেঁষে সোজা হয়ে বসলো আর মুখ একটু হেলালো। ছোট্ট বেলায় তার মা তার যে মুখভঙ্গিকে বলতো 'মিষ্টি মুখ।' সে তেমন মুখভঙ্গি করলো। সেটা ছিলো একটু মুখ খুলে একটু দাঁত দেখিয়ে হাসা শুক্রবারের মিষ্টি মুখ। সে নিজেও এই মুখভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস লাভ করতো এবং নিজেকে ভালো মেয়ে মনে করতো।

স্যার সামনের দিকে শরীর ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী কথা ?'

স্যারের বড় বোন বা মায়ের মতো তত্তচান আস্তে আস্তে কোমল স্বরে বললো, 'আমি যখন বড় হবো, তখন এ-স্কুলের শিক্ষিকা হবো। সত্যিই হবো।'

তত্তচান মনে করছিলো স্যার হাসবে, কিন্তু স্যার না হেসে গম্ভীর মুখে তত্তচানকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কথা দিচ্ছো ?'

স্যারের মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো যেন সে চায় যে তত্তচান শিক্ষিকা হোক।

তত্তচান সজোরে মাথা দুলিয়ে বললো, 'প্রতিজ্ঞা করছি !' এ-কথা বলতে বলতে মনে মনে সে নিজেকেও নিজে বললো, 'সত্যিই। আমি অবশ্যই হবো !'

এ-মুহূর্তে তার মনে পড়ছিলো তার তোমোএ স্কুলে আসার প্রথম সকালের কথা...বহুদিন আগের কথা বলে মনে হয়, তার প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার...প্রথমে প্রধান শিক্ষকের ঘরে স্যারের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। ঘণ্টা চারেকের মতো দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগ দিয়ে স্যার তার কথা শুনেছিলো। এর আগে ও পরে তত্তচানের কথা চার ঘণ্টা ধরে আর কোনো বয়স্ক লোক শোনে নি। তার কথা শেষ হওয়ার পর স্যার বলেছিলো আজ থেকে এখন থেকে তুমি এ-স্কুলের ছাত্রী।

স্যারের কথার উষ্ণতার স্বর তার মনে পড়লো। এখন তত্তচানের মনে হচ্ছে সে যেন সে সময়ের চেয়ে এখন আরো অনেক বেশি করে কোবাইয়াশি স্যারকে পছন্দ করে। সে স্থির করেছিলো স্যারের জন্য সে কাজ করবে। স্যারের উপকারে আসে এমন যে-কোনো কাজ করবে।

তত্তচানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনে স্যার অন্যান্য দিনের মতো লজ্জা না পেয়ে ফোকলা দাঁত দেখিয়ে উল্লাসে হেসে উঠলো।

তত্তচান স্যারের দিকে কড়ে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'প্রতিজ্ঞা !'

স্যারও তার কড়ে আঙুল বাড়িয়ে দিলো। স্যারের কড়ে আঙুল ছোট, তবে শক্তসমর্থ ও নির্ভরযোগ্য। তত্তচান ও স্যার তাদের একের কড়ে আঙুল অন্যের সঙ্গে আংটার মতো লাগিয়ে 'প্রতিজ্ঞা।' করলো। স্যার হাসছিলো। তত্তচানও স্যারের উল্লাস দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে উঠলো।

সে তোমোএ স্কুলের শিক্ষিকা হবে !!

কী চমৎকার কথা !

(আমি শিক্ষিকা হলে)...

তত্তচান অনেক কিছু কল্পনা করলো, সেগুলো হচ্ছে—'লেখাপড়া বেশি না করে খেলাধুলো করাবো, মাঠের রান্না ও ক্যাম্পিং অনেক বার হবে, তারপর হাঁটাহাঁটি !'

স্যার খুব খুশি হলো। তত্তচান বড় হলে কেমন হবে তা কল্পনা করা কঠিন ছিলো। সে ভাবছিলো নিশ্চয় তত্তচান তোমোএ স্কুলের শিক্ষিকা হবে। আর তার মনে হচ্ছিলো তোমোএ স্কুলে পড়াশোনা করা প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মধ্যে টিকে থাকবে ছোট শিশুর মন। তাই তারা প্রত্যেকে তোমোএ স্কুলের শিক্ষক হতে পারবে।

জাপানের আকাশে বোমারু মার্কিন বিমান আবির্ভূত হবে, এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র—লোকেরা যখন এমন কথা বলাবলি করছিলো, তখন সারি সারি ট্রেন কামরায় সাজানো তোমোএ স্কুলের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ও একজন ছাত্রী প্রতিজ্ঞা করছিলো দশ বছরেরও বেশি সময়ের পরের কথা নিয়ে।

রকি হারিয়ে গেলো

অনেক সৈন্য মারা গেলো আর খাদ্যের অভাব দেখা দিলো। সবাই জীবন কাটাচ্ছে ভয়-ভীতির মধ্যে। তবে অন্যান্য বছরের মতো আবার গ্রীষ্ম এলো। যুদ্ধে জয়ী হওয়া দেশের ওপর ও পরাজিত দেশের ওপর সে একই রকম কিরণ ছড়ালো।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হবে তাই তত্তচান কামাকুরার চাচার বাসা থেকে টোকিওতে নিজের বাসায় ফিরে এলো।

তোমোএ স্কুলে এবার ক্যাম্পিং ছিলো না, দোই উষ্ণ প্রস্রবণে বেড়ানো ইত্যাদি ছিলো না। মনে হচ্ছিলো গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দ্বিতীয় বারের মতো অমন আনন্দ করা আর হবে না। তত্তচান প্রত্যেক গ্রীষ্মের ছুটি তার চাচাতো ভাইবোনের সঙ্গে কামাকুরায় কাটাতো। তবে এবারের গ্রীষ্ম অন্যান্য গ্রীষ্মের থেকে একেবারে ভিন্ন। প্রত্যেক বছর তার একটা চাচাতো ভাই এতো চমৎকার ভূতের গল্প শোনাতো যে সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠতো। এবার সে সৈন্য হয়ে যুদ্ধে চলে গেলো, তাই ভূতের গল্প শোনা হলো না। তার যে চাচা কৌতুকের সঙ্গে আমেরিকার জীবনের গল্প বলতো সে গল্প সত্যি না মিথ্যে বোঝা কঠিন, সেও যুদ্ধে চলে গিয়েছিলো। এ-চাচা একজন প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক ক্যামেরামান। তার নাম ছিলো তাগুচি শুজি।

তাগুচি শুজি 'নিপ্পন নিউজ'-এর নিউইয়র্ক শাখার প্রধান ও 'আমেরিকা মেট্রো নিউজ'-এর দূরপ্রাচ্য প্রতিনিধি হওয়ার পর শু. তাগুচি নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সে তত্তচানের বাবার পিঠাপিঠি বড় ভাই। তারা আপন ভাই ছিলো। তত্তচানের বাবা তার মায়ের পরিবারের নাম গ্রহণ করেছিলো বলে তাদের নাম ভিন্ন হয়ে যায়। আসলে তত্তচানের বাবারও পারিবারিক নাম তাগুচি হওয়ার কথা ছিলো।

এ-চাচার তোলা 'রাবাউল যুদ্ধে'র ও অন্যান্য সংবাদ চিত্র একের পর এক প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হতো। তবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে শুধু ছবি পাঠাতো, তাই তত্তচানের চাচী ও চাচাতো ভাইবোন তার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলো। কারণ চিত্র-সংবাদিকদের সব সময় বিপদজ্জনক দৃশ্যের ছবি

তুলতে হয়, তাই তাকে সৈন্য দলের অনেক আগে গিয়ে সেখানে অপেক্ষা করে থাকতে হয়। সৈন্যদের পেছনে পেছনে গেলে শুধু তাদের পেছনের দৃশ্যের ছবি তুলতে পারে। আর পথ না থাকলে সৈন্যদের আগে আগে রাস্তাহীন জায়গায় রাস্তা বানিয়ে বানিয়ে এগুতে হয়। এই রাস্তার আগে বা পাশে দাঁড়িয়ে তাকে ছবি তুলতে হয়। সৈন্যদের তৈরি রাস্তা দিয়ে পেছনে পেছনে গেলে এই সংবাদ চিত্র তোলা সম্ভব নয়। এমন কথা বয়স্ক আত্মীয়স্বজনেরা বলাবলি করতো। কামাকুরার সমুদ্র তীরকেও কেন যেন এবার জনহীন মনে হলো।

তাদের মধ্যে মজার ছেলে ছিলো ইয়াচচান। সে চাচার সবচেয়ে বড় ছেলে আর তত্তচানের চেয়ে এক বছরের ছোট। তত্তচান ও অন্যান্য ছেলেমেয়েরা একই মশারীর নিচে শুতো। বিছানায় শোয়ার আগে ইয়াচচান 'মহামান্য সম্রাট, জিন্দাবাদ !!' বলে বারবার ধপাস করে নিচে পড়ে নিষ্ঠার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত সৈনিকের মতো ভান করতো। যে রাতে সে এরকম ভান করতো, কেন জানি না সেদিন মধ্য রাতে সব সময় সে ঘুমের মধ্যে হেঁটে গিয়ে বারান্দা থেকে নিচে পড়তো আর গোলমাল সৃষ্টি করতো।

বাবার কাজের জন্য তত্তচানের মা-বাবার সঙ্গে টোকিওতে ছিলো। আজ গ্রীষ্মের ছুটির শেষ দিন। তত্তচান তার এক আত্মীয় বড় বোনের সঙ্গে টোকিওতে ফিরে এলো। তত্তচানকে সে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিলো।

অন্যান্য দিন বাসায় ফিরেই সে যেমন কুকুর রকির খোঁজ করে, আজও প্রথমে সে রকির খোঁজ করলো। রকিকে কোথাও পাওয়া গেলো না। সে বাসার ভেতরে ছিলো না, বাগানে ছিলো না। এমন কি বাবার শখের অর্কিডের গ্রীন হাউসেও ছিলো না। তত্তচান উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তত্তচান সাধারণত যখন তার বাসার কাছাকাছি ফিরে আসতো, তখন কোথা থেকে যেন রকি তার সামনে লাফিয়ে আসতো। তত্তচান বাসা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে রকির নাম ধরে ডাকলো। কিন্তু কোথাও সেই প্রিয় চোখ, কান ও লেজ দেখা গেলো না। সে যতক্ষণ বাইরে ছিলো ততক্ষণে রকি বাসায় ফিরে এসেছে ভেবে তত্তচান দৌড়ে বাসায় ফিরে এলো। কিন্তু রকি তখনও ফিরে আসে নি।

তত্তচান মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'রকি কোথায়?'

কিছুক্ষণ ধরে তত্তচান ছোটাছুটি করছে মা তা অবশ্যই জানে, তবে সে চুপ রইলো।

তত্তচান মা'র স্কার্ট টানতে টানতে জিজ্ঞেস করলো, 'রকি কথায়?'

মনে হচ্ছিলো মা'র পক্ষে উত্তর দেয়াটা বেশ কঠিন তবুও বললো, 'হারিয়ে গেছে।'

তত্তচান বিশ্বাস করতে পারলো না।

'হারিয়ে গেছে?'

তত্তচান মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কবে?'

একটু দ্বিধা করে মা বললো. 'তুমি কামাকুরা যাওয়ার পর পরই।'

মা তাড়াতাড়ি আরো বলতে লাগলো, 'আমরা সব জায়গায় খোঁজ করলাম। অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজলাম। সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না। তোমাকে কী বলবো তাই ভাবছিলাম...। আমাকে ক্ষমা করো...।'

তখন তত্তচান সব স্পষ্ট বুঝতে পারলো।

রকি নিশ্চয়ই মরে গেছে।

আমি যাতে দুঃখ না পাই তাই মা বোধ হয় রকির হারিয়ে যাওয়ার কথা বলছে। আসলে রকি নিশ্চয়ই মারা গেছে।

তত্তচানের কাছে তা স্পষ্ট ছিলো। তত্তচান অনেক দূর গেলেও রকি কখনো বেশি দূর যেতো না। কেননা সে জানতো তত্তচান অবশ্যই ফিরে আসবে।

আমাকে কিছু না বলে রকির পক্ষে বাইরে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। — এটা তার প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো।

তত্তচান আর মাকে কিছু বললো না। কেননা সে মায়ের দুঃখ ভালো করে বুঝলো। তত্তচান নিচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললো, 'কোথায় গিয়েছিলো—?'

শুধু এইটুকু বলতে পারলো। তত্তচান দোতলায় নিজের ঘরে ছুটে গেলো। রকিহীন বাসাকে অন্যের বাসার মতো মনে হলো তত্তচানের। ঘরে ঢুকে কোনো রকমে কান্না চেপে রেখে আরেক বার ভাবলো। ভাবলো, সে রকির প্রতি কোনো "খারাপ ব্যবহার করেছে কি না বা তাকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার মতো ব্যবহার করেছে কি না?"

কোবাইয়াশি স্যার সব সময় তোমোএ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বলতো, 'জীবজন্তুকে প্রতারণা কোরো না। যে পশুরা তোমাদের বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা নিষ্ঠুরতা। কুকুরকে "তোমার হাত দাও, মিষ্টি দেবো।" বললে কুকুর যখন পা তোলে তখন তাকে কিছু না দিয়ে বঞ্চিত কোরো না। তাহলে কুকুর তোমাদের বিশ্বাস করবে না। তার স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে।'

তত্তচান সব সময় এ-নীতি পালন করে, সে কখনো রকিকে প্রতারণা করে নি। মনে পড়ার মতো কোনো খারাপ কাজ রকির সঙ্গে করে নি।

তখন তত্তচানের চোখে পড়লো মেঝের ওপরে রাখা খেলনা ভালুকের পায়ের সঙ্গে লেগে থাকা একটা জিনিসের ওপর। তখন পর্যন্ত তত্তচান নিজেকে সংবরণ করেছিলো, কিন্তু ওটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তত্তচান ডুকরে কেঁদে উঠলো। জিনিসটা ছিলো রকির হালকা বাদামী রঙের লোম। কামাকুরা রওনা হওয়ার সকাল বেলা তত্তচান রকির সঙ্গে এখানে গড়াগড়ি খেলেছিলো, তখন রকির শরীর থেকে ঝরেছিলো ওই লোম। রকির সেই অল্প কয়েকটি লোম হাতে শক্ত করে ধরে তত্তচান অনেক অনেকক্ষণ কাঁদলো। তার অশ্রু ও কান্নার স্বর থামলো না।

প্রথমে ইয়াসুআকিচান আর এখন রকি। তত্তচান আবার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালো।

টী পার্টি

তোমোএ স্কুলের কাজের লোক রিয়োচানকে সবাই ভালোবাসতো। অবশেষে তার যুদ্ধে যাওয়ার সময় এলো। স্কুলের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে সে অনেক বড়। সবাই তাকে বন্ধুর মতো 'রিয়োচান!!' বলে ডাকতো।

তারা সবাই যখন কোনো অসুবিধায় পড়তো, তখন রিয়োচান তাদের ত্রাণকর্তা হয়ে উঠতো। রিয়োচান সব কাজ করতে পারতো। সব সময় সে নিশ্চুপ হাসতো আর অসুবিধায় পড়া ছেলেমেয়েরা কী চায়, সে সহজে বুঝতে পারতো। যখন টয়লেটের ময়লার ট্যাংকের কংক্রিটের ঢাকনাটা খোলা ছিলো আর না জেনে তত্তচান দূর থেকে দৌড়ে এসে তার মধ্যে পড়ে বুক পর্যন্ত ডুবে গেলো, তখন রিয়োচান তত্তচানকে তোলার জন্য ছুটে এসেছিলো। এবং কোনো রকম দ্বিধা না করে তত্তচানকে ধুয়ে মুছে দিয়েছিলো।

রিয়োচান যুদ্ধে যাবে বলে প্রধান শিক্ষক বললো, 'তার জন্য একটা টী পার্টি দেবো।'

'টী পার্টি?'

সে আবার কী? সবাই অত্যন্ত খুশি হলো। কেননা তারা যা জানে না সে সম্পর্কে জানতে পারা তো খুশির কথা। তারা অবশ্যই কোবাইয়াশি স্যারের বিবেচনাটুকু বুঝতে পারলো না। স্যার 'সোবেৎসুকাই (বিদায় সংবর্ধনা)'-র বদলে 'সাওয়াকাই (টী পার্টি)' বলেছিলো। বিদায় সংবর্ধনা বলাটা দুঃখজনক। ওপরের শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারতো যে রিয়োচান যুদ্ধে গেলে আর ফিরে আসবে না। তবে তারা কেউ কখনো টী পার্টিতে যায় নি, তাই সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

স্কুলের ছুটির পর কোবাইয়াশি স্যার সবাইকে মিলনায়তনে টিফিনের সময়ের মতো গোল করে ডেস্কগুলো সাজিয়ে রাখতে বললো। সবাই গোল হয়ে বসলো। কোবাইয়াশি স্যার প্রত্যেককে একটি করে সুরুমে (শুকনো কাটেলমাছের টুকরো) দিলো। যুদ্ধের সময় এটাও বেশ বিলাসী খাদ্যবস্তু হয়ে উঠেছিলো। তারপর স্যার রিয়োচানের পাশে বসে তার সামনে রাখলো একটা গ্লাস, তাতে ছিলো একটু সাকে মদ। ওই মদ ছিলো শুধু যুদ্ধযাত্রীদের জন্য বরাদ্দ করা।

প্রধান শিক্ষক বললো, 'এটা তোমোএ স্কুলের প্রথম টী পার্টি। আমরা এটাকে আনন্দে মুখর করে তুলবো। তোমাদের রিয়োচানকে বলার মতো কোনো কথা থাকলে বলো। রিয়োচানেরও ছাত্রছাত্রীদেরকে বলার মতো কথা থাকলে বলতে পারো। এক একজন মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলো, এসো, এখন শুরু করি।'

এই প্রথম তারা সুরুমে খেলো। এই প্রথম বার তারা রিয়োচানের সঙ্গে বসলো আর এই প্রথম বার দেখলো তারা রিয়োচানকে একটু একটু মদ খেতে।

একের পর এক তারা দাঁড়িয়ে রিয়োচানের দিকে তাকিয়ে তাদের কথা বললো। শুরুতে কেউ একজন বললো, 'ভালো থেকো', 'অসুস্থ হয়ে পড়ো না', ওই ধরনের কথা। যখন তত্তচানের ক্লাসের মিগিতা বললো, 'পরের বার আমাদের গ্রাম থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পিঠা এনে সবাইকে

দেবো !!' তখন সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। কারণ মিগিতা বছর খানেক আগে তার গ্রামে খেয়েছিলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পিঠা এবং তার স্বাদ সে ভুলতে পারে নি। মাঝেমাঝে সে সবাইকে বলতো যে সে ওই পিঠা এনে সবাইকে খাওয়াবে, কিন্তু এ পর্যন্ত একবারও আনে নি।

মিগিতার এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পিঠার কথা শুনে প্রধান শিক্ষকের প্রথমে হৃৎপিণ্ড 'ধ্বক্ !!' করে উঠলো। সাধারণভাবে ওটা ছিলো অশুভ বাক্য। তবে মিগিতা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কথাটা বললো, 'সবাইকে সুস্বাদু খাবার খাওয়াতে চাই।' এই তার উদ্দেশ্য। তাই স্যার সবার সঙ্গে হেসে উঠলো। রিয়োচানও অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। কারণ মিগিতা রিয়োচানকেও অনেক দিন থেকে এ-কথা বলে এসেছে।

ও-ওএ সবাইকে কথা দিলো, 'আমি জাপানের এক নম্বর উদ্যানবিদ হবো।' ও-ওএ ছিলো তোদোরোকির এক বিশাল উদ্যানের মালিকের পুত্র। আওকি কেইকোচান নীরবে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে অন্যান্য দিনের মতো সলজ্জ হাসি হেসে নীরবে মাথা নত করে নিজের সিটে ফিরে এলো। তত্তচান উদ্দীপ্ত হয়ে মাঝখানে গিয়ে কেইকোচানের মাথা নত করার সঙ্গে নিজের মন্তব্য যোগ করলো, 'কেইকোচানদের মোরগ উড়তে পারে। আমি কিছু দিন আগে দেখেছি।'

আমাদেরা বললো, 'আহত বেড়াল বা কুকুর থাকলে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি সারিয়ে দেবো।'

তাকাহাশি চোখের পলকে ডেস্কের নিচ দিয়ে ছুটে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল হয়ে বললো, 'রিয়োচানকে ধন্যবাদ। সব কিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

সাইশো আইকো বললো, 'রিয়োচান, আমি একবার আছাড় খেয়েছিলাম, তখন তুমি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলে। এর জন্য ধন্যবাদ। আমি ভুলবো না।' রুশ-জাপান যুদ্ধের খ্যাতি অর্জনকারী সেনাপতি তোওগো হচ্ছে তার বড় কাকা। আর মেইজি যুগের রাজপ্রাসাদের কবিতার আসরের কবি সাইশো আৎসুকো তার আত্মীয় ছিলো (তবে সাইশো আইকা এ-কথা কখনো নিজের মুখে প্রকাশ করে নি।)

মিইয়োচান প্রধান শিক্ষকের মেয়ে। রিয়োচানের সঙ্গে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই তার চোখ জলে ভরে উঠলো। সে শুধু বললো, 'রিয়োচান সাবধানে থেকো। তোমাকে চিঠি লিখবো।'

তত্তচানের বলার অনেক কথা ছিলো, তাই অসুবিধায় পড়লো, অনেক ভেবে সে কথা বললো, 'রিয়োচান চলে যাওয়ার পরেও আমরা প্রত্যেক দিন টী পার্টি করবো !!'

প্রধান শিক্ষক ও রিয়োচান হেসে উঠলো। সবাই হেসে উঠলো। এমন কি তত্তচান পর্যন্ত হেসে উঠলো।

তত্তচানের কথা পরের দিন থেকে সত্য হয়ে উঠলো। সময় পেলেই তারা দলে দলে 'টী পার্টি খেলা' খেলতে শুরু করতো। শুকনো ক্যাটেল মাছের টুকরোর বদলে গাছের ছালটাল চুষতে চুষতে মদের বদলে গ্লাস থেকে অল্প অল্প পানি খেতে খেতে 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পিঠা নিয়ে আসবো' এবং এমন নানা কথা বলতে বলতে হেসে উঠে তারা একে অপরের কাছে নিজের মনের কথা বলতো। খাবার না থাকলেও তাদের টী পার্টি আনন্দময় ছিলো।

এই টী পার্টি ছিলো তোমোএ স্কুলে রেখে যাওয়া রিয়োচানের চমৎকার উপহার। তখন এ-কথা কারো মনে হয় নি, তবে সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগে তোমোএ স্কুলে এটাই ছিলো শেষ আনন্দময় অন্তরঙ্গ খেলা।

রিয়োচান তোও-ইয়োকো-সেন-লাইনের ট্রেনে চড়ে রওনা হলো।

কোমল-হৃদয় রিয়োচান চলে গেলো। তার বদলে অবশেষে টোকিও-র আকাশে আবির্ভূত হলো মার্কিন বিমান, আর প্রত্যেক দিন বোমা ফেলতে শুরু করলো।

সাইয়োনারা, সাইয়োনারা—বিদায়, বিদায়

তোমোএ স্কুল বোমায় পুড়ে গেলো।

তখন রাত। স্কুলের সঙ্গে লাগোয়া প্রধান শিক্ষকের বাসা। মিইয়োচান, তার বড় বোন মিসাচান ও মিইয়োচানের মা কুহোন্‌বুৎসু পুকুরের পাশের তোমোএ স্কুলের শাকসব্জির বাগানে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

বি-২৯ বিমান থেকে বহু আগ্নেয় বোমা তোমোএ স্কুলের ট্রেন ক্লাস-ঘরের ওপর পড়লো।

স্কুলটি ছিলো প্রধান শিক্ষকের স্বপ্ন। সেটি ঢাকা পড়লো আগুনের শিখায়। স্যারের সবচেয়ে ভালোবাসার ধন, ছেলেমেয়েদের হাসাহাসির আওয়াজ ও গানের সুরের বদলে স্কুলটি ভয়ঙ্কর শব্দ করে ভেঙে পড়লো। সে আগুনে স্কুল এমনভাবে পুড়ে গেলো যে তার চিহ্নও রইলো না। জিইয়ুগাওকা-এলাকার এখানে সেখানে থেকে আগুনের শিখা উঠতে লাগলো।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রধান শিক্ষক এক দৃষ্টিতে দেখছিলো তোমোএ স্কুল পুড়ে যাওয়ার দৃশ্য। অন্যান্য দিনের মতো সে পরে ছিলো তিন পিসের পুরোনো কালো রঙের স্যুট। অন্যান্য দিনের মতো কোটের পকেটে ঢোকানো ছিলো তার দুই হাত। আগুন দেখতে দেখতে প্রধান শিক্ষক পাশে দাঁড়ানো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত তোমোএ-কে বললো, 'আচ্ছা, এর পর কী ধরনের স্কুল আমি তৈরি করবো?'

তোমোএসান, বিস্মিত হয়ে কোবাইয়াশি স্যারের কথা শুনলো।

স্কুলকে ঘিরে ফেলা অগ্নিশিখার চেয়েও অনেক তীব্র ছিলো ছেলে-মেয়েদের প্রতি কোবাইয়াশি স্যারের ভালোবাসা আর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। স্যার ভেঙে পড়ে নি।

তখন তত্তচান মানুষে ঠাসা উদ্বাস্তদের নিয়ে যাওয়া ট্রেনের একটি কক্ষে প্রায় চাপা পড়া অবস্থায় ঘুমুচ্ছিলো। ট্রেন উত্তর-পুব দিকে যাচ্ছিলো।

অন্ধকার জানালার বাইরে তাকাতে তাকাতে তার মনে পড়লো বিদায় নেয়ার সময়ের সেই স্যারের কথা—'আবার দেখা হবে।' এবং সব সময়

সে যে-কথা বলতো, 'তুমি আসলে ভালো মেয়ে!' সেই কথা। চেষ্টা করবো যাতে এ-কথা ভুলে না যাই।

শিগগির আবার কোনো দিন কোবাইয়াশি স্যারের সঙ্গে দেখা হবে। এ-কথা ভেবে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

উদ্বিগ্ন যাত্রীদের নিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে গর্জন করে ছুটে চলছিলো ট্রেন।

পুনশ্চ—১

আমার দীর্ঘদিন ধরে লালিত বাসনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাসনা ছিলো তোমোএ স্কুল নিয়ে কিছু লেখা। তা পড়ার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। এ-বইয়ের কাহিনীগুলোর কোনোটাই বানানো নয়, তার সবগুলোই সত্যিই ঘটেছিলো। সুখের কথা অনেক কিছু আমি ভুলে যাই নি। সেগুলো আমি লিখে রাখতে চাই। আরেকটা কথা, এ বইয়ের 'প্রতিজ্ঞা' পরিচ্ছেদে কোবাইয়াশি স্যারের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে 'বড় হলে আমি তোমোএ স্কুলের শিক্ষিকা হবো।', আমি তা পালন করতে পারি নি। তাই আমার মনে হলো একের পর এক উদাহরণ দিয়ে আমার জানানো উচিৎ কোবাইয়াশি স্যার কেমন মানুষ ছিলেন আর ছেলেমেয়েদের তিনি কতো গভীরভাবে ভালোবাসতো এবং ছেলেমেয়েদের তিনি কীভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

দুঃখের কথা কোবাইয়াশি স্যার আঠারো বছর আগে ১৯৬৩ সালে লোকান্তরিত হন। এখন যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তবে তাঁর থেকে অনেক কিছু শিখতে পারতাম। এটা ভেবে আমার কষ্ট হয়।

এভাবে আমি লিখতে শুরু করলাম আর আমার শৈশবের তোমোএ স্কুলের মধুর স্মৃতিগুলো শুধু মনে পড়তে লাগলো। এখন আমি বুঝতে পারছি, 'আহ্, কোবাইয়াশি স্যারের উদ্দেশ্য এই ছিলো।' 'স্যার এতো

ছোটছোট কথা পর্যন্ত ভেবেছিলেন...' এ-কথা যখন মনে হয়, তখন বিস্মিত ও আলোড়িত হয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করি। আমার সম্পর্কে তিনি সব সময় বলতেন, 'তুমি আসলে ভালো মেয়ে।' এ-কথা এখন পর্যন্ত আমাকে কতখানি উৎসাহিত করে এসেছে, তা পরিমাপ করা যায় না। যদি আমি তোমোএ স্কুলে ভর্তি না হতাম আর কোবাইয়াশি স্যারের সঙ্গে আমার দেখা না হতো, তাহলে সম্ভবত আমি যা কিছুই করি না কেন আমার ওপর 'খারাপ মেয়ে'-র লেবেল সেঁটে দেয়া হতো। আর হীনমন্যতাবোধ হয়ে আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে বড় হতাম।

১৯৪৫ সালে টোকিও-র ওপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের সময় তোমোএ স্কুল পুড়ে যায়। কোবাইয়াশি স্যারের নিজের টাকা দিয়ে স্কুলটি নির্মাণ করেছিলেন, তাই স্কুলটি পুনর্নির্মাণে অনেক সময় লেগে গেলো। যুদ্ধের পর পুড়ে যাওয়া জায়গায় স্যার প্রথম কিণ্ডারগার্টেন শুরু করেন এবং তার সাথে সাথে কুনিতাচি সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু বিভাগ (বর্তমানে শিশু শিক্ষা বিভাগ) প্রতিষ্ঠা করার জন্য সহায়তা করতেন এবং কুনিতাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরিদ্‌মিক্স পড়াতেন। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনেও তিনি সহায়তা করেন। তবে স্যারের স্বপ্ন ও নিজের আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় আবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ৬৯ বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন।

অনেক অনেক দিন আগে তোমোএ স্কুল যেখানে ছিলো সেখানে তোও-ইয়োকো-সেন-লাইনের জিইয়ুগাওকা-স্টেশন থেকে পেঁছিতে পায়ে হেঁটে তিন মিনিট সময় লাগতো। এখন সেখানে পিকক সুপারস্টোর আর তার গাড়ি রাখার জায়গা। আমি জানতাম আগের স্কুলের কোনো চিহ্নও অবশিষ্ট নেই, তবুও পুরোনো প্রিয় জিনিসের কথা মনে হওয়ায় আমি সে জায়গা দেখার জন্য বর্তমান গাড়ি রাখার জায়গার কাছাকাছি যেখানে ট্রেন ক্লাসঘর ও স্কুলমাঠ ছিলো সেখানে গাড়ি নিয়ে গেলাম। তখন গাড়ি রাখার জায়গার লোকটি আমার গাড়ি দেখে চিৎকার করে উঠলো, 'গাড়িতে ভরে গেছে! গাড়িতে ভরে গেছে! না! না!!'

আমি বলতে চেয়েছিলাম, 'আমি তো আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা ভাবছি।' কিন্তু এ-কথা কেউ বুঝবে না, তাই দ্রুত সেখান থেকে চলে

এলাম। কেন যেন হঠাৎ বেদনার্ত হয়ে চলন্ত গাড়ির মধ্যে ঝর ঝর করে আমার চোখের জল পড়তে লাগলো।

মনে হয় জাপানেও বহু ভালো শিক্ষাবিদ আছেন। মনে হয় তাঁদের সকলেরই আদর্শ, ভালোবাসা ও স্বপ্ন আছে আর তা বাস্তবায়িত করা কতো দুরূহ আমিও তা ভালোভাবে বুঝতে পারি। কোবাইয়াশি স্যার ১৯৩৭ সালে তোমোএ বিদ্যালয় শুরু করার আগে অনেক অনেক বছর গবেষণা করেছিলেন আর ১৯৪৫ সালে তা পুড়ে গেলো, স্কুলটি ছিলো খুব অল্প সময়ের জন্য।

মনে হয় যখন আমি ওই স্কুলে ছিলাম, তখন কোবাইয়াশি স্যারের উদ্দীপনা সব চেয়ে তীব্র হয়ে উঠেছিলো। সে সময় তাঁর পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিলো। এ-ক্ষেত্রে আমি ছিলাম ভাগ্যবতী। যখন ভাবি যদি যুদ্ধ না বাঁধতো তাহলে আরো কতো ছেলেমেয়ে কোবাইয়াশি স্যারের কাছে শিক্ষা লাভ করতে পারতো। যুদ্ধের এই ক্ষতির জন্য আমার খুব দুঃখ লাগে।

এই বইতে আমি কোবাইয়াশি স্যারের শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছি। তাঁর বিশ্বাস ছিলো জন্মের সময় প্রত্যেক শিশুর স্বভাব ভালো থাকে, বড় হতে হতে চারদিকের পরিবেশ ও বয়স্কদের প্রভাবে তা নষ্ট হয়ে যায়। তাই তিনি চেয়েছিলেন প্রতিটি শিশুর "ভালো স্বভাব" খুঁজে বের করে তার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষে পরিণত করতে।

অকৃত্রিমতা স্যারের পছন্দ ছিলো। তিনি মনে করতেন ছেলেমেয়েদের স্বভাব যথাসম্ভব অকৃত্রিম হওয়া উচিত। আর তিনি বাস্তব প্রকৃতিও ভালোবাসতেন। তাঁর কনিষ্ঠতম কন্যা মিইয়োচানের কথা অনুযায়ী তার ছোট বেলায় সব সময় তিনি 'এসো, প্রকৃতির মধ্যে ছন্দ আছে, তা খুঁজে বের করি।' এ-কথা বলে মিইয়োচানকে নিয়ে বেরুতেন। এমন বেড়ানোর সময় তাকে নিয়ে বড় বড় গাছের পাশে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতেন বাতাসে গাছের পাতা ও ডাল কীভাবে দোলে আর লক্ষ্য করতেন ডালের ওপরের ডাল ও পাতা। এবং এগুলোর সঙ্গে কাণ্ডের কেমন সম্পর্ক। আরো দেখতেন প্রচণ্ড ও মৃদু বাতাসে গাছের পাতা কীভাবে দোলে আর ওই দোলার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?... শুনেছি বাতাস না

বইলে অনেকক্ষণ ধরে তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। শুনেছি, শুধু গাছের পাতার বেলায় নয়, নদীর বেলায়ও তাই করতেন। পাশের তামাগাওয়া নদীতে গিয়ে নদীর প্রবাহ দেখতেন। দেখে দেখে তাঁর কখনো ক্লান্তি লাগতো না।

তবে মনে হয় যুদ্ধকালীন সময় শিক্ষামন্ত্রণালয় ও জাপান সরকার এমন স্বাধীন ও মুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় চালানোর অনুমতি দেয়া সম্পর্কে কোনো কোনো পাঠকের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিলো। সেই সময়ের সব কথা এখন তো জানার উপায় নেই তবে কোবাইয়াশি স্যার বিজ্ঞাপন ও প্রচারকে ঘৃণা করতেন, এখনকার কথায় এটাকে গণসংযোগ বিদ্বেষ বলা যায়। তাই যুদ্ধের আগেও তিনি স্কুলের কোনো ছবি তুলতে দেন নি আর এমন কোনো বিজ্ঞাপন দেন নি যে এটা একটা 'অসাধারণ বিদ্যালয়'। ছোট এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে সব মিলে পঞ্চাশজনেরও কম ছাত্রছাত্রী ছিলো বলে সেটি অন্য কারো চোখে না পড়ে থাকতে পেরেছিলো।

এখনও আমরা তোমোএ স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বছর নভেম্বরের তিন তারিখে—ওই চমৎকার ক্রীড়ানুষ্ঠানের স্মরণ দিবসে কুহোনুবুৎসু মন্দিরের একটা ঘর ধার নিয়ে একত্র হই এবং একটি আনন্দময় দিন কাটাই। সবাই এখন চল্লিশ বছর পেরিয়ে কয়েক বছর পর পঞ্চাশ বছর হয়ে যাবে। এই বয়সীরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'সাক্কোচান' ও 'ও-ওএকুন।' বলে নাম ধরে ডেকে বহু দিন আগের মতো বন্ধুত্ব পাতায়। এ-পুনর্মিলনও ছিলো আমাদের জন্য রেখে যাওয়া কোবাইয়াশি স্যারের উপহার।

এ-কথা সত্য যে আগের প্রাথমিক স্কুল থেকে আমি বহিষ্কৃত হয়েছিলাম। সব কিছু আমার ভালোভাবে মনে ছিলো না, পরে মা আমাকে চিন্দোন্ইয়া আর ডেস্কের ঢাকনা ইত্যাদির কথা বলেছিলো। মনে মনে ভাবছিলাম, 'এটা সত্যিই? আমার মনে হয় নি আমি এতো দুষ্টু মেয়ে ছিলাম।' আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে আসাহি টেলিভিশনে 'নারা কাজু-র মর্নিং শো' অনুষ্ঠানে আমি অংশ গ্রহণ করি। তখন 'মুখোমুখি দেখা' অনুষ্ঠানে ওই সময় আমাকে চিনতেন এমন একজন মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। 'উনি কে?' আমি ভাবলাম। দেখলাম

আগের যে স্কুল থেকে আমি বহিষ্কৃত হয়েছিলাম উনি ছিলেন সেই স্কুলের আমার ক্লাসের মতো পাশের প্রথম শ্রেণীর ক্লাসের শিক্ষিকা। সেই শিক্ষিকার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর কথা এমন—'তেৎসুকোসান পাশের ক্লাসের ছাত্রী ছিলো। ক্লাস চলা কালে কখনো কখনো বিশেষ কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঘরে যেতাম। আমার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের নিজে নিজে পড়াশোনা করতে বলে বারান্দায় বেরিয়ে দেখতাম তেৎসুকোসান প্রায় প্রত্যেক দিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। যখন আমি পাশ দিয়ে যেতাম, তখন তেৎসুকোসান আমাকে থামিয়ে বলতো, "আপা, আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বললো, কেন?" "আমি কি দুষ্টুমি করেছি?" ও "আপা, তুমি চিন্দোন্‌ইয়া পছন্দ করো না?" তেৎসুকোসান এমন সব কথা বলা শুরু করতো, তাই অসুবিধায় পড়লাম। শিক্ষকদের ঘরে কোনো কাজ থাকলেও দরোজা খুললে দেখতাম তেৎসুকোসান দাঁড়িয়ে আছে। আমি বের হতাম না। আপনার ক্লাসের শিক্ষিকাও শিক্ষকদের ঘরে এসে প্রায়ই আমাকে বলতেন, "কেন সে এরকম করে?" পরে আপনি যখন টেলিভিশনে অনুষ্ঠান শুরু করলেন, তখনই আপনার নাম দেখে বুঝতে পারলাম। কতো বছর আগের কথা, তবুও আপনি যখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন, তখনকারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে...।'

(আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছিলো?) আমার একেবারে মনে পড়লো না, তাই অবাক হলাম। এর সাথে সাথে আমার জন্য এতো ভোর বেলায় টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসেছিলেন এই চুল পেকে যাওয়া কোমল স্বভাবের শিক্ষিকা, যে তার তরুণী বয়সের রূপ, আমার স্কুলের বারান্দায় থাকা আর আমার সম্পর্কে আমার প্রশ্ন করার ভঙ্গির কথা ভেবে খুব হাসি পেলো। তার সঙ্গে ভালো মতো বুঝলাম, আমাকে যে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো সে কথাটা সত্য।

এখানে আমি আমার মা'র প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে এ-কথাটা আমাকে আমার বিশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত বলে নি। বিশ বছর পার হওয়ার পর এক দিন মা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ওই সময় তুমি কেন প্রাইমারি স্কুল বদল করেছিলে, তা জানো?' আমি বললাম, 'না, তো!' তখন মা সহজভাবে বললো, 'আসলে

তুমি বহিষ্কৃত হয়েছিলে।' প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী থাকার সময় যদি মা আমাকে বলতো, 'কী করবে? তুমি এখন বহিষ্কৃত! অন্য স্কুলে ভর্তি হলেও আবার যদি বের করে দেয়া হয়, তাহলে তোমার আবার ভর্তি হওয়ার মতো কোনো স্কুল নেই!!'

তাহলে আমি কতো অসহায় ভীরু ভীরু অনুভূতি নিয়ে সেই প্রথম দিনে তোমোএ স্কুলের গেট পেরুতাম। তাহলে ওই শেকড় গজানো গেট ও ট্রেন ক্লাসঘর অবশ্যই অতো আনন্দদায়ক হয়ে দেখা দিতো না। সেই মা আমাকে মানুষ করেছে, আমি কতো ভাগ্যবতী ছিলাম।

তখন যুদ্ধ চলছিলো তাই আমার কাছে তোমোএ স্কুলের বেশি ছবি নেই। যে কয়েকটা ছবি আছে তার মধ্যে মজার ছবি হচ্ছে ওই স্কুলের পড়াশোনা শেষে সার্টিফিকেট প্রদানের অনুষ্ঠানের ছবি। যে ছাত্র-ছাত্রীরা ওই স্কুলে পড়াশোনা শেষ করেছে তাদের ছবি সাধারণত তোলা হতো মিলনায়তনের সামনের সিঁড়িতে। তারা 'ছবি তোলো! ছবি তোলো!' বলে চিৎকার করে লাইনে দাঁড়ালো, তখন অন্য ছাত্রছাত্রীরাও তাদের সঙ্গে ছবি তুলতে চাইলো এবং এদিক সেদিক থেকে মুখ বাড়িয়ে দিলো। তাই ছবিতে বোঝা যায় না আসলে কারা স্কুল ছেড়ে যাচ্ছে। তার ফলে এ-ছবি দেখার সময় আলাপ করে স্থির করতে হতো 'এটা কাদের স্কুল থেকে বিদায় নেয়ার ছবি'। তখন কোবাইয়াশি স্যার কিছু বলতেন না। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন সার্টিফিকেট দানের আনুষ্ঠানিক ছবির চেয়ে সকলের প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক ভঙ্গির ছবি থাকাই ভালো। এখন বলতে পারি আর কোনো ছবিতে তোমোএ স্কুলের ভঙ্গিটি এর চেয়ে ভালোভাবে ধরা পড়ে নি।

তোমোএ স্কুল সম্পর্কে আরো অনেক কিছু লেখার ছিলো। তবে আপনারা যদি বুঝতে পারেন যে, তত্তচানের মতো মেয়েও চার পাশের মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মতো মানুষ হতে পারে, তাহলে আমি খুশি হবো।

যদি এখনও তোমোএ স্কুল থাকতো, তাহলে আমার ধারণা 'স্কুলে যেতে চায় না' এমন শিশু একজনও পাওয়া যেতো না। কারণ তোমোএ স্কুল ছুটি হওয়ার পর তখন কেউ বাসায় ফিরতে চাইতো না। আর পরের

দিন সকালে তাড়াতাড়ি স্কুলে যাওয়ার জন্য তারা উদগ্রীব থাকতো। তোমোএ ছিলো এরকম স্কুল।

তোমোএ স্কুলে ট্রেনের ক্লাসঘরে আমার সহপাঠী বন্ধুরা এখন কে কী করছে সে সম্পর্কে আমি যতটুকু জানতে পেয়েছি, তা সংক্ষেপে লিখে রাখছি।

তাকাহাশি-কুন (তাকাহাশি আকিরা)

ক্রীড়ানুষ্ঠানে সব সময় প্রথম পুরস্কার পেতো তাকাহাশি। প্রাথমিক স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রের সমান উঁচু হওয়া সত্ত্বেও সে রাগবি খেলার জন্য বিখ্যাত কোকুগাকুইন-কুগাইয়ামা উচচ মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হতে সক্ষম হলো। তার পর সে মেইজি বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগে ভর্তি হয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করলো।

বর্তমানে সে হামানাকো-হ্রদের পাশে অবস্থিত আন্দো ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি লিমিটেডের কর্মচারীদের তত্ত্বাবধায়কের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছে। সে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সহযোগিতার জন্য সকলের দুঃখ, কষ্ট ও অসুবিধার কথা শুনে সমস্যা সমাধান করে। নিজের দৈহিক অভিজ্ঞতা থেকে অপরের কষ্ট বুঝতে পারে তাকাহাশি। তাই মনে হয় সে সব কিছু ঠিক মতো চালাতে পারে। তার উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় স্বভাবও এ কাজে খুব সহায়তা করছে। যন্ত্রবিদ্ বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে কোম্পানির কনিষ্ঠ কর্মচারীদের বিশাল আকারের আই. সি. (I.C) যন্ত্রটি চালানোর প্রকৌশল প্রশিক্ষণ দেয়া।

এই লেখার জন্য আমি হামামাৎসুতে তাকাহাশি-কুন ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার স্ত্রী তার নিজের স্কুলের মতো তোমোএ স্কুলের সব কিছু জানে। সে কোমল হৃদয়ের তাকাহাশি-কুনকে ভালো করে বোঝে। সে আমাকে বললো তাকাহাশির দৈহিক প্রতিবন্ধীর হীনতাবোধ একেবারে নেই। সত্যিই তাই মনে হয়। যদি হীনতাবোধ থাকতো তাহলে মনে হয় উচচ মাধ্যমিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সে অসুবিধা বোধ করতো। আর কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষাকারীর পদে অধিষ্ঠিত থাকা বেশ কঠিন কাজ। 'তোমোএ স্কুলে তার প্রথম যাওয়ার দিনের কথা'-ও

মনোমুগ্ধকর ছিলো। সে বলেছিলো যে স্কুলে তার মতো ছেলেমেয়ে আরো আছে দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিলো। সে জন্য তোমোএ স্কুলের প্রথম দিন থেকে সে নিশ্চিত হয়ে স্কুলে যেতে পারতো। তার কাছে প্রতিটা দিন ছিলো আনন্দে ভরা। আলসেমি করে স্কুলে অনুপস্থিত থাকার কথা এক বারও সে ভাবে নি। সাঁতার কাটার দিঘিতে উলঙ্গ হতে সে লজ্জা পেতো, তবে একটা একটা করে পোশাক খুলতে খুলতে লজ্জাবোধও এক এক করে খসে পড়ছিলো। অন্যদের সামনে যেতেও তার লজ্জা বা ওই রকমের কোনো অনুভূতি রইলো না। ব্যায়ামের সময় নিজের চেয়ে বেশি উঁচু কাঠের ঘোড়ার ওপর ভর দিয়ে পেরুনোর সময় কোবাইয়াশি স্যার তাকে বলতো, 'চিন্তা করো না। তুমি পেরুতে পারবে!! নিশ্চয় পেরুতে পারবে।' এবং তার পার হওয়ার মুহূর্তে শুধু তাকে সাহায্য করতো। তাকাহাশি-কুনের মনে সে এমন বোধ তৈরি করতো বলে সে আত্মপ্রত্যয় লাভ করলো। যখন সে পেরুতে পারলো, তার তখনকার উল্লাস অবর্ণনীয়। যখনই সে পারবে না ভেবে পেছনের দিকে লুকিয়ে থাকতো, তখন স্যার তাকে ঠেলে দিতো, তাই সে সক্রিয় হতে বাধ্য হতো। ওই ক্রীড়ানুষ্ঠানের পুরস্কার পাওয়ার পরমোল্লাস এখনও স্পষ্ট মনে আছে...।

প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র থাকার সময়কার ঝিকমিক করা চোখ ও গম্ভীর স্বরে তাকাহাশি-কুন একের পর এক তোমোএ স্কুল সম্পর্কে এভাবে কথা বললো।

তার পারিবারিক পরিবেশ ও শিক্ষা তাকাহাশি-কুনের স্বভাব আরো চমৎকার করেছে। তবে কোবাইয়াশি স্যার শুধু বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে নয়, বরং কয়েক দশক পরের কথা ভেবে আমাদের লালন পালন করেছিলেন। যেমন স্যার আমাকে বলতে থাকতেন, 'তুমি আসলে ভালো মেয়ে।', তেমন তাকাহাশি-কুনকেও তিনি বলতেন, 'তুমি অবশ্যই পারবে।' স্যারের এ-কথা বিশ্বাস করে তাকাহাশি-কুন কাজ করে এসেছে। হামামাৎসু থেকে বিদায় নেয়ার সময় তাকাহাশি-কুন এমন অনেক কথা বললো যা আমার একেবারে মনে ছিলো না। যেমন তোমোএ স্কুলে পড়ার সময় স্কুল মাঠের বাইরে থেকে বা অন্য স্কুলের কোনো ছেলের কাছ থেকে বকা খেয়ে সে বিষণ্ণ মনে প্রবেশ করছিলো তখন আমি

তাকে 'কী হলো? কোন ছেলে বকেছে?' জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে আমি ক্লাসঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম এবং কিছুক্ষণ পর দৌড়ে ফিরে এসে বলেছিলাম, 'তাকাহাশি-কুন, আর কোনো চিন্তা নেই।' এ সব কথা সে আমাকে মনে করিয়ে দিলো। বিদায় নেয়ার সময় তাকাহাশি-কুন আরেকবার আমাকে বললো, 'ওই সময় সত্যিই খুশি হয়েছিলাম।' এ-সব কথা ভুলে গিয়েছিলাম, এখন সব মনে পড়ছে, এর জন্য ধন্যবাদ।

মিইয়ো-চান (কানেকো মিইয়ো)

মিইয়োচান প্রধান শিক্ষকের তৃতীয় কন্যা। সে কুনিতাচি সংগীত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ থেকে ডিগ্রী লাভ করে। বর্তমানে সে কুনিতাচি সংগীত মহাবিদ্যালয়ে সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষা দেয়। 'ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে চাই'—কোবাইয়াশি স্যারের মতো এমন ধারণা নিয়ে ও ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। মিইয়োচানের বয়স যখন তিন বছর, তার তখনকার মতো তালে তালে হাঁটা শরীরের নড়াচড়া দেখে ও নানা রকম কথা শুনে মনে হয় কোবাইয়াশি স্যার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন।

সাক্কো-চান (মাৎসুইয়ামা সাকিকো-বিয়ের পর তার নাম সাইতো সাকিকো)

তোমোএ স্কুলে আমার প্রথম দিনে সাক্কোচানকে আমি দেখি। তার চোখ বড়ো বড়ো আর তার পরনে ছিলো খরগোশের নকশা আঁকা জাম্পার স্কার্ট। তখন যে সব স্কুলে ভর্তি হওয়া খুব কঠিন ছিলো তার একটায়—টোকিও ষষ্ঠ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সে ভর্তি হয়। বর্তমানে ওই স্কুলের নাম মিতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তার পর সে ওচানোমিজুতে অবস্থিত Y W C A-এর প্রাথমিক স্কুলে ইংরেজী শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেয়। এখনও সে সেখানে পড়ায়। এবং বিশেষ করে গ্রীষ্মের ক্যাম্পিং ও ওই ধরনের অনুষ্ঠানে তোমোএ স্কুলের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সে যখন জাপান আল্পস পর্বতমালার হোদাকা পর্বতে আরোহণ করে, তখন একজনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সে তাকে বিয়ে করে। তার ছেলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। হোদাকা পর্বতের স্মৃতিতে সে তার ছেলের নাম রেখেছে ইয়াসুতাকা।

তাইচান (ইয়ামাউচি তাইজি)

যে তাইচান আমাকে বিয়ে করবে না বলেছিলো, সেই তাইচান এখন জাপানের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানীদের অন্যতম। সে আমেরিকায় থাকে, অর্থাৎ 'ব্রেন-ড্রেন'-এর একটা উদাহরণ।

টোকিও শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমান চিকুবা বিশ্ববিদ্যালয়) বিজ্ঞান অনুষদের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর সেখানকার স্নাতকোত্তর স্কুল থেকে সে মাস্টার ডিগ্রী নেয়। তার পর ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় যায়। পাঁচ বছর পর রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করে। সেখানেই সে থেকে যায় এবং উচ্চ শক্তি সম্পর্কে নিরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞান গবেষণা করতে থাকে। বর্তমান পৃথিবীতে বৃহত্তম আমেরিকার ইলিনয়ার অবস্থিত 'ফারমি জাতীয় ত্বরণ (একসিলারেশন) গবেষণাগার'-এর নাম পদার্থবিজ্ঞানের উৎসাহী যে কেউ জানে, বর্তমানে সে ওখানকার উপ-মহাপরিচালক। আমেরিকার তিপ্পান্নটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাবী ব্যক্তিদের নিয়ে এ গবেষণাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ গবেষণাগারটি এত বড় যে এতে ১৪৫ জন বিজ্ঞানী ও ১৪০০ জন টেকনিশিয়ান আছে। এখানে সে উপ-মহাপরিচালক ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক। তাই তাইচান কতো প্রতিভাবান তা বুঝতে পারছেন। চার বছর আগে ওই গবেষণাগারটি পাঁচ শো বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়ে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাইচান সম্প্রতি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে 'উপ্সিলন্' নামক এক পদার্থ আবিকার করেছে। এমন কি কেউ কেউ মনে করে সে 'নোবেল পুরস্কার' পাবে।' আমার মনে হয় অবশ্যই সে নোবেল পুরস্কার পাবে। তার স্ত্রীও রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রী লাভ করা প্রতিভাময়ী মহিলা।

এভাবে তারা দু'জন পদার্থ ও গণিতশাস্ত্রে প্রতিভাবান এক দম্পতি। কখনো কখনো তারা তাদের দুটি ছেলের সঙ্গে পারিবারিক কনসার্টের আয়োজন করে। তাতে তারা চেলো, পিয়ানো ও বেহালা প্রভৃতি যে যা বাজাতে দক্ষ সে তা বাজায়। এটি একটি শিল্প-অনুরাগী পরিবার।

তাইচান মূলত মেধাবী, তাই সে যে-কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ভর্তি হতো না কেন সে বর্তমানের মতো হয়ে উঠতো। তবে মনে হয় তোমোএ স্কুলের পদ্ধতি তার প্রতিভাকে আরো বিকশিত হতে সাহায্য করেছিলো। সেখানে সে সবার মতো 'নিজ নিজ পছন্দসই বিষয় থেকে পড়াশোনা শুরু করতে পারে।' কারণ ক্লাস চলার সময় তাইচান সব সময় অ্যাল্‌কোহল-প্রদীপ, ফ্লাস্ক ও টেস্টটিউবের পাশে নিমগ্ন বা নিজের সিটে বসে অত্যন্ত কঠিন বিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞানের বই পড়ছে— আমি যখন তার কথা ভাবি, তখন তার ওই রূপ ছাড়া আর কোনো রূপ আমার মনে একেবারে পড়ে না।

ও-ওএ-কুন (ও-ওএ কুনিও)

আমার চুলের বেণী ধরে কোবাইয়াশি স্যারের কাছে বকা খেয়েছিলো যে ছেলে সে ও-ওএ। তবে তাকাহাশি-কুনের 'লেজ'-র ঘটনা সম্পর্কে চমৎকার খবর আমাকে সে দিয়েছিলো।

এই ও-ওএ এখন 'প্রাচ্যদেশীয় অর্কিড'-এর অন্যতম বিশিষ্ট জাপানী কনিশিয়ার। শুনেছি কোনো কোনো প্রাচ্যদেশীয় অর্কিডের এক একটা চারার দাম কয়েক শো কোটি ইয়েন। তাই 'কনিশিয়ার'-এর দরকার হয়। এর বিক্রয় ও চাষ অত্যন্ত কঠিন। তবে আমাদের অজ্ঞাতে সে ওই জ্ঞান অর্জন করেছে। এখন সে এজন্য সারা জাপান বিমানে ও ট্রেনে করে ঘুরে বেড়ায়। এ 'পুনশ্চ' লেখার জন্য তাকে টেলিফোন করলাম। সে তখন সাবেমাত্র ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেছে।

আমি: তুমি তোমোএ-র পর কোন স্কুলে পড়েছিলে?

ও-ওএ-কুন: কোথাও পড়ি নি।

আমি: তাহলে তোমোএই তোমার শেষ স্কুল?

ও-ওএ-কুন: তাই।

আমি: তাই? মাধ্যমিক স্কুলেও পড়ো নি।

ও-ওএ-কুন: হুঁ-হুঁ। ও-ওইতাতে উদ্বাস্তু হয়ে ও-ওইতা মাধ্যমিক স্কুলে কিছু দিন পড়েছিলাম, তবে...

ও, মা! কী ভাবনা-চিন্তাহীন সুখী মানুষ সে! যুদ্ধের আগে তোদো-রোকি এলাকার অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছিলো 'সান্‌কাএন্ উদ্যান'—সেই উদ্যানের মালিকের পুত্র সে। যুদ্ধে তাদের পুরো উদ্যান পুড়ে গিয়েছিলো।

সে প্রকৃতিতে ও-ওএ-কুন ছিলো অত্যন্ত উদার। সে সময় আমাদের টেলি-ফোন আলাপের বাকি অংশটুকু এই:

ও-ওএ-কুন: এ-সব কথা থাক। তুমি জানো সবচেয়ে সুগন্ধী ফুল কোনটি? আমার মনে হয় চীন দেশের "শুন্‌রান্" (বসন্ত-অর্কিড)। কোনো পারফিউম এতো সুগন্ধি হতে পারে না।

আমি: শুন্‌রান্-অর্কিড দামী?

ও-ওএ-কুন: হুঁ, দামীও আছে, সস্তাও আছে।

আমি: প্রাচ্যদেশীয় অর্কিড কী ধরনের ফুল?

ও-ওএ-কুন: প্রাচ্যদেশীয় অর্কিড অনুজ্জ্বল, তবে আকর্ষণীয়।

তোমোএ স্কুলের সময় তার যে ঢিলেঢালা গলার স্বর ছিলো, তা শুনতে শুনতে আমি আলোড়িত হয়ে উঠলাম। কারণ ও-ওএ মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশোনা শেষ না করলেও সে একটুও লজ্জা বোধ করে না। সে নিজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চর্চা করে সত্যিই নিজের পছন্দ মতো কাজ করছে। তাই তার আত্মবিশ্বাস আছে।

আমাদেরা-কুন (আমাদেরা কাজুও)

জীবজন্তু-প্রেমিক আমাদেরা-র ছোট বেলার স্বপ্ন ছিলো সে বড় হলে পশুচিকিৎসক হবে এবং তার নিজের একটি পশুচারণ মাঠ থাকবে। অত্যন্ত দুঃখের কথা হচ্ছে, পাঠ্যাবস্থায় তার বাবা হঠাৎ মারা যান, তাই সে তার স্বপ্ন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সে নিহোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুচিকিৎসা ও পশুপালন স্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। তার জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। সে কেই-ও হাসপাতালে চাকরি নেয়। বর্তমানে সে আত্মপ্রতিরক্ষী সেনা বাহিনীর কেন্দ্রীয় হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার কাজে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে।

সাইশো-সান (বিয়ের পর তার নাম তানাকা আইকো)

সাইশো-সানের পিতামহের ছোট ভাই ছিলেন তোওগো সেনাপতি। সে আ-ও-ইয়ামা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তো। সেখান থেকে সে তোমোএ স্কুলে চলে আসে। তোমোএ স্কুলে তাকে আমার মনে হয়েছিলো "শান্ত স্বভাবের মেয়ে"। সে মান্‌চুরীয়ার যুদ্ধে হারিয়ে ফেলে-ছিলো তার বাবাকে। তিনি সেনাবাহিনীর তৃতীয় গার্ড রেজিমেণ্টের

মেজর ছিলেন। কামাকুরা উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর একজন স্থপতির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এখন তার বড় ছেলে একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে চাকরি করেছে আর তার দ্বিতীয় পুত্রও সম্প্রতি চাকরি পেয়েছে বলে সে নিশ্চিন্ত। সে এখন কবিতা লিখে জীবন কাটায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কবিতা লিখছো, তার কারণ রাজ-প্রসাদের কবিতার আসরের কবি সাইশো আৎসুকো-র সঙ্গে তোমার রক্তের সম্পর্ক আছে, তাই না? সে বললো, 'না, ঠিক তা...হো হো হো হো।' আমি বললাম, 'তোমার স্বভাব তখনকার মতোই বিনম্র ও শান্ত রয়েছে, তাই না?' সাইশো-সান সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'স্কুলে বেন্‌কেই নাটক অভিনয় করার সময় আমি যেমন পুরুষের মতো শরীরের অধিকারী ছিলাম এখনও তেমনই আছি!' তার গলার স্বর থেকে বোঝা গেলো সে এখন সুখী।

মিগিতা শোইচি-কুন

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পিঠার জন্য বিখ্যাত ছিলো মিগিতা-কুন। সে মিগিতা-কুন পড়াশোনা করলো টোকিওর উদ্যান বিদ্যালয়ে। ছেলেবেলা থেকে তার পছন্দ ছিলো ছবি আঁকা। সে ছবি আঁকা শেখার জন্য মুসাশিনো চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ডিজাইন বিভাগে আবার ভর্তি হয় এবং সেখান থেকে ডিগ্রী লাভ করে। সে এখন তার বন্ধুর সঙ্গে গ্রাফিক ডিজাইন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে।

আওকি কেইকো-চান (বিয়ের পর তার নাম কুওয়াবারা কেইকো)

কেইকোচান উড়তে পারা মোরগ পুষতো। তার বিয়ে হয় কেই-ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকের সঙ্গে। তারা এর মাঝে বিবাহের রজত জয়ন্তী পালন করেছে। তাদের বিবাহিতা মেয়ে আছে।

এ ছাড়া আছে আমার সহপাঠী **সাকামোতো তোশিকো-সান (বিয়ের পর তার নাম হয় সুগে তোশিকো।** সে একটু পরে ভর্তি হয়েছিলো। সে কোওরান্ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করার পর মেই উশিইয়ামা হলিউড বিউটি সেলুন-এ চাকরি নেয়। সে এখন সেখানে তৃতীয় পদস্থ প্রবীণ হেয়ার ড্রেসার।

ওয়াতানাবে ইয়োশিহারু-কুন

কানাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর সে এখন চাকুরীজীবী।

এখন আমি কোবাইয়াশি স্যারের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে লিখবো।

কোবাইয়াশি সোসাকু (আসল নাম কানেকো সোসাকু)

১৮৯৩ সনের (মেইজি অব্দের ছাব্বিশ সালের) জুন মাসের আঠারো তারিখ গুন্‌মা প্রদেশের আগাৎসুমা জেলায় তাঁর জন্ম হয়। শুনেছি ছেলেবেলা থেকে তিনি সংগীত ভালোবাসতেন। তাঁদের বাসা থেকে দূরে হারুনা পর্বত দেখা যেতো। বাসার সামনে ছিলো নদী। সে-নদীর পারে সব সময় তিনি মিউজিক কণ্ডাক্টরের মতো লাঠি দুলিয়ে দুলিয়ে খেলতেন। তাঁর বাবা ছিলেন এক গরীব কৃষক। ছয় ভাই বোনের মধ্য তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ। তাই প্রাথমিক স্কুলের পড়াশোনা শেষ করার পরপরই তিনি স্কুলের সহকারী শিক্ষক হন। শিক্ষক হওয়ার পরীক্ষা দিয়ে তিনি সার্টিফিকেট লাভ করেন (শুধু প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা করার পর এ পরীক্ষায় পাশ করা খুব কঠিন। তাই মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই খুব মেধাবী ছিলেন)। তার পর তিনি টোকিওতে আসেন। উশিগোমে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংগীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর আরাধ্য টোকিও সংগীত বিদ্যালয়ে (বর্তমান টোকিও চারুকলা ও সংগীত মহাবিদ্যালয়ে) শিক্ষক কোর্সে ভর্তি হন। ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি সেইকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষক হন। এ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নাকামুরা হারুজির শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি কোবাইয়াশি স্যারের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি চমৎকার মানুষ ছিলেন আর তাঁর ধারণা ছিলো 'সব দিক থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' তাঁর ধারণা ছিলো কোনো ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা হওয়া উচিত ত্রিশ। তিনি ছেলেমেয়েদের স্বাধীন ও তাদের ব্যক্তিত্বের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল শিক্ষা-পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। যেমন দুপুরের আগে পড়াশোনা শেষ করে বিকেলে হাঁটাহাঁটি, উদ্ভিদ সংগ্রহ, ছবি আঁকা, শিক্ষকদের বক্তৃতা শোনা ও গান গাওয়া—এই ছিলো নাকামুরা হারুজির শিক্ষাপদ্ধতি। পরবর্তীকালে কোবাইয়াশি স্যার তোমোএ স্কুলে এগুলো বাস্তবায়িত করেছিলেন।

কোবাইয়াশি স্যার যখন সেইকেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, তাঁর তখনকার ছাত্রদের মধ্য ইনোউএ সোনোকো ও নোবেচি উরিমারু পরবর্তীকালে বিখ্যাত পিয়ানোবাদক হয়েছিলেন।

কোবাইয়াশি স্যার এ-স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অপেরেটা রচনা করেছিলেন। এ অপেরেটা দেখে মিৎসুবিশি শিল্পপতি পরিবারের ইওয়াসাকি কোইয়াতা এই অসাধারণ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও ইয়ামাদা কোসাকু-র মতো অসংখ্য শিল্পীকে সে সময় আর্থিক সাহায্য দিতেন। তিনি কোবাইয়াশি স্যারকে ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতি দেখার জন্য ইউরোপে যাওয়ার ব্যয় বহন করার প্রস্তাব দেন। ঠিক সেই সময় কোবাইয়াশি স্যার সংগীত শিক্ষা ও শিশু-শিক্ষা নিয়ে নানা সমস্যায় পড়েছিলেন। তাই আনন্দের সঙ্গে তিনি প্রস্তাব গ্রহণ করে পড়াশোনার জন্য প্রথম বার ইউরোপ যাত্রা করেন। সেটা ছিলো ১৯২৩ সন (তাইশো অব্দের ১২ সাল) তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর।

এ বইয়ের 'ইউরিদ্‌মিক্স' পরিচ্ছেদে যেমন লিখেছি, পৃথিবীর এক সেরা প্রভাবশালী ব্যক্তি ডালক্রোজের কাছ থেকেই তিনি সরাসরি শিক্ষা লাভ করেন তাঁর প্যারিসের স্কুলে। তা ছাড়া নানা ধরনের স্কুল পরিদর্শন করে দু'বছর পর তিনি জাপানে ফিরে আসেন। ফেরার পর পরই কোবাইয়াশি স্যারের সাথে শিশুশিক্ষা সম্পর্কে যে ওবারা কুনিইয়োশি, সম্পূর্ণ অভিন্ন মত পোষণ করতেন তাঁর সঙ্গে মিলে সেইকেই কিণ্ডারগার্টেন স্থাপন করেন। পরে ওবারা স্যার তামাগাওয়া গাকুএন বিদ্যালয় স্থাপন করেন আর কোবাইয়াশি স্যার তোমোএ বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

কোবাইয়াশি স্যার এই কিণ্ডারগার্টেনের নার্সারির শিক্ষক-শিক্ষিকা-দের বলতেন, 'ছেলেমেয়েদের শিক্ষকের পরিকল্পনার মধ্যে বন্দী করো না। তাদের প্রকৃতির মধ্যে ছেড়ে দাও। শিক্ষকের পরিকল্পনার চেয়ে ছেলেমেয়েদের স্বপ্ন অনেক বড়।' এমন ধারণা নিয়ে কোবাইয়াশি স্যার আগের কিণ্ডারগার্টেনের চেয়ে একেবারে ভিন্ন ধরনের কিণ্ডারগার্টেন স্থাপন করেন।

১৯৩০ সনে (শোওয়া অব্দের পাঁচ সালে) কোবাইয়াশি স্যার দ্বিতীয় বারের মতো ইউরোপ যাত্রা করেন। ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দেয়ার পর তিনি আরেক বার ইউরিদ্‌মিক্স শেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। তাই

আবার ডালক্রোজের কাছে যান। তা ছাড়া বহু কিছু পর্যবেক্ষণ করে নিজে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কথা বিবেচনা করে এক বছর পর দেশে ফিরে আসেন।

১৯৩৭ সনে (শোওয়া অব্দের ১২ সালে) তিনি তোমোএ কিণ্ডার-গার্টেন ও তোমোএ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি জাপান ইউরিদ্‌মিক্স সমিতি স্থাপন করেন।

জাপানে বহু লোক আছে যারা কোবাইয়াশি স্যারকে জানে জাপানী ইউরিদ্‌মিক্স প্রচারক ও গবেষক হিসেবে। তবে তাঁর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি ভালোভাবে জানে তখনকার আমরা ছাড়া এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। তিন বছর আগে ওবারা স্যার মারা গেছেন। এ বইতে যে মারুইয়ামা স্যারের কথা বলেছি তিনিও এখন নেই এবং কোবাইয়াশি স্যারের সঙ্গে একই সময় ডালক্রোজের কাছে শিক্ষা নিয়েছেন ইশিই বাকু-সান তিনিও এখন পরলোকে।

শুনেছি যুদ্ধের পর কোবাইয়াশি স্যারের কাছ থেকে যাঁরা শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে কারো কারো এমন ধারণা হয়েছে যে স্যার কম কথা বলতেন। কিন্তু সময় লাগলেও তিনি অনেকক্ষণ ধরে বলে বলে ছাত্রছাত্রীদের সব বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর কথা যখন মনে পড়ে তখন মনে হয় যুদ্ধের পর স্যারের জীবনে ঘন ঘন ঘটছিলো নানা বেদনাদায়ক ঘটনা। এ-কথা মনে হলে আমিও বেদনা বোধ করি। আমি আগেই লিখেছি, তোমোএ স্কুল পুড়ে যাওয়ার পর তিনি কুনিতাচি কিণ্ডারগার্টেনের প্রধান ও কুনিতাচি সংগীত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক রূপে নানা জায়গায় শিক্ষকতা করেন। তাঁর সেই নিজস্ব ধরনের তোমোএ-এর মতো বিদ্যালয় পুনঃস্থাপন করার আগেই তিনি পরলোক গমন করেন। বিমান আক্রমণে পুড়ে যাওয়া তোমোএ স্কুলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যে স্যার বলেছিলেন, 'এর পর কী ধরনের স্কুল তৈরি করবো?', সেই কোবাইয়াশি স্যার চলে যান তাঁর প্রবল বাসনা আবার বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই।

এই হচ্ছে কোবাইয়াশি স্যারের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী। আরো বিস্তৃত লিখলে অনেক কিছু লিখতে হয়। যেমন তিনি তোওইয়ো-এইওয়া উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ইশিই বাকু নৃত্য বিদ্যালয়, টোকিও

প্রাদেশিক নার্সারি স্কুল, টোকিও প্রাদেশিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছিলেন। এ ছাড়াও লেখার অনেক কথা আছে। অভিনেত্রী ইকেউচি জুনকো-সানও পড়াশোনা করেছিলেন তোমোএ স্কুলে। তোমোএ বিদ্যালয়ে আমার ওপরের শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন অভিনেত্রী ৎসুশিমা কেইকো-সান।

পুনশ্চটা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেলো। তবে আপনারা যাতে কোবাইয়াশি স্যার সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারেন তাই লিখছি। আজকাল আমি আসাহি টেলিভিশনে 'তেৎসুকোর ঘর' নামে একটি অনুষ্ঠান করছি। এর প্রধান প্রযোজক হচ্ছে সানো কাজুহিকো-সান। তিনি টোকিও চারুকলা ও সংগীত মহাবিদ্যালয়ের সংগীততত্ত্ব বিভাগ থেকে ডিগ্রী লাভ করেন। তার পর টেলিভিশনে কাজ শুরু করার সময় থেকে তিনি শিশুদেরও সংগীত শেখাতে শুরু করেছিলেন। শেখাতে শেখাতে তিনি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। একদিন তিনি শোনেন যে কোবাইয়াশি সোসাকু নামে একজন অসাধারণ শিক্ষাবিদ ছিলেন। এ-কথা শুনে তিনি জানতে আগ্রহী হন কোবাইয়াশি স্যার কী ভাবে শেখাতেন আর কেমন মানুষ ছিলেন। গত দশ বছর ধরে তিনি কুনিতাচি সংগীত মহাবিদ্যালয়ে কোবাইয়াশি স্যারের ঘনিষ্ঠ লোকদের ও অন্যদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি ঠিক কী ভাবে শিশুদের শিক্ষা দিতেন, এ-সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারেন নি। মজার কথা হচ্ছে 'তেৎসুকো-র ঘর' অনুষ্ঠানের আগেও আমি 'ওয়াইড শো' নামের অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেছি। তখনই সানো-সানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তাও আজ প্রায় দশ বছর হলো। এ-সময় আমি জানতাম না সানো-সান কোবাইয়াশি স্যার সম্পর্কে গবেষণা করছেন। সানো-সান জানতেন যে আমি একজন চমৎকার প্রধান শিক্ষক দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছিলাম। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে ওই লোকটিই কোবাইয়াশি স্যার। যখন আমি এই 'তত্তচান' বই লিখতে শুরু করলাম তখন হঠাৎ সানো-সান তা জানতে পেরে খুশিতে লাফিয়ে উঠলেন আর বললেন, 'যা আমি দীর্ঘ দিন ধরে খোঁজ করে আসছি, সে কথা জানা লোক আমার এতো কাছাকাছি আছে...'

কোবাইয়াশি স্যারের ইউরিদ্‌মিক্স শেখানোর ছেলেমেয়েদের ক্লাসে পিয়ানো বাজাতো যে মহিলা তার সঙ্গে সানো-সানের দেখা হয়, তখন সানো-সান স্থির করেন যে তিনি কোবাইয়াশি স্যার সম্পর্কে নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা করবেন। সে মহিলা সানো-সানকে বলেছিলো, 'কোবাইয়াশি স্যার আমাকে বলেছিলেন, 'ছেলেমেয়েরা তোমার পিয়ানোর তালের মতো হাঁটে না।' অর্থাৎ কোবাইয়াশি স্যার তাকে সাবধান করেন যে সে শিশুদের শ্বাস-প্রশ্বাস কেমন তা জানে না। মাত্র এই একটি কথার জন্য সানো-সান কোবাইয়াশি স্যার সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেছিলেন। আমি আশা করি সানো-সান তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও গবেষণার সাহায্যে কোবাইয়াশি স্যার সম্পর্কে আরো বহু কিছু জানতে পারবেন।

যুদ্ধযাত্রী স্কুলের কাজের লোকটি রিয়োচান কুশলে ফিরে এসেছে। আজও নভেম্বরের তিন তারিখে নির্ভুলভাবে সে আমাদের সঙ্গে একত্রিত হয়।

এ বইয়ের নাম রেখেছি 'জানালার ধারে'। কারণ এটি লেখা শুরু করার সময় 'জানালার ধারের লোক'—এ-কথাটি সকলের মুখে মুখে ফিরছিলো। কেন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, সবার পেছনে পড়ে গেছে—কথাটির এমন তাৎপর্য ছিলো। আমি চিন্‌দোন্‌ইয়ার অপেক্ষায় সব সময় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমার প্রথম স্কুলে কোথাও যেন আমি বিচ্ছিন্নতাবোধ করতাম। এ জন্য এই বইয়ের এ নামই রেখেছি। তত্তচান নাম আমি মূল পাঠেই ব্যাখ্যা করেছি।

এ বই বেরোনোর আগের কথা বলছি। সবার আগে ধন্যবাদ জানাই ইওয়াসাকি চিহিরো-সানকে, যিনি এ বই-এর মিষ্টি ও সুন্দর ছবিগুলো এঁকেছেন। দুঃখের কথা তিনি সাত বছর আগে লোকান্তরিত হয়েছেন। তবে তিনি প্রায় সাত হাজার সুন্দর ছবি রেখে গেছেন। আপনারা জানেন শিশুদের ছবি আঁকায় চিহিরো-সান এক প্রতিভা। সম্ভবত এই পৃথিবীতে আর কোনো শিল্পী নেই যিনি তাঁর মতো এমন প্রাণবন্ত, জলজলে শিশুদের ছবি আঁকতে পারেন। শিশুদের যে-কোনো ভঙ্গি

তিনি আঁকতে পারতেন। তিনি ছয় মাসের শিশু ও নয় মাসের শিশুর পার্থক্য আঁকতে পারতেন। তিনি সব সময় ছিলেন শিশুদের পক্ষে এবং শিশুদের সুখ কামনা করতেন। সেই চিহিরো-সানের আঁকা ছবি তোমোএ স্কুল সম্পর্কে লেখা এই বইতে ব্যবহার করা আমার স্বপ্ন ছিলো। আমার সে-আশা পূর্ণ হয়েছে, এতে আমার আনন্দের সীমা নেই। আমার কথা ও চিহিরো-সানের ছবি এমন মিলেমিশে গেছে যে কোনো কোনো পাঠক মনে করেছে, চিহিরো-সান মারা যাওয়ার আগে এ-লেখাগুলো দেখে ছবি এঁকেছেন। এতে বোঝা যায় চিহিরো-সান নানা ধরনের শিশুকে একান্তভাবে শিশুর মতো এঁকেছেন। এই 'জানালার ধারে তত্তচান' বইটি পুরো পাণ্ডুলিপি একটানা লিখে যাওয়া আমার পক্ষে বেশ কঠিন ছিলো। তাই প্রতি মাসে কোওদান্‌শা প্রকাশনা-সংস্থা 'ওয়াকাই জোসেই' (তরুণী মহিলা) পত্রিকার জন্য একটু একটু করে লিখি এবং পত্রিকায় ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দু'বছর ধরে ধারাবাহিক-ভাবে ছাপা হয়। এখন সে লেখাগুলো সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মাসে আমি টোকিও-র নেরিমা-কু শিমোশাকুজিতে অবস্থিত ইওয়াসাকি চিহিরো-র ছবি বইয়ের চারুকলা যাদুঘরে (আমিও এ-প্রতিষ্ঠানের একজন ট্রাস্টি) যেতাম। সেখানকার উপ-পরিচালক চিহিরো-সানের পুত্র মাৎসুমোতো তাকেশি ও তাঁর স্ত্রী ইয়ুরিকো-সানের সহায়তায় ছবি বাছাই করতাম। দু'বছর ধরে প্রত্যেক মাসে সেখানে যাওয়া বেশ কঠিন কাজ ছিলো। তবে সেখানে প্রচুর মূল ছবি দেখতে পাওয়ার সুযোগ ছিলো আর তা আনন্দের ছিলো। এই দুই তরুণ-তরুণী ও চিহিরো-সানের স্বামী মাৎসুমোতো ইয়োশিআকি-সানকে এ-সব ছবি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন বলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি নাট্যকার ইইজাওয়া তাদাসু স্যারকেও কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি এই চারুকলা যাদুঘরের পরিচালক এবং তিনি আমার আলসেমি দেখে অনেক আগে থেকেই উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, 'তাড়াতাড়ি তোমার প্রাথমিক স্কুলের ও প্রধান শিক্ষকের কথা লিখে ফেলো!'

অবশ্য মিইয়োচান ও তোমোএ স্কুলের অন্য সকলের সহায়তা আমার বিশেষ উপকারে এসেছে।

বছর বিশেক আগে আমি 'ফুজিন-কোওরোন্' (মহিলা জনমত) নামক সাময়িকীতে তোমোএ স্কুল সম্পর্কে একটি ছোট লেখা লিখেছিলাম। কোওদান্‌শা প্রকাশনা-সংস্থার কাতোও কাৎসুহিসা-সান তখন লেখাটি পড়েন এবং জানতে চান, 'আপনি এ সম্পর্কে একটি পুরো বই লিখতে চান?' তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তখন আমি তরুণী, আমার ভবিষ্যৎ ছিলো অস্পষ্ট। আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে এলেন অনেকগুলো লেখার প্যাড নিয়ে যার প্রতি পৃষ্ঠায় দুইশো অক্ষর লেখা যায়। তখন স্কুলে রচনা লেখার ঘণ্টায় রচনা লেখা ছাড়া আমার আর বেশি কিছু লেখার অভিজ্ঞতা ছিলো না। সেই আমাকে কাতোও-সানই যুগিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস এবং আশা দিয়েছিলেন, 'একদিন আপনি তোমোএ স্কুলের কথা লিখবেন!!' তখন আমার মনে হয়েছিলো কাতোও-সান দুঃসাহসী তরুণ কর্মচারী। বিশ বছর পর যখন আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলো, তখনও তিনি আগের মতোই দুঃসাহসী, তবে এখন তিনি সে-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক। সেই সময় তাঁর কাছ থেকে লেখার প্যাড হাতে পেয়ে অন্য কাজে সেগুলো ব্যবহার করে ফেলেছিলাম! তা আমার মনে পড়ছে। তবে বিশ বছর পর এখন এমনভাবে এখান থেকে বই বেরোচ্ছে, এতে আমি আনন্দিত।

'তরুণী মহিলা' পত্রিকার নাগাসাওয়া আকিরা-সান দু'বছর ধরে প্রতি মাসে আমার লেখাটির দেখাশোনা করেছেন সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

'জানালার ধারে তত্তচান' বইটি ধারাবাহিকভাবে ছাপানোর জন্য এবং এখন পুস্তকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য কোওদান্‌শা প্রকাশনা-সংস্থার ইওয়ামোতো কেইকো-সানকে 'ধন্যবাদ' জানাই। তিনি আমাকে বলতেন, 'আমরা এটিকে একটি চমৎকার বইরূপে বের করবো!' এবং এর জন্য তিনি পরিশ্রম করেছেন। তোমোএ স্কুলের কথা তাঁরা ভালো করে বুঝে-ছিলেন, তাই তাঁদের সঙ্গে কাজ করা পরম সুখের ছিলো।

আমার এখন পর্যন্ত প্রকাশিত অন্যান্য বই ও বইয়ের প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় সহায়তা করেছেন সহৃদয় ওয়াদা মাকোতো-সান।

এ-ভাবে অবশেষে 'জানালার ধারে তত্তচান' বইটি বের হলো। তোমোএ স্কুল এখন নেই, তবে এখন আপনারা সবাই তোমোএ স্কুল সম্পর্কে পড়েছেন। তোমোএ স্কুলের আগের দিনের রূপ যদি আপনারা দেখতে

পান, তাহলে আমি যার পর নাই আনন্দ পাবো। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১৯৮১, যে দিন খবর ছিলো---মাধ্যমিক স্কুলে সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের ওপর যাতে ছাত্ররা বল প্রয়োগ করতে না পারে সে জন্য পুলিশেরা স্কুলে ঢোকে।

পুনশ্চ — ২

'জানালার ধারে তত্তচান' বইটি প্রকাশিত হয় তিন বছর আগে। এর মাঝে একের পর এক অনেক ঘটনা ঘটেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে আমি এতে অত্যন্ত আনন্দিত আর সাথে সাথে বিস্মিত হয়েছি। যখন আমি আমার অতি ভালো লাগা প্রধান শিক্ষক ও অবিস্মরণীয় তোমোএ স্কুলের কথা লিখি তখন আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে বইটি বেস্ট সেলার হবে। বইটি বেরুনোর পর এক বছরে এর পঁয়তাল্লিশ লাখ কপি বিক্রি হয় এবং এখন পর্যন্ত প্রায় ষাট লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। বলা হচ্ছে যে জাপানের প্রকাশনা জগতে এটা প্রথম রেকর্ড। এতো বিক্রি হয়েছে বলে আমার মনে হতো না। তবে সারা জাপান থেকে প্রতিদিন বহু চিঠি আমার কাছে আসতে থাকে আর সেগুলো পড়ে পড়ে বুঝতে পারি সত্যিই অসংখ্য লোক আমার বই পড়েছে। প্রতিটি চিঠিই আমার মনে দাগ কেটেছে। পাঁচ বছর বয়স থেকে একশো তিন বছর বয়স্ক পাঠক পর্যন্ত সকল বয়সের লোকের কাছ থেকে আমি চিঠি পেয়েছি।

আমি অবাক হলাম সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েদের চিঠির পরিমাণই বেশি। যখন আমি বইটি লিখি তখন ভাবি নি প্রাথমিক স্কুলের নিচু শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মতো কম বয়সের ছেলেমেয়েরা এ-বই পড়বে। তবে আমি সতর্ক হয়ে কঠিন চীনা অক্ষরের পাশে কানা অক্ষর

দিয়েও বক্তব্য বুঝিয়েছি। ছাপা অক্ষর থেকে দূরে সরে যাওয়ার এ-যুগে প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয় ও তার ওপরের শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এ-বইটি অভিধানের সাহায্য নিয়ে পড়েছে এ-কথা যখন জানতে পারলাম তখন আমি অন্তর থেকে খুশি হলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি মেয়ে লিখেছে যখনই রাস্তায় কোনো প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হয় তখনই মনে হয় 'সে ইয়াসুআকিচান!' আর 'সে তোমোএ স্কুলের ছাত্র!' আর সে তার কাছে ছুটে গিয়ে 'হ্যালো!' বলে। এবং সেও 'হ্যালো!' বলে উত্তর দেয়। এতে সে পরম আনন্দ পায়। তোমোএ স্কুল ছিলো চল্লিশ বছর আগে। ছেলেমেয়েরা কী অনুভূতিপ্রবণ! "তোমোএ স্কুল পুড়ে গেলো" শেষের এ পরিচ্ছেদ পড়ে বহু ছেলেমেয়ে লিখেছে 'যুদ্ধ ভালো নয়।' শুধু এটুকুর জন্যেও এ-বই লেখা সার্থক হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

যখন লেখা শেষ করি, তখন আমার মনে হয়েছিলো স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও তরুণী মায়েরা ভাবছে — 'ওহ্! ছেলেমেয়েদের এতো ভালোবাসেন ও বিশ্বাস করেন এবং উৎসাহ দিতেন, এমন একজন শিক্ষাবিদ তাহলে ছিলেন!' সত্য কথা বলতে গেলে আমি এখনও ভেবেছিলাম— 'এ প্রতিযোগিতামূলক সমাজে এমন স্বপ্নের মতো কথা অর্থহীন!!' আমার ভয় ছিলো এখনকার শিক্ষকদের কাছ থেকে এমন বিরুদ্ধ মত শোনা যাবে।

তবে বইটি বেরুনোর সাথে সাথে বহু প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক চিঠিতে লেখেন "স্কুলের টিফিনের সময় প্রত্যেক দিন এ-বই পড়ে শোনাই।" প্রাথমিক স্কুলের ছবি আঁকা শেখানোর এক শিক্ষক লিখেছেন, "ছবি আঁকার ঘণ্টায় ছেলেমেয়েদের 'তত্তচান' থেকে নানা অংশ পড়ে শোনাই। এবং তাদের ওই কাহিনীর বিভিন্ন ছবি আঁকতে বলি।" মাধ্যমিক স্কুলের একজন শিক্ষক চিঠিতে লিখেছেন "বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নিরাশ হয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছিলাম, এখন কোবাইয়াশি স্যারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরেক বার চেষ্টা করে দেখবো ভাবছি।" ... এমন একের পর এক আনন্দদায়ক চিঠি আমার কাছে এসেছে। কোবাইয়াশি স্যারের আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকারা বুঝতে পেরেছেন জেনে আমার চোখ সজল হয়ে উঠতে চায়। তা ছাড়া অনেক শিক্ষক আমার বইটিতে নানাভাবে

স্কুলে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। গত বছর থেকে 'ক্ষেতের শিক্ষক' পরিচ্ছেদ প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর জাপানী ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্য বইতে নেয়া হয়েছে এবং 'ভাঙাচোরা স্কুল' পরিচ্ছেদটি নীতিকথা বিষয়ক পাঠ্য বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অপর দিকে বেদনাদায়ক চিঠিও ছিলো। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের একটি ছাত্রীকে পাঠানো হয়েছিলো কিশোর-কিশোরীদের বন্দীশালায়। সে লিখেছে, 'আমার মনে হয় তত্তচানের মায়ের মতো মা ও কোবাই-য়াশি স্যারের মতো শিক্ষক যদি আমার থাকতো, তাহলে আমি এমন জায়গায় আসতাম না ...'

গণ মাধ্যমগুলো ভাবতে শুরু করলো—'কেন "জানালার ধারে তত্তচান" বইটি এমন বেস্ট সেলার হয়েছে?' এবং এটা এক সামাজিক সচেতনতার বিষয় হয়ে উঠলো। আসাহি সিনবুন্ নামক দৈনিক পত্রিকায় 'তত্তচান রোগের লক্ষণরাশি' নামে এ-বইয়ের নানা রকমের প্রভাবের কথা ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হলো। তা ছাড়া বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে 'তত্তচান' বইটির প্রকাশক কোওদান্শা প্রকাশনা-সংস্থা থেকে একেবারে ভিন্ন একটি প্রকাশনা-সংস্থা 'বেস্ট সেলার তত্তচানের কাহিনী' নামে একটি বই প্রকাশ করেছে আর এ-বইতে 'তত্তচান' বইটি কেন এতো বিক্রি হয়েছে?' তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছে।

যাই হোক, জাপানী শিক্ষা-ব্যবস্থা যখন সংকটের সম্মুখীন আর যখন সবাই ভাবছে 'এর একটা উপায় করা দরকার' তখন এ-বই বের হয়। যদিও আমি এমন উদ্দেশ্য নিয়ে লিখি নি, তবুও এ-বইটিকে এক রকমের 'শিক্ষা গ্রন্থ' ভেবে পাঠকেরা পড়েন এবং এতে এটি বেস্ট সেলার হয়ে যায়। এ-কথাটা মনে হয় ভুল নয়। তা ছাড়া বিভিন্ন বয়সের লোক নিজ নিজ পদ্ধতিতে বইটি পড়েছেন। মনে হয় এটাও এর বিপুল পরিমাণে বিক্রি হওয়ার কারণ।

বলা হয়ে থাকে যে কোনো মহিলার লেখা এটাই প্রথম বেস্ট সেলার। সাধারণত বেস্ট সেলার লেখা হয় পুরুষদের দ্বারা। মনে হয় এ-বইর প্রতি

পুরুষেরা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। অনেক পুরুষ মানুষ এ-বই সম্পর্কে চিঠিতে আমাকে লিখেছেন—"বইটির প্রচ্ছদ মেয়েলি ধরনের", "একজন বিনোদনকারিনীর লেখা", ও "বেস্ট সেলার হয়েছে"। শুধু এ-কথাগুলো শুনে অনেক পুরুষ বইটি ছোঁয় নি। বইটির সমালোচনা করে যে পুরুষেরা আমাকে চিঠি দিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই চিঠির শুরুতে এমন কথা লিখেছেন—'...উল্লিখিত কারণে আমার পড়ার ইচ্ছে হয় নি, তবে আমার পরিবারের লোকদের পীড়াপীড়িতে পড়লাম ...' এবং যাঁরা পড়তে শুরু করেছেন, তাঁরা সত্যিই বইটি সম্পর্কে ভালো মতামত দিয়েছেন। যে-সব পরিবারের লোকেরা পীড়াপীড়ি করে তত্তচানের বইটি পুরুষদের পড়িয়েছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই বই প্রকাশ করার আগে থেকে আমি স্থির করছিলাম এ-বইয়ের রয়ালটির টাকা দিয়ে জাপানে প্রথম বধির লোকদের পেশাদার নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করবো। আমি সরকারের কাছে এটিকে 'জনকল্যাণমূলক কর্পোরেশন' রূপে গণ্য করার জন্য আবেদন করেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিলো যখন আমি বুড়ি হয়ে যাবো তখন আমি যেন এদের সঙ্গে কাজ করতে পারি এবং আমার মৃত্যুর পরেও যেন এ নাট্যদল বেঁচে থাকে।

এরকম উদাহরণ আগে আর ছিলো না বলে অনুমতি পাওয়া বেশ কঠিন ছিলো। তবে পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমার জনকল্যাণমূলক কাজ বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ অবশেষে অনুমতি দেয় এবং 'জনকল্যাণ-মূলক কর্পোরেশন তত্ত ফাউণ্ডেশন' উদ্বোধন করা হয়। বইটি অপ্রত্যাশিত-ভাবে বেস্ট সেলার হয়ে যায়। আমাদের 'জাপান বধির নাট্য গোষ্ঠী' কাজ শুরু করে। তত্ত ফাউণ্ডেশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এখন বিশজনেরও বেশি বধির অভিনেতা অভিনয়-চর্চা করছে। এতে হাত দিয়ে কথা বলার ক্লাসও রয়েছে।

গত বছরের জুলাই মাসে আমাদের অনেক দিনের কাম্য আন্তর্জাতিক মূক ও বধির সম্মেলনের নাট্যোৎসবে আমরা অংশ নিই, তাতে আমরা কিয়োওগেন নাটক অভিনয় করি। ইতালির পার্লেমো-তে পঁয়তাল্লিশটি

দেশের প্রতিনিধিদের সামনে আমরা চমৎকারভাবে অভিনয় করি। জাপানের বধির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এই প্রথম বিদেশে নাটক অভিনয় করে। আপনারা অনেকে তত্তচান পড়েছেন, তাই এটা ঘটতে পারলো। এর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

এই তত্ত ফাউণ্ডেশনের জন্য ও বইটি বেস্ট সেলার হওয়ায় দু'বছর আগে মহামান্য সম্রাটের বসন্তকালের উদ্যান পার্টিতে রসায়নশাস্ত্র নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যাপক হুকুই কেনইচি-এর মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে আমি নিমন্ত্রিত হই। সেখানে মহামান্য সম্রাটের মুখ থেকে 'তোমার বই প্রচুর বিক্রি হয়েছে, এটা বেশ ভালো।' এমন অপ্রত্যাশিত সুখকর কথা শুনতে পাই। ১৯৮২ সাল যেহেতু আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ, তাই ডিসেম্বরের নয় তারিখে (জাপানে এখন এ দিনটিকে প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে স্থির করা হয়েছে) প্রধান মন্ত্রী সুজুকি-র কাছ থেকে সম্মানসূচক সার্টিফিকেট লাভ করি। তা ছাড়া 'ইয়ামামোতো ইয়ুউজোও (কিশোর সাহিত্যিক) "রোবোওনো ইশি (পথপার্শ্বের পাথর)" সাহিত্য পুরস্কার ও অন্যান্য বহু পুরস্কার পেয়েছি।

এ বইটিকে ছায়াছবি, টেলিভিশন, নাটক, সচল কার্টুন ছায়াছবি, মঞ্চ-নাটক ও গীতাভিনয় প্রভৃতিতে রূপায়নের বহু অনুরোধ এসেছিলো। তবে ইওয়াসাকি চিহিরো-সানের ছবির কাছে আমি ঋণী আর বইটি পড়ে পাঠকেরা নিজ নিজ কল্পনা অনুসারে মনের মধ্যে ছবি তৈরি করে নিয়েছেন—সেগুলোর চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছায়াছবি তৈরি করা কঠিন হবে ভেবে আমি এসব অনুরোধ গ্রহণ করি নি।

তবে মাত্র একটি অনুরোধ—শিন্‌সেই জাপান অর্কেস্ট্রার সিমফনি করা অনুরোধটি আমি গ্রহণ করি। কারণ সংগীত শুনে ইচ্ছে মতো কল্পনা করা যায়। কোমোরি আকিহিরো-র সুরে বইয়ের কথার চেয়েও আমরা বেশি আলোড়িত হলাম। শিন্‌সেই জাপান অর্কেস্ট্রা জাপানের বিভিন্ন স্থানে আমার ধারাবর্ণনার সঙ্গে কনসার্ট আয়োজন করে থাকে। তাঁর রেকর্ডও বেরিয়েছে।

১৯৮২ সালে, 'তত্তচান' প্রকাশ হওয়ার পরের বছর ডরোথি ব্রিটন-এর সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ডরোথি সুরকার ও কবি। তাঁর অনুবাদে যেন আমার লেখার মতো একই ছন্দ ও অনুভূতি রয়েছে। যখন আমি ইংরেজী অনুবাদ পড়ি, তখন আমি হেসে উঠি, আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। এই ইংরেজী সংস্করণ জাপানে চার লাখ কপি বিক্রি হয়ে দেশের ইংরেজী বেস্ট সেলার বই হিসেবে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

বইটি একই সময় আমেরিকাতেও বিক্রি হয়। তাই আমেরিকার এক নম্বর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান জনি কারসনের 'টুনাইট শো' অনুষ্ঠানে আমি অংশ নিই। হলে আগত অতিথিদের আমি বহুবার হাসাতে সক্ষম হই। তাই পর দিন থেকে আমেরিকার বহু সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান, নিউজ শো অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য অনুরোধ পাই। আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত ও গুরুত্ব-পূর্ণ পত্রিকা 'নিউয়র্ক টাইমস'-এর রোববারের সংখ্যায় বইপরিচিতি স্তম্ভে আলোচনা ছাপা হয়। এতে শুধু বইয়ের সমালোচনা করা হয় নি বরং আমি একজন জাপানী মহিলা যে টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করে এ-সবকে অসাধারণ ব্যাপার বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করে। 'টাইমস' পত্রিকা জাপান সম্পর্কে বিশেষ সংখ্যায় পুরো এক পৃষ্ঠা আমার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে।

চীন ও কোরিয়ায়-ও 'তত্তচান'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এ দু'দেশের সঙ্গে জাপানের প্রকাশনা-চুক্তি নেই বলে আমি তা জানতাম না, তবে একজন সহৃদয় চীনা ব্যক্তি একজন জাপানী লোকের মাধ্যমে আমাকে একখানি বই পাঠিয়েছেন। শুনেছি চীন দেশে দু'তিনটি অনুবাদ বেরিয়েছে। আর পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডেও বইটি প্রকাশিত হবে, এখন অনুবাদ হচ্ছে। চেকোশ্লোভাকিয়াতে-ও বেরোচ্ছে। তা ছাড়া ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশের প্রকাশনা-সংস্থাও আগ্রহ দেখিয়েছে। যাই হোক, বিভিন্ন দেশের মানুষ জাপানকে ভালো করে জানার জন্য এ-বই যদি কোনো কাজে আসে তাহলে আমি আনন্দ পাবো। আমেরিকা থেকেও বিমান ডাকে পাঠকদের চিঠি এসেছে। একজন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা যিনি ক্লাসে এ-বই পড়িয়েছেন, তিনি লিখেছেন যে তাঁর ক্লাসের একটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে লিখেছে,— 'তত্তচান', তুমি কি রূপসী মেয়ে? তাহলে আমার বাসায় ডিনারে আসতে পারো।'

আমি আরো যোগ করতে চাই যে জাপানের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের অনেক মেয়ে এই বই পড়ার পরের অনুভূতি সম্পর্কে লিখেছে— 'আমি ভাবতেও পারি নি এ-বইতে এতো কোমল সহৃদয়তার স্পর্শ পাওয়া যাবে।' কোমল সহৃদয়তা বলতে মনে হয় এক এক মেয়ে এক এক জিনিস বোঝাতে চায়, তবে এটা সত্যি মনে হয় যে তরুণ-তরুণীরা কোমল হৃদয়ের কোনো কিছুর খোঁজ করছে।

যখন এ অংশ লিখছিলাম, তখন ইউনিসেফের 'শুভেচ্ছা দূত' উপাধি লাভ করলাম। সমগ্র পৃথিবীতে কর্মরত শান্তির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক (ইউনিসেফের সর্বোচ্চ ব্যক্তি) তাঁর পরিচিত এক লোকের কাছ থেকে ইংরেজী 'তত্তচান' বইটি পান। বইটি পড়ে অত্যন্ত আলোড়িত হয়ে তিনি বলেন ইউনিসেফের ধারণা ও আমার ধারণা একেবারে এক। আর তিনি আগে থেকে ভাবছিলেন এশিয়াতে একজন শুভেচ্ছা দূত থাকা ভালো। তাই তিনি আমাকে ওই ভূমিকার জন্য মনোনীত করলেন। আমেরি-কার অভিনেতা ড্যানি কে, ইংল্যান্ডের অভিনেতা পিটার উসতিনভ ও নরওয়ের অভিনেত্রী লিভ উল্লম্যান, এ তিনজন শুভেচ্ছা দূত হিসেবে আগে থেকে বিখ্যাত। আমি হবো চতুর্থ ব্যক্তি।

এখন পৃথিবীতে দিনে চল্লিশ হাজার ও বছরে এক লাখ পঞ্চাশ হাজারের চেয়ে বেশি শিশু অনাহারে ও অনাহারের কারণে নানা রোগে মারা যায়। সে অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আপনাদের জানানো আমার বর্তমান কাজ। এ বছর গ্রীষ্মে আফ্রিকায় যাবো আর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যাওয়ার কথা।

কোবাইয়াশি স্যার সব সময় আমাদের বলতেন, 'তোমরা সবাই এক সঙ্গে, তোমরা যা কিছু করো এক সঙ্গে করবে।'

কুরোইয়ানাগি তেৎসুকো
বসন্তকাল, ১৯৮৪